হালকা মেঘের মেলা

হালকা মেঘের মেলা

॥ সম্পাদনা ॥

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

পুস্তক প্রকাশনী

সূচী

* প্রবন্ধ দুইটির শিরোনামা সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত।

ভূমিকা

১

কালমিতির বিচারে অনুজ হলেও বাংলা গদ্য আজ কবিতার পাশাপাশি দাঁড়াবার মতো সৌন্দর্য-সম্পদে সমুজ্জ্বল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে হাঁটতে শিখলেও সাহিত্যসৃষ্টির দৌড়-প্রতিযোগিতায় সফল হবার সামর্থ্য-কৌশল আজ তার আয়ত্তে। অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা গদ্যের এই আশ্চর্য ক্রমপরিণতি গবেষক ছাত্র ছাড়াও সাধারণ সাহিত্যরসিকদের মুগ্ধ বিস্ময় তোলার পক্ষে যথেষ্ট। তবু এই বিস্ময় যাতে ঝাপসা না থাকে, তার জন্যে প্রয়োজন স্পষ্ট-সাদা উদাহরণের। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন গদ্যলেখকের প্রতিনিধিমূলক রচনার। বর্তমান সংকলন সেই বহু-অভিলষিত লক্ষ্যের একটি বিনীত প্রচেষ্টা মাত্র।

ইংরেজ মিশনারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় যার জন্ম, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের কালিকলমে যার প্রতিপালন, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর দাক্ষিণ্যে যার সমৃদ্ধি, বহুবিচিত্র সেই বাংলা গদ্যের ইতিহাসনিষ্ঠ সংকলন হয়তো সম্ভব। অন্যপক্ষে সাহিত্যরসাশ্রিত সংকলনের জন্যে প্রয়োজন মক্ষিকাবৃত্তির অনবদ্যতা। ঝাড়াই-বাছাইর নৈপুণ্য। বর্তমান সংকলন শুধুমাত্র বাংলা গদ্যের একটা নমুনা-সর্বস্ব পঞ্জিকা নয়। এর একটা নির্দিষ্ট চরিত্র আছে। আছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। তাই রামমোহন বা তারও আগে কেরী কিংবা মৃত্যুঞ্জয় থেকে এর সুরু হতে পারেনি। এমন কি বিদ্যাসাগর থেকেও না। এর সুরু রাজনারায়ণ বসু থেকে, বাংলা গদ্যের ইতিহাসে যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য।

সাধারণভাবে গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে, প্রবন্ধের আবির্ভাব গল্প এবং উপন্যাসের আগে। তাই দেখি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ প্রস্তাব ইত্যাদি জাতীয় গদ্যসাহিত্যের কিছু কিছু নজির মিললেও উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতি তখনও অপরিচিত। বস্তুত টেকচাঁদ ঠাকুরের উপন্যাস-নামধেয় বহুশ্রুত রচনা 'আলালের ঘরে দুলাল' গত শতকের মধ্যভাগে প্রকাশিত হলেও আধুনিক ছোটগল্পের প্রথম আত্মপ্রকাশ তারও বহু পরে রচিত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী'তে। সে কারণে শুধু প্রবন্ধসাহিত্যের গ্রন্থনায় এই সংগ্রহগ্রন্থের প্রকাশ।

প্রবন্ধ কথাটি উচ্চারণ করতে ভয় হয় পাঠকদের ভীতির কথা ভেবে। একদা আমিও যেমনি ভয় পেতাম। সাধারণ্যে এখনো পর্যন্ত ধূসর পাণ্ডিত্য প্রকাশের গন্ধবাহী মাধ্যম হিসেবে প্রবন্ধ পদটির প্রচলন। অথচ ভালো প্রবন্ধ যে গল্পের চাইতেও চিত্তাকর্ষক হতে পারে ও-দেশের সাহিত্যে তার প্রচুর নজির বর্তমান। চেস্টারটন, বীয়রবম, লিণ্ড বা বেলকের প্রবন্ধের তুলনা কোথায়! ও-দেশের প্রবন্ধসাহিত্যের ঐশ্বর্য দেখে ইচ্ছে হলো খুঁজে দেখি বাংলাসাহিত্যে সে-ধরণের কিছু মেলে কি না। দীর্ঘদিনের অন্বেষণে পেলাম অনেকগুলি প্রবন্ধ। ব্যক্তিক প্রবন্ধ।

সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রবন্ধ পদটি চালু ছিল। সংস্কৃত আলংকারিকেরা প্রবন্ধের ধাতুগত অর্থ 'প্রকৃষ্ট বন্ধনে'র ওপরেই নজর রাখতেন বেশি। অর্থাৎ রচনাক্রমের পারম্পর্য, ভাব ও ভাষার সংহত সংগতি, ছন্দের বন্ধন (কারণ সংস্কৃতে প্রবন্ধ পদ্যেও লেখা হতো) প্রভৃতি রূপকল্পগত প্রয়োজনসিদ্ধিতেই ছিলেন তাঁরা প্রসিদ্ধ। 'অনুজ্ঝিতার্থ সম্বন্ধ'কে তাঁরা প্রবন্ধের মৌল লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যেও আজ প্রবন্ধের এই মৌল চরিত্রের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন যা হয়েছে তা তার চেহারায়, আঙ্গিকে। বাংলায় প্রবন্ধ আজ আর পদ্যে লেখা হয় না। প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট বন্ধন এই ধাতুগত অর্থ যদি মেনে নেওয়া যায়, তবে সেই প্রবন্ধের দ্বৈত রূপ চোখে পড়তে বাধ্য। একটি বচনের, অপরটি বাচনের। একটি তত্ত্বের, অপরটি রসের। তত্ত্বের এবং রসের এই উভয় গ্রন্থির যথার্থ সমন্বয়ে সার্থক প্রবন্ধের সৃষ্টি।

তত্ত্ব বা বিষয় এবং রস, এ দুয়ের অস্তিত্ব থেকে প্রবন্ধের দ্বিবিধ শ্রেণীর উদ্ভব। একটি বিষয়গত, অপরটি ব্যক্তিগত। ইংরেজী প্রবন্ধসাহিত্যে Expositary এবং Familiar বা Personal Essay—এই দু জাতের প্রবন্ধ বর্তমান। একটিতে বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে লেখকের মনন নির্দিষ্ট সঞ্চারপথে বিবর্তিত, অপরটিতে বিষয়বস্তুর হাত ধরে লেখকের মন স্বচ্ছন্দগতিতে সঞ্চরমান। একটিতে তত্ত্ব ও তথ্যের প্রকাশই মুখ্য, অপরটিতে লেখকের মন ও হৃদয়ের প্রকাশই অনেকখানি।

তবে প্রবন্ধের এই শ্রেণীবিভাগ বিষয় এবং রস, এ দুয়ের মাত্রার ওপর

নির্ভরশীল, বিষয়সর্বস্ব প্রবন্ধও লেখকের রসজ্ঞান, সামঞ্জস্যবোধ এবং প্রসাদগুণের গরিমায় সাহিত্যপদবাচ্য সার্থক রসপ্রবন্ধ হতে পারে। দেশ-বিদেশের সাহিত্যে এর বহুল নজির বর্তমান। আবার ব্যক্তিগত প্রবন্ধও উক্ত গুণাবলীর অভাবে নিতান্ত বস্তুগত প্রবন্ধ বলে মনে হতে পারে। বস্তুগত এবং ব্যক্তিগত এই উভয়জাতীয় প্রবন্ধের সীমারেখা তাই কিছুটা অলক্ষ্য, অস্পষ্ট। ব্যক্তিক স্বরের অনুরণন যেখানে অপেক্ষাকৃত বেশি নির্ঝরিত মোটামুটিভাবে তাই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ অভিধায় অভিহিত।

৩

সংগীতের ক্ষেত্রে খেয়াল-গানে পারদর্শিতা লাভ দুশ্চর সাধনাসাপেক্ষ। সাহিত্যেও সার্থক খেয়ালী রচনা অনেক সাধনার ফলশ্রুতি। খেয়ালী রচনা বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ তাই সুদক্ষ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। চিন্তারাজ্যের কয়েকটি উজ্জ্বল স্ফটিকখণ্ডকে নিয়েই হবে আদর্শ প্রাবন্ধিকের বেসাতি। আর কুশলী মণিকারের মতোই তাদের প্রত্যেকটি দিক আলোয় উজ্জ্বল করে তুলে ধরবেন তিনি।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সার্থক ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লেখকের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। সংখ্যা স্বল্প শুধু নয় একজাতীয় লেখকের। এঁরা রম্যরচনা লেখেন। রম্যরচনা সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। স্থূলাঙ্গ। স্থূলের প্রতি অধিকাংশের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। রম্যরচনার বাজারে এখন তাই লেখকের ভিড়। লেখকের এবং পাঠকের। পাঠকের এবং প্রকাশকের।

রম্যরচনা কি জিনিস জানি না। জানতেও চাই না। রম্যরচনা শুনলে মনে হয় অরম্য রচনা বলে অন্য কিছু আছে। যা রম্য নয়, তা সাহিত্য নয়। সহিতত্বের প্রথম এবং প্রধান উপাদানই আনন্দ, রম্যতা। সাহিত্যিক রচনামাত্রই রম্য। ব্যক্তিগতভাবে রম্যরচনা পদটি আমার তাই অপছন্দ।

শুনতে পাই ফরাসী 'বেল লেত্যর'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'রম্যরচনা'। ফরাসী 'বেল লেত্যর' আর সাম্প্রতিক বাংলা 'রম্যরচনা'র গুণগত তফাৎ কোথায়, এবং সে তফাৎ কতখানি, ফরাসী এবং বাংলা উভয় ভাষাই যাঁর আয়ত্তে, তিনিই তা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছেন। আমাদের কেউ তা আবছা বুঝছি, কেউ বুঝছিই না। কেউ একচক্ষু, কেউ অন্ধ। আসলে এই 'বেল

লেত্যর'-এর সাধারণ অর্থ ছাড়াও একটা বিশেষ অর্থ বর্তমান। বাংলা রম্যরচনার ক্ষেত্রে দেখি ঠিক উল্টো। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, ভ্রমণবৃত্তান্ত, নকশা, স্মৃতিমূলক রচনা ইত্যাদিকে রম্যরচনা আপাতত বলা চললেও চলতে পারে। কিন্তু না-গল্প না-প্রবন্ধ না-ভ্রমণবৃত্তান্ত না-স্মৃতিপ্রসঙ্গ এক কথায় কিছুই-না জাতীয় বর্ণগোত্রহীন একপ্রকার রচনাকে রম্যরচনা কেন বলবো? যেহেতু তাদের অন্যতর সাহিত্যশাখায় তোলা যাচ্ছে না? কিছুটা গল্প, কিছুটা রেখাচিত্র, কিছুটা ভাষার কারিকুরি, সময় সময় কিছুটা গ্রাম্যতার আমেজ দিয়ে সাড়ে বত্রিশ ভাজা জাতীয় কিছু রচনা করলেই যদি তাকে ফরাসী 'বেল লেত্যর'-এর অনুকরণে 'রম্যরচনা' বলে সাহিত্যস্বীকৃতি দিতে হয়, তবে পিটুলিগোলাকেও দুধ বলাতে আপত্তি থাকা উচিত নয়।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে আমি রম্যরচনা বলতে আপত্তি করিনি, কারণ রম্যতা সমস্ত সাহিত্যিক রচনার মতো ব্যক্তিগত প্রবন্ধেরও প্রধান অঙ্গসৌষ্ঠব। কিন্তু আমার মনে হয়, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, নকশা, আত্মজীবনী ইত্যাদি নাম যখন বর্তমান, এবং সেই সকল নামেই যখন রচনার জাতিচরিত্র সুস্পষ্ট, তখন তাদের রম্যরচনা এই নব নামকরণে নন্দিত করা অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর।

'রম্যরচনা' পদটিকে 'বেল লেত্যর' এর মতো বিশেষ অর্থে চালাতেও যদি হয়, তবে তার পরিধিরও সমপরিমাণ বিস্তৃতি আবশ্যক। তদনুসারে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিপ্রসঙ্গ, আত্মকথা, তীর্থপরিক্রমা এমন কি সাহিত্য-প্রাসঙ্গিক বা নন্দনতাত্ত্বিক রসালোচনাও তখন 'রম্যরচনা'র অন্তর্গত হওয়া উচিত। উচিত 'জেনেরিক' নাম রম্যরচনা ছাড়াও যে সব লেখার স্বতন্ত্র 'স্পেসিফিক' নামকরণ সম্ভব সেই ধরনের রচনার অন্তর্ভুক্তি। উচিত নয় শুধু কিছুই-নয় জাতীয় অতি-তরল অন্ত্যজ রচনাকে রম্যরচনা বলে চালানো। তবে ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে নিছক 'রম্যরচনা' নামে অভিহিত করতে আমার একটু আপত্তি আছে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ মাত্রই যে রম্য হবে, এ তো স্বতঃসিদ্ধ। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ তাই নিশ্চয়ই রম্যরচনা, কিন্তু রম্যরচনা মাত্রই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নয়।

ঠিক এই কারণেই 'হালকা মেঘের মেলা' ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংগ্রহগ্রন্থ। রম্যরচনার কোনো রমণীয় সংকলন নয়। যেহেতু রম্যরচনা বলতে ভ্রমণকাহিনী, আত্মকথা প্রভৃতি অনেক কিছুই বোঝায়, সেই কারণে স্মৃতিপ্রসঙ্গ, ভ্রমণবৃত্তান্ত

প্রভৃতি রচনা বর্তমান সংকলনের বহিঃপাতী। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে সময় সময় গল্পেরও অবতারণা করা হয়, কিন্তু ব্যক্তিক প্রবন্ধের সেই গল্প যেমন কোনো গল্পসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, তেমনি কোনো উপন্যাস বা গল্পগ্রন্থ থেকে খানিকটা অংশ তুলে তাকে ব্যক্তিক প্রবন্ধ বলে চালাবার অপচেষ্টাও এক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

৪

বাংলা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ইতিহাসে চারটি পর্বের প্রাধান্য লক্ষণীয়। এই চারটি পর্বের ইতিহাসই বাংলা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ইতিহাস। প্রথম পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী, তৃতীয় পর্বে বুদ্ধদেব-জ্যোতির্ময় প্রমুখ লেখকবৃন্দ, এবং সর্বশেষ পর্বে মুজতবা-যাযাবর-ইন্দ্রজিৎ প্রমুখ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক লেখকদের প্রাধান্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে একটি যুগের প্রবর্তক। অন্যতর শিল্পসিদ্ধি বাদ দিয়েও বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব অসামান্য। কি বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ, কি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, উভয়ত্রই বঙ্কিম-লেখনী সমান সচল। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে তিনিই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় প্রবন্ধের সমস্তরে তুলে ধরেন। 'বিবিধ প্রবন্ধ' বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সমুজ্জ্বল দিকচিহ্ন। 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়-দীপ্ত আবিষ্কার। সব না হলেও 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর একাধিক রচনা সার্থক ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। এইগুলিই বর্তমান বাংলা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পূর্বপুরুষ। হালকা চালে এরা লেখা, কিন্তু চিন্তায় অগভীর নয়। সামান্য ঢেঁকিকে দেখেও বঙ্কিমের কবিকল্পনা উদ্দীপ্ত, উচ্ছ্বলিত। সেই কল্পনা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে স্বচ্ছন্দে সঞ্চরণশীল। কখনো কেন্দ্রাভিগ, কখনো কেন্দ্রাতিগ, কিন্তু আগাগোড়া কেন্দ্রনির্ভর। এই তো ব্যক্তিগত প্রবন্ধের চরিত্রবৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাই বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্যক্তিক প্রবন্ধের স্রষ্টা। বঙ্কিমের সমসাময়িক ও পরবর্তী ব্যক্তিক প্রবন্ধ-লেখকদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত এ সময়কার কালীপ্রসন্ন সিংহ বা হুতোম প্যাঁচার 'বারোইয়ারি পূজা'-র স্থানে স্থানে যে রেখাচিত্র ছড়িয়ে আছে, ব্যক্তিক প্রবন্ধের যা নাকি অন্যতম অঙ্গ, ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়াও তার সাহিত্যমূল্য উপেক্ষণীয় নয়। ভাষারীতি ও রচনাশৈলীর দিক থেকেও প্রবন্ধটির বিশেষ মূল্য বর্তমান।

ব্যক্তিক প্রবন্ধ হয়ে-ওঠা পদার্থ, নিছক বানিয়ে-তোলা জিনিস নয়। কবির কলমে তাই ব্যক্তিক প্রবন্ধ সবচাইতে বেশি স্বতস্ফূর্ত। স্ফূর্তিতে প্রমূর্ত। বঙ্কিমের পর রবীন্দ্রনাথের হাতে তাই প্রবন্ধসাহিত্য বিচিত্রমধুর হয়ে ওঠে। অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধও প্রসাদগুণ ও রসবোধের অমেয় ঐশ্বর্যে রবীন্দ্রনাথের কলমে রসোজ্জ্বলতায় প্রতিভাত। রবীন্দ্রনাথের বিষয়সর্বস্ব প্রবন্ধগুলিও ব্যক্তিক প্রবন্ধের কোল ঘেঁষেই চলে। আর রবীন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধগুলি একান্ত ব্যক্তিগত সুরে অনুরণিত তারা তো নিটোল গীতিকবিতাই। যেমন 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র 'কেকাধ্বনি', 'নববর্ষা', 'শরৎ', যেমন 'লিপিকা'র 'একটি দিন', 'বাঁশি'। এই ধরনের প্রবন্ধ কী 'বাজে কথা'? তবে যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিক সুরে অনুরণিত প্রবন্ধটির নামকরণ করেছেন 'বাজে কথা'। নিজের কথায় স্পন্দিত প্রবন্ধ আপতিক বিচারে 'বাজে কথা'। 'বাজে কথা' নামেই ব্যক্তিক প্রবন্ধের চরিত্র সুস্পষ্ট। আসলে জীবনে বাজে কথাই তো সবচাইতে কাজের কথা, গভীরতার কথা। বাজে কথা অর্থে আপাতবক্তব্যহীনতা বা যুক্তির ধারাবাহিকতার অনুপস্থিতি। আসলে সাহিত্যরসগত বাজে কথারও আছে একটি নির্দিষ্ট বক্তব্য, বক্তব্যের সেই কেন্দ্র থেকে লেখকের হৃদয় ও ব্যক্তিত্বের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র রচনাটিতে, প্রবন্ধটির সর্বত্র।

রবীন্দ্রনাথের চাইতেও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতর পুরুষ প্রমথ চৌধুরী। কিন্তু তাঁর প্রসঙ্গে আসার আগে ঠাকুরবাড়ির আর দুজনের নাম করতে হয়: বলেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। স্বচ্ছ-ঋজু ও কবিত্বমণ্ডিত রচনারীতিতে প্রদীপ্ত বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিক প্রবন্ধাবলী। আর অবনীন্দ্রনাথের গদ্য রবীন্দ্রগদ্যের গীতলতার অংশীদার হলেও নিজস্ব চিত্রলতায় স্বতন্ত্র। এ-ছাড়া একটি অভিনব বৈঠকী ঢঙ ছিল অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের চরিত্রচিহ্ন। ব্যক্তিক প্রবন্ধে গল্পেরও স্থান আছে, প্রয়োজন হলে একটি ব্যক্তিক প্রবন্ধ পুরোটাই গল্প হতে পারে। অবনীন্দ্রনাথের 'লুকিবিদ্যে' তারই অন্যতম নিদর্শন।

বাংলা গদ্যের ইতিহাসে প্রমথ চৌধুরীর অবদান প্রশস্ত পরিসরে সমালোচ্য। প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী, 'বীরবলী রচনারীতি'-তে যা নামাঙ্কুরিত, ব্যক্তিক প্রবন্ধ রচনার সব চাইতে অনুকূল। অনুকূল শুধু নয়, অমিত সম্পদ। ফরাসী মনের ধাতের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মনের ধাতের ছিল আশ্চর্য মিল। প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিক প্রবন্ধ তাই বিশিষ্ট এবং অভিনব। শব্দপ্রয়োগের

নৈপুণ্য, শ্লেষ-যমকের যথার্থ ব্যবহার, ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম ও পরিমিত পরিহাসের উজ্জ্বল সমন্বয়, wit-এর প্রাচুর্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিক প্রবন্ধাবলী। এবং প্রমথ চৌধুরীর এই সমস্ত গুণ সময় সময় অপগুণে পরিণত হলেও সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে লেখা তাঁর ব্যক্তিক প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় সম্পদ। চেস্টারটনের মতো প্রমথ চৌধুরীও লিখতেন নিজস্ব ভঙ্গীতে, কারণ তিনি ঐ স্বকীয় ভঙ্গীতেই ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি ঐ ভঙ্গীতেই লিখতেন, কারণ তিনি অন্য কোনোভাবে লিখতে পারতেন না। সম্পূর্ণ নিজস্ব এক দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল তাঁর। সে দৃষ্টি বঙ্কিম, কিন্তু বক্র নয়। উদাহরণত, 'পৃথিবীতে বসন্ত নেই' 'ফাল্গুন' প্রবন্ধের এই মূল কথাতে তাঁর সেই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় প্রমূর্ত। প্রমথ চৌধুরীর এই অভিনব বাচনভঙ্গী, পরিহাসবোধ, বিদ্রূপাত্মক ও তির্যক মনোভাব অন্নদাশঙ্কর, জ্যোতির্ময় রায়, রঞ্জন প্রমুখ পরবর্তীদের রচনায় অল্পবিস্তর সংক্রামিত। প্রমথ চৌধুরীর সাক্ষাৎ শিষ্য ও অনুবর্তীদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-প্রমথ পর্বের অন্যতম ব্যক্তিক প্রবন্ধ-লেখক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর পরে বাংলা ব্যক্তিক প্রবন্ধের ধারা 'কল্লোল' 'কালিকলমের' দাক্ষিণ্যে লুপ্ত না হলেও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর অন্যতম বুদ্ধদেব বসু ব্যক্তিক প্রবন্ধের এই ধারাকে পুনর্বার নতুন খাতে প্রবাহিত করেন। এই কারণে বুদ্ধদেব বসু এবং তাঁর সমসাময়িক জ্যোতির্ময় রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পরিমল রায় প্রমুখ লেখকদের প্রবন্ধ রচনায় বাংলা ব্যক্তিক প্রবন্ধের তৃতীয় পর্বের সূত্রপাত। বুদ্ধদেবের 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' এই পর্বের প্রথম বিস্ময়-মুগ্ধ ফসল। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতির মিশ্র স্পন্দন বুদ্ধদেবের গদ্যরচনায় অনুরণিত। গীতল অথচ প্রয়োজনবোধে শাণিত। বুদ্ধদেব বসুর অধিকাংশ ব্যক্তিক প্রবন্ধে বিস্ময় আনন্দ এবং সৌন্দর্যবোধের স্নিগ্ধতা বর্তমান, আবার তথ্য ও যুক্তি তাঁর প্রবন্ধে যে অনুপস্থিত তাও নয়। ব্যক্তিক প্রবন্ধ হয়ে-ওঠা পদার্থ, কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর কোনো কোনো প্রবন্ধ পড়ে মনে হয় আগাগোড়াই তা [illegible]নিয়ে-তোলা জিনিস। অর্থাৎ সিদ্ধ নয়, সাধিত। সাধিত এবং প্রসাধি[illegible] তাই মাঝে মাঝে নিষ্প্রাণ। বুদ্ধদেবের লেখায় একটা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় [illegible] যায়, কিন্তু

একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীই যে প্রবন্ধের অনেকখানি তার প্রমাণ জ্যোতির্ময় রায়ের 'দৃষ্টিকোণ'-এর প্রবন্ধাবলী। দৃষ্টি থাকলেই দেখা যায় না, তার জন্যে চাই দৃষ্টিকোণ। এই দুর্লভ দৃষ্টিকোণের উজ্জল আলোয় অতি তুচ্ছ বস্তুকেও অসামান্য করতে পারেন জ্যোতির্ময় রায়। দিতে পারেন নতুন ও গভীর তাৎপর্য। জ্যোতির্ময় রায়ের বিপরীতধর্মী বিমলাপ্রসাদ। ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার চাইতে কথকতার ভঙ্গী তাঁর লেখায় প্রধান। খুঁটিনাটি আপাততুচ্ছ তথ্যের সরস পরিবেশনায় বিমলাপ্রসাদের প্রবন্ধ বিশিষ্ট, যদিও কখনো কখনো তথ্য বাহুল্যে তাঁর প্রবন্ধ কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। বিমলাপ্রসাদের পরবর্তী নবেন্দু বসু ও 'ইদানীং'-এর লেখক পরিমল রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। স্মিত কৌতুক, সামঞ্জস্যবোধ এবং স্বভাব রসজ্ঞান ছিল এঁদের দু-জনের রচনা-বৈশিষ্ট্য।

বুদ্ধদেব-জ্যোতির্ময়-বিমলাপ্রসাদ যে সময়ে কলম ধরেছিলেন সাহিত্যক্ষেত্রে তখন ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ছিল অপেক্ষাকৃত অল্প জনপ্রিয়। সম্প্রতি যাযাবর-মুজতবা-রঞ্জন-রূপদর্শীর আবির্ভাবে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ আকস্মিকভাবে অত্যধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অপেক্ষাকৃত নবীন এই লেখকদের প্রবন্ধ দিয়ে এই চতুর্থ পর্বের সূত্রপাত। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ 'দৃষ্টিপাত' এই পর্বের প্রথম উল্লেখ্য প্রকাশন। সাংবাদিকতাকেও সাহিত্যে উন্নীত করা যায়। 'দৃষ্টিপাতে' তার পরিচয় মেলে। সাহিত্যবিচারে 'দৃষ্টিপাত' সুখপাঠ্য সাংবাদিক সাহিত্য, তার বেশি নয়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের এই সাংবাদিকতার দিকে এখন অনেকেই নজর দিয়েছেন। মাঝে মাঝে মনে হয় সেটা অক্ষমতার লক্ষণ। গোত্রবিচারে রূপদর্শীর বহু রচনা প্রবন্ধ পদবাচ্য হলেও শিল্পবিচারে সেগুলি সাংবাদিকতার সহবর্ণ। রচনার চরিত্রবিচারে শশিশেখর বসুর 'লিচুফল'-ও রূপদর্শীর 'বাজারে আমের'-ই প্রতিবেশী। 'দৃষ্টিপাতে'র সমসাময়িক গ্রন্থ 'ইন্দ্রজিতের খাতা' ব্যক্তিগত প্রবন্ধসাহিত্যের সমাদৃত সংযোজন। ব্যক্তিক প্রবন্ধে কোনো জিনিস প্রমাণ করার চাইতে কোনো জিনিসকে দীপ্ত করে তোলাই লেখকের কাজ। নম্র এবং শান্ত, লঘু অথচ চটুলতাবর্জিত ইন্দ্রজিতের প্রবন্ধাবলী তার প্রমাণ। অন্যপক্ষে ইন্দ্রজিতের বিপরীতধর্মী হলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। তাঁর প্রবন্ধ জোর পায়ে চলে। চলে আর বলে। অন্তরঙ্গতার স্নিগ্ধ উত্তাপ মুজতবার লেখার সর্বত্র সঞ্চারিত। মজলিশি লেখায় তিনি অদ্বিতীয়। কিন্তু মুজতবার

এই সমস্ত গুণ সময় সময় ঢাকা পড়ে তাঁর অগভীরতায়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের চাল হালকা, হালকা অর্থে অপরিণতবয়স্কের চাপল্য নয়; এর চিন্তা গম্ভীর নয়, কিন্তু অগভীরও নয়। সার্থক ব্যক্তিক প্রবন্ধকার আত্মভোলা কবি বা দার্শনিক; পাঠকের সঙ্গে কিছুক্ষণ রসালাপ করাই তাঁর লক্ষ্য। লোককে হাসানোর সঙ্গে লোককে ভাবানোও তাঁর কাজ। মুজতবার প্রায় রচনায় ব্যক্তিগত প্রবন্ধকারের এই দ্বিতীয় গুণটি কিন্তু অনুপস্থিত। তাই তাঁর একাধিক প্রবন্ধে একটি কৌতুকপ্রবণ উজ্জ্বল মনের পরিচয় মেলে সত্যি, কিন্তু একটি গভীর মননের সাক্ষাৎ দুর্লভ হয়ে দাঁড়ায়। এ-কথা বলার উদ্দেশ্য, মুজতবার এই নিন্দনীয় দিকটাই সাম্প্রতিক রম্যরচনা-লিখিয়েদের অনেকের জন্মদাতা। একাধিক রম্যরচনাকার তাঁরই অনুসরণ করতে গিয়ে সাহিত্যকে গ্রাম্যতাদুষ্ট করছেন, করেছেন অশালীন। এটি অমার্জনীয় অপরাধ। মুজতবার বিপরীতধর্মী অথচ ইন্দ্রজিতেরও সমগোত্র নন, লেখক হলেন রঞ্জন। রঞ্জনের প্রবন্ধে তাঁর মার্জিত পরিহাসবোধ ও স্বচ্ছন্দ-শাণিত বাচনভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের তীক্ষ্ণতা প্রশংসনীয়ভাবে লক্ষণীয়, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর ভূয়োদর্শিতা ও বৈদগ্ধ্য প্রকাশের প্রয়াস এবং অহংবোধের উগ্রতায় সময়-সময় তাঁর প্রবন্ধকে বিরক্তিকর মনে হয়। রঞ্জনের এই ত্রুটিবিমুক্ত বলে কালপেঁচার প্রবন্ধ সুখপাঠ্য। ইন্দ্রজিতের মতো কালপেঁচার প্রবন্ধও নম্র ও শান্ত। স্টাইলের দীপ্তি না থাকলেও মনকে নাড়া দেবার মতো গভীরতা কালপেঁচার প্রবন্ধে বর্তমান। এ-ছাড়া কালপেঁচার রচনা সমাজসচেতনতা ও সহানুভূতিতেও দৃপ্ত-ভাস্বর। অত্যন্ত সাম্প্রতিকদের মধ্যে নীলকণ্ঠের ব্যক্তিক প্রবন্ধ প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল। দৃপ্ত ও শাণিত তাঁর গদ্যরীতি, শব্দপ্রয়োগের কারুকৌশলে বিশেষভাবে চিহ্নিত। নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য একটা অবশ্যই আছে, তবে তিনি ভাবে-ভাষায় বুদ্ধদেবের সবর্ণ না হলেও সগোত্র, অন্তত 'বসন্ত কেবিন' পড়ে আমার তাই মনে হয়েছে।

৫

তিন বৎসরের সাহিত্য-এষণার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সানন্দ ফলশ্রুতি এই সংকলন। সে কথা জানেন আমার প্রবীণ শুভাকাঙ্ক্ষী এবং নিকট বন্ধুরা এঁদের মধ্যে বিশেষ করে পেয়েছি নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ভবানী মুখোপাধ্যায় ও ত্রিদিবেশ বসুর অবিরল উৎসাহ ও উপদেশ। আর পেয়েছি অন্তরঙ্গতম

সুহৃৎ করুণাশঙ্কর রায়ের মূল্যবান আলোচনা ও অকৃপণ সহযোগিতা এবং সোদরপ্রতিম জয়ন্ত বসুর অকৃত্রিম সহায়তা। লেখক-পরিচিতি রচনায় বিশেষ সাহায্য করেছেন রাণা বসু। কিন্তু গ্রন্থসৌষ্ঠবের জন্যে যিনি বিন্দুমাত্র ব্যয়কুণ্ঠতা দেখাননি, সেই রজনী বন্দ্যোপাধ্যায় সবিশেষ অভিনন্দনার্হ। প্রসঙ্গত তাঁর ও আমার সুমিত্র নির্মল সরকারের নামও সমুল্লেখ্য। ব্যক্তিগতভাবে এঁদের সকলের সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, তাতে লৈখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ অনুপস্থিত।

পরিশেষে যে সকল লেখক ও প্রকাশক রচনা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন, তাঁদের সকলের জন্যে আমার ধন্যবাদ রইল।

হেমন্ত। ১৩৬২ ॥ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

জেঠামো

রাজনারায়ণ বসু

নৈয়ায়িকেরা অনেক পদার্থের লক্ষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের যদি জেঠামো শব্দের লক্ষণা করিতে হইত তাহা হইলে তাঁহারা মুশকিলে পড়িতেন। যেহেতু জেঠামো নানাবিধ ও এক একবিধ জেঠামি নানারূপ ধারণ করে। সামান্যতঃ জেঠামোর লক্ষণা করিতে গেলে ইহা বলা যাইতে পারে যে যাহা নিজের ক্ষমতার অতীত সে বিষয়ে কথা কওয়া জেঠামো। জেঠা নানা প্রকার। জেঠা কবি, জেঠা সমালোচক, জেঠা দার্শনিক, জেঠা বৈজ্ঞানিক, জেঠা পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী, জেঠা বক্তা, জেঠা রিফর্‌মর। জেঠা কবির বস্তুতঃ কবিত্বশক্তি নাই কিন্তু কতকগুলি শব্দাড়ম্বর দ্বারা লোককে জানাইতে চান, যে তিনি একজন প্রকৃত কবি। তাঁহাদের কবিতাতে 'ঘনঘটা', 'সৌদামিনী', 'নলিনীনায়ক', 'চাতকিনী', 'মৃদুল মৃদুল সমীর' সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করে। আজকাল জেঠা কবিদিগের জ্বালায় তিষ্ঠানো ভার হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল গুটিকতক শব্দ সংগ্রহ করিলে সমালোচনায় বিলক্ষণ জেঠামি করা যায়—সে সকল শব্দ 'ওজোগুণ' 'প্রসাদগুণ' 'প্রাঞ্জলতা' প্রভৃতি। জেঠা সমালোচকেরা আশু প্রতিপত্তি লাভ করিবার জন্য বড়ো বড়ো লেখককে গালি দিয়া থাকেন ; যথা,—ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মাইকেল ইত্যাদি। সকল প্রকার জেঠা অপেক্ষা দার্শনিক জেঠা সর্বশ্রেষ্ঠ। মনুষ্য যাহা কখনো নিরূপণ করিতে পারে না, যাহা ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, দার্শনিকেরা সেই সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া বিলক্ষণ জেঠামি করেন। যেন কতই বিজ্ঞ, যেন পৃথিবীর সকল তত্ত্বই বুঝিয়াছেন। দার্শনিকদিগের গ্রন্থ হইতে যদি জেঠামি বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে অল্পই অবশিষ্ট থাকে! তাঁহারা ঘটত্বাবচ্ছিন্ন, পটত্বাবচ্ছিন্ন, ইত্যাদি শব্দ দ্বারা কান ঝালাপালা করেন। বৈজ্ঞানিক জেঠা পূর্ব প্রকার বৈজ্ঞানিক মত প্রমাণসিদ্ধ হইলেও তাহা খণ্ডন করিয়া নাম

লইবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদিগের মত জলবুদ্‌বুদের ন্যায় বৈজ্ঞানিক জগতে এক একবার উত্থিত হয়; আবার কিছুদিন পরে বিলীন হইয়া যায়। সকল বৈজ্ঞানিক জেঠা অপেক্ষা বাঙালী বৈজ্ঞানিক জেঠা আরও ভয়ানক। তাঁহারা ইংরাজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হইতে উপাদান অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগের অজ্ঞ স্বদেশস্থ ব্যক্তিগণের নিকট বিলক্ষণ জ্যেষ্ঠতাতি ফলান। নিজে একটি কোনো নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতে পারেন না, কেবল ইউরোপীয় মহাজনদিগের নিকট ক্রয় করিয়া 'রিটেল' বিক্রয় করেন! পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী জেঠা হাওয়ার উপর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। সামান্য নিদর্শন ধরিয়া তুলকালাম করিয়া তুলেন। এই শ্রেণীর জেঠারা বলেন যে বাল্মীকি হোমরের চুরি করিয়া রামায়ণ লিখিয়াছেন এবং ভগবদ্গীতা-প্রণেতা বাইবেল হইতে ভাব লইয়া গীতা রচনা করিয়াছেন। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী জেঠা প্রস্তরখণ্ডের উপর নৈসর্গিক কারণে যে সকল আঁজিবিজি পড়িয়াছে, তাহা পুরাকালের কোনো রাজার খোদিত আদেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে যখন তাঁহার জেঠামো ধরা পড়ে তখন অপ্রতিভ হয়েন। তখন জেঠার পদ হইতে ছোটো খুড়োর পদে তাঁহাকে নামিতে হয়! বক্তৃতাতে যখন জেঠামি চলে এমন অল্প বিষয় আছে যাহাতে তদ্রূপ জেঠামি চলিতে পারে। নিমিষ বলিয়া এক পদার্থ আছে; অতি অল্প দুগ্ধ ফেনাইয়া ফেনাইয়া তাহা প্রস্তুত হয়। জেঠা বক্তার বক্তৃতা এই নিমিষের ন্যায়। সার অতি অল্পই থাকে, কিন্তু তিনি তাহা ফেনাইয়া ফেনাইয়া মস্ত করিয়া তুলেন। তিনি গুটিকতক পুরাতন পচা কথা লইয়া তিন ঘণ্টা কাটাইতে পারেন। জেঠা বক্তার বক্তৃতাতে এই কয়টি কথা থাকিবেই থাকিবে:—'পূর্ব পশ্চিম এক করা' 'হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত' 'জয়-পতাকা উড্ডীন' ইত্যাদি। তাঁহার বক্তৃতার শেষে 'উত্থান কর, জাগ্রত হও, আর কতকাল আলস্য-শয্যায় শয়ান থাকিবে' এই কথাগুলি চাইই চাই। কোনো কোনো জেঠা বক্তা নম্রতার ভান করিয়া বক্তৃতার প্রথমে বলেন যে 'যদ্যপিও এই বিষয় বলা আমার ক্ষমতার অতীত

তথাপি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।' ইহা খুড়ামির আকারে জেঠামো! কোনো কোনো জেঠা বক্তা বক্তৃতার প্রারম্ভে বলেন যে 'আমি এ-বিষয়ে বলিতে প্রস্তুত হইবার সময় পাই নাই।' কিন্তু হয়তো বাড়ী হইতে সমস্ত বক্তৃতা মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন! আরও বলেন যে 'বন্ধুগণের অনুরোধে আমি এ বিষয় বলিতে আসিয়াছি' কিন্তু হয়তো বক্তৃতা করিবার লালসায় তাঁহার প্রাণ ছটফট করিতেছিল! ইহার পর জেঠা রিফর্‌মর। জেঠা রিফর্‌মেরা সহরের বড়ো বড়ো সভায় রিফর্‌মেশন ফলান। কথা শুনিয়া বোধহয় তাঁহারা রাতারাতি ভারতবর্ষকে বিলাত করিয়া তুলিবেন কিন্তু কাজে সব ফাঁকি। তাঁহাদিগের ছোটো ছোটো অনেক সভা আছে। সে সকল সভার সাংবৎসরিক অধিবেশন মহা সমারোহপূর্বক সম্পন্ন হয়, তাহাতে রাঙা মুখের বিলক্ষণ ছড়াছড়ি হইয়া থাকে; কিন্তু মাসিক অধিবেশন হয় না কেন ইহা নরলোকের বুদ্ধির অগম্য। তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন, স্ত্রীলোকের দুঃখে তাঁহাদিগের চক্ষে জল ধরে না, কিন্তু তাঁহাদিগের বাটীর স্ত্রীলোকের বর্ণ পরিচয় হইয়াছে কিনা সন্দেহ! তাঁহারা সামান্য লোকের সঙ্গে পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছা করেন না। বিলাতের বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। ইঁহারা কোনো একটি সামান্য কীর্তি করিলে যাহাতে তাঁহাদিগের নাম সংবাদপত্রে উঠে এইজন্য সম্পাদকদিগের বিলক্ষণ খোসামোদ করিয়া থাকেন। জেঠা রিফর্‌মরদের রিফর্‌মেশন প্রধানতঃ বোতলেই পর্যাপ্ত হয়। পূর্বে লোকের কোন উপজীবিকা না থাকিলে গুরুমহাশয় অথবা কবিরাজের ব্যবসা অবলম্বন করিত, এক্ষণে লোকের অন্য কোন জীবনোপায় না থাকিলে সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়েন। বিদ্যা যত না থাকুক তাহার অভাব জেঠামি দ্বারা পূরণ করেন। ইঁহারা সবজান্তা! এমন তত্ত্ব নাই যাহা উঁহারা অবগত নহেন। ইস্তক 'কানাইয়ে ঠেলা' হইতে নাগাত 'দণ্ডগ্রহণ' পর্যন্ত এমন বিষয় নাই যাহাতে ব্যাপকতা না করিতে পারেন। আমরা এই শ্রেণীভুক্ত জেঠা।

কিন্তু সকল জেঠা অপেক্ষা বিরক্তিকর বালক জেঠা ও মেয়ে জেঠা অথবা জেঠাইমা! বালক জেঠার জ্বালায় আমরা অস্থির হইয়াছি! গলা টিপিলে দুধ বেরোয় অথচ ভারি ভারি বিষয়ে বিজ্ঞতা ফলাইতে চেষ্টা করে। ইহারা অল্প বয়সে চশমা ব্যবহার করে ও নস্য লয়। বালকদিগের সম্বন্ধে জেঠামি অত্যন্ত অনিষ্টকর। যে বালক জেঠিয়ে যায় তাহাদের আর ভদ্রস্থ নাই। তাহাদের লেখাপড়ার বিষয়ে জলাঞ্জলি। বাঙালী বালকেরা অন্য দেশের বালক অপেক্ষা শীঘ্র এঁচোড়ে পাকিয়া যায়। অন্য দেশীয় বালকেরা ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বালকবৎ ব্যবহার করে; কিন্তু বাঙালী ঐ বয়সে পরম বিজ্ঞ হইয়া ওঠে ও বিলক্ষণ জেঠামি আরম্ভ করে! নিতান্ত ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষে বড়ো বড়ো বিস্বাদ আম্র ফলিলে যেমন খারাপ, বালক জেঠারা তদ্রূপ। বালক জেঠাদিগের প্রায় এই দুর্দশা ঘটিয়া থাকে যে তাহারা প্রকৃত জেঠার বয়স প্রাপ্ত হইলে খুড়ার ন্যায় লোকের নিকট প্রতীয়মান হয়; প্রকৃত বিজ্ঞতা কখনো লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এক্ষণে আমাদের দেশে মেয়ে জেঠার সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু মনে এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইতেছে যে, আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষা যত বিস্তৃত হইবে ততই ঐ শ্রেণীর জেঠা বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষণেই বসন্ত-প্রারম্ভের কুসুমের ন্যায় দুই একটি দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদিগের কোনো বন্ধু সেদিন আমাদিগের নিকট গল্প করিতেছিলেন যে, তিনি রেলের গাড়িতে একটি জেঠাইমার হস্তে পড়িয়াছিলেন! জেঠাইমা ধর্ম-সংস্কারের বিষয় কিছুই বুঝেন না কিন্তু সে বিষয়ে বিলক্ষণ জেঠাইমো করিতেছিলেন! আমাদিগের বন্ধুকে তিনি বিশেষরূপে আক্রমণ করিলেন, বন্ধু 'ত্রাহি মধুসূদন' করিতে লাগিলেন। কি ভাগ্য যে গাড়ি শীঘ্র আড্ডায় আসিয়া পৌঁছিল, তা না হইলে তাঁর কি দশা হইত বলা যায় না। আমাদিগের আর একটি বন্ধু প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। তিনি আমাদের নিকট একদিন গল্প করিতেছিলেন যে তাঁহার কোনো গ্রন্থ রচনার সময় তাঁহার কোনো সুহৃদ তাঁহার নিকট করযোড়ে বলিলেন যে, দোহাই তুমি এ-গ্রন্থখানি

রচনা করিও না। আমার বাড়িতে আমার শালী থাকেন, তিনি একজন শিক্ষিতা স্ত্রীলোক, তাঁহার জেঠাইমোতে আমার বাড়িতে তিষ্ঠানো ভার হইয়াছে। তোমার এ-গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে তাঁহার জেঠাইমো আরও বৃদ্ধি পাইবে।

বিবিধ প্রবন্ধ। ১৮৮২ ॥

ঢেঁকি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমি ভাবি কি, যদি পৃথিবীতে ঢেঁকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি? পাখির মত দাঁড়ে বসিয়া ধান খাইতাম? লাঙ্গুলকর্ণদুল্যমানা গজেন্দ্র-গামিনী গাভীর মতো মরাইয়ে মুখ দিতাম? নিশ্চয় আমি পারিতাম না—নবযুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্য কৃষাণ আসিয়া আমার পঞ্জরে যষ্টিপাত করিত, আর আমি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শৃঙ্গলাঙ্গুল লইয়া পলাইতাম। আর্যসভ্যতার অনন্ত মহিমায় সে ভয় নাই—ঢেঁকি আছে—ধান চাল হয়। আমি এই পরোপকারনিরত ঢেঁকিকে আর্য-সভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে করি—আর্যসাহিত্য-আর্যদর্শন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না। রামায়ণ, কুমারসম্ভব, পাণিনি, পতঞ্জলি, কেহ ধানকে চাল করিতে পারে না। ঢেঁকিই আর্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী,—নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। শুধু কি ঢেঁকিশালে? সমাজে, সাহিত্যে, ধর্মসংস্কারে, রাজসভায়—কোথায় না ঢেঁকি আর্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী, নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে? দুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্যসভ্যতা মুক্তিলাভ করিল না, আজিও ভূত হইয়া রহিয়াছে। ভরসা আছে, কোনো ঢেঁকি অচিরাৎ তাহার গয়া করিবে।

ঢেঁকির এই অপরিমেয় মাহাত্ম্যের কারণানুসন্ধানে আমি বড়ো সমুৎসুক হইলাম। এ ঊনবিংশ শতাব্দী; বৈজ্ঞানিক সময়—অবশ্য, কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। কোথা হইতে ঢেঁকির এই কার্যদক্ষতা! এই পরোপকারে মতি! এই Public Spirit! 'নাবস্তুনা বস্তুসিদ্ধিঃ!' বিনা কারণে কি ইহা জন্মে? অনুসন্ধানার্থ আমি ঢেঁকিশালে গেলাম।

দেখিলাম, ঢেঁকি খানায় পড়িতেছে। বিন্দুমাত্র মদ্যপান করে নাই, তথাপি পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে উঠিতেছে, বিরতি নাই। ভাবিলাম, মুহুর্মুহুঃ খানায় পড়াই কি এত মাহাত্ম্যের কারণ? ঢেঁকি

খানায় পড়ে বলিয়াই কি এত পরোপকারে মতি? এতটা Public Spirit? ভাবিলাম,—না, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেননা, আমার রামচন্দ্র ভায়াও দুই বেলা খানায় পড়িয়া থাকেন, কিন্তু কই, তাঁহার তো কিছুমাত্র Public Spirit নাই। শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে তো তাঁহার পরোপকার কিছু দেখি না। আরও, মনের কথা লুকাইলে কি হইবে? আমিও—আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী স্বয়ং একদিন খানায় পড়িয়াছিলাম। দ্রাক্ষারসের বিকারবিশেষের সেবনে আমার সেই গর্তলোকপ্রাপ্তি ঘটে নাই—কারণান্তরে। প্রসন্ন গোয়ালিনী গোপাঙ্গনা-কুলকলঙ্কিনী, একদিন তাহার মঙ্গলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামাত্র মঙ্গলা ঊর্ধ্বপুচ্ছে ধাবমানা। কি ভাবিয়া মঙ্গলা ছুটিল, তা বলিতে পারি না, স্ত্রীজাতি ও গোজাতির মনের কথা কি প্রকারে বলিব? কিন্তু আমি ভাবিলাম, আমিই তাহার উভয় শৃঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য; তখন আমি কটিদেশ দৃঢ়তর বদ্ধ করিয়া, সদর্পে বদ্ধপরিকর হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়মান। পশ্চাতে সেই ভীষণা ঘটোধ্নী রাক্ষসী। আমিও যত দৌড়াই, সেও তত দৌড়ায়! কাজেই দৌড়ের চোটে ওচট্ খাইয়া গড়াইতে গড়াইতে, গড়াইতে, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে বিবরলোকপ্রাপ্তি। "আলুথালু কেশপাশ, মুখে না বহিছে শ্বাস"—হায়! তখন কি আমার হৃদয়-আকাশে Public Spirit-রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল? না হইয়াছিল, এমত নহে। তখন আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বসুন্ধরা যদি গোশূন্যা হয়েন, আর নারিকেল, তাল, খর্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে দুগ্ধনিঃসরণ হয়, তবে এই দুগ্ধপোষ্য বাঙালী-জাতির বিশেষ উপকার হয়। তাহার শৃঙ্গভীতিশূন্য হইয়া দুগ্ধ পান করিতে থাকে। সে দিন সেই বিবরপ্রাপ্তি হেতু আমার পরহিতকামনা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম, 'অয়ি দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর-নবনীত-পরিবেষ্টিতা গোপকন্যা! তুমি গরুগুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউভুসি খাইতে থাকো, তুমি স্বয়ং ঘটোধ্নী হইয়া বহুতর

দুগ্ধপোষ্য প্রতিপালন করিতে পারিবে, কাহাকেও গুঁতাইও না।' প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন হঠাৎ সম্মার্জনী হস্তে গ্রহণ করায়, সেদিন আমাকে পরহিতব্রত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য, 'সাধারণ আত্মা' অর্থাৎ Public Spirit, বিশেষতঃ কার্যদক্ষতা, এসকল খানায় পড়িলে হয় কিনা? যদি না হয়, তবে ঢেঁকির এ কার্যদক্ষতা, এ মহাবল কোথা হইতে আসিল? আমি এই কূটতর্কের মীমাংসার জন্য সন্দিহান চিত্তে ভাবিতেছিলাম, এমত সময় মধুর কণ্ঠে কে বলিল, "চক্রবর্তী মহাশয়, হাঁ করিয়া কি ভাবিতেছ? ঢেঁকি কখনও দেখ নাই?"

চাহিয়া দেখিলাম, তরঙ্গিণী, মাতঙ্গিনী, দুই ভগিনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে। সে দিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। হাতি দেখিতে গিয়া অন্ধ কেবল শুণ্ড দেখিয়াছিল, আমিও ঢেঁকির শুঁড় দেখিতেছিলাম। পিছনে যে দুই জনের দুইখানি রাঙা পা ঢেঁকির পিঠে পড়িতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই। দেখিবামাত্র যেন কে আমার চোখের ঠুলি খুলিয়া লইল।

আমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল—কার্যকারণ সম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূর্যকিরণে প্রভাসিত হইল! ঐ তো ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ। ঐ রমণী-পাদপদ্ম। ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে। উঠিয়া পড়িয়া ঢক ঢক কচ কচ! কত পরোপকারই করিতেছে! হায় ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত গুণ! পিঠে খাইয়া তুমি এই সাতকোটি বাঙালীকে অন্ন দিতেছ—তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছ। এস মেয়ে-মানুষের শ্রীচরণ! তুমি ভালো করিয়া ঢেঁকির পিঠে পড়ো, আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া তোমায়—হায়! কি করিব? কাঁসার মল পরাই।

আর ভাই ঢেঁকির দল! তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধি বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে রমণীপাদপদ্ম ওরফে মেয়েলাথি পড়ে, তখনই তোমরা ধান

ভানো—নহিলে কেবল কাঠ—দারুময়—গর্তে শুঁড় লুটাইয়া লেজ উঁচু করিয়া ঢেঁকিশালে পড়িয়া থাকো। বিদ্যার মধ্যে খানায় পড়া, আনন্দের মধ্যে ধান্য, পুরস্কারের মধ্যে সেই রাঙা পা—আবার শুনিতে পাই, তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আছে নাকি ? ঘরে থাকিয়া নাকি মধ্যে মধ্যে কুমির হও ? আর ভাই ঢেঁকি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনিয়াছি, সত্য সত্যই কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয়। দেবতারা সকলে অমৃত খায়, পারিজাত লোফে, অপ্সরা লইয়া ক্রীড়া করে, মেঘে চড়ে, বিদ্যুৎ ধরে, রতি-রতিপতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে—তুমি নাকি ততক্ষণ কেবল ঘেচর ঘেচর করিয়া ধান ভানো। ধন্য সাধ্য ভাই তোমার!

ঢেঁকি কোনো উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম—একেবারে কমলাশ্রমে। কমলাশ্রমটা কি ? ৺নসীবাবু সম্প্রতি ধান ভানিতে গিয়াছেন। নিপ্রত্যাশী নাপিতানী একখানি ভাঙা চালাঘর রাখিয়া উত্তরাধিকারী-বিরহিতা হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে—ঘরখানির এমন অবস্থা যে, আর কেহ তাহার কামনা করিল না—সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি, কেবল কমলাকান্তের আশ্রম নহে, সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম। আমি সেইখানে চারপায়ীর উপর পড়িয়া আফিং চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুজিয়া আসিল, জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। দেখিলাম, এ সংসারে কেবল ঢেঁকিশাল। বড়ো বড়ো ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেঁকিশাল—তাহাতে বড়ো বড়ো ঢেঁকি গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কোথাও জমিদাররূপ ঢেঁকি প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া নূতন নিরিখরূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্নভোজন করিতেছেন, কোথাও আইনকারক ঢেঁকি মিনিট-রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া-ভাঙিয়া বাহির করিতেছে—আইন, বিচারক-ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র্য, কারাবাস, ধনীর ধনান্ত, ভালোমানুষের দেহান্ত। বাবু-ঢেঁকি বোতল গড়ে পিতৃধন

পিষিয়া বাহির করিতেছে পিলে, যকৃৎ; তাঁর গৃহিনী-ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষিয়া বাহির করিতেছে—অনাহার! সর্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম, লেখক-ঢেঁকি সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—স্কুলবুক।

দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি; কমলাশ্রমে লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছি; নেশার গড়ে মনোদুঃখ-ধান্য পিষিয়া দপ্তর-চাউল বাহির করিতেছি। মনে মনে অহংকার জন্মিল—এমন চাউল তো কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখন ইচ্ছা হইল, এ চাউল মনুষ্যলোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভানিব। তখনই স্বর্গে গেলাম—'অশ্বমনোরথে' স্বর্গে গিয়া দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "হে দেবেন্দ্র! আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি—স্বর্গে ধান ভানিব।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "আপত্তি কি? পুরস্কার চাই কি?"

আমি। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা।

দেবরাজ। উর্বশী মেনকা পাইবে না। আর যাহা চাহিলে, তাহা তো মর্ত্যলোকেও তুমি পাইয়া থাক—আটটার হিসাবে।

আমি দুর্মুখ—বলিলাম, "কি ঠাকুর, অষ্টরম্ভা? সে কি আজকাল নরলোকের পাবার যো আছে? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে।"

সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ আমাকে বকশিশ হুকুম করিলেন, এক সের অমৃত, আর এক ঘণ্টার জন্য উর্বশীর সংগীত! চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, পাশে ঘটিতে এক সের দুগ্ধ, আর প্রসন্ন দাঁড়াইয়া চিৎকার করিতেছে—'নেশাখোর,' 'বিটলে,' 'পেটার্থী' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উর্বশীকে বলিলাম, "বাইজী, এক ঘণ্টা হইয়াছে—এখন বন্ধ করো।"

কমলাকান্তের দপ্তর। ১২৯২ বঙ্গাব্দ॥

কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা

হুতোম প্যাঁচা

শৌখিন চড়কপার্বণ শেষ হলো বলেই যেন দুঃখে সজ্‌নে খাড়া ফেটে গেলেন। রাস্তার ধুলো ও কাঁকরেরা অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগলো। ঢাকিরা ঢাক ফেলে জুতো গড়তে আরম্ভ কল্লে। বাজারে দুদ সস্তা হলো (এতদিন গয়লাদের জল মেশাবার অবকাশ ছিলো না), গন্ধ-বেনে ভালুকের রোঁ বেচতে বসে গেলেন। ছুতরেরা গুলদার ঢাকাই উড়ুনিতে কাঠের কুচো বাঁদ্‌তে আরম্ভ কল্লে। জন্মফলারে যজমেনে বামুনেরা আদ্যশ্রাদ্ধ, বাৎসরিক সপিণ্ডীকরণ টাঁক্‌তে লাগলেন—তাই দেখে গরমি আর থাক্‌তে পাল্লেন না, "ঘরে আগুন," "জলে ডোবা," ও "ওলাউঠো" প্রভৃতি নানা রকম বেশ ধরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়্‌লেন।

রাস্তার ধারের ফোড়ের দোকান, পচা লিচু ও আঁবে ভ'রে গ্যালো। কোথাও একটা ভুত্‌ড়ির উপর মাছি ভ্যান ভ্যান কচ্চে, কোথাও কতকগুলো আঁবের আঁটি ছড়ানো রয়েছে, ছেলেরা আঁটি ঘষে ভেঁপু করে বাজাচ্চে। মধ্যে এক পশলা বিষ্টি হয়ে যাওয়ায় চিৎপুরের বড়ো রাস্তা ফলারের পাতের মতো দ্যাখাচ্চে,—কুটিওয়ালারা জুতো হাতে ক'রে বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার নীচে আর রাস্তার ধারের বেনের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন,—আজ ছক্কড় লহলে পোহাবারো!

কলকেতার কেরাঞ্চি গাড়ি বেতো রোগীর পক্ষে বড়ো উপকারক, গ্যালব্যানিক শকের কাজ করে। সেকেলে আসমানি দোলদার ছক্কড় যেন হিন্দুধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকেতা থেকে গাঢাকা হয়েচে—কেবল দুই একখানা আজও খিদিরপুর, ভবানীপুর, কালীঘাট আর বারাসতের মায়া ত্যাগ কত্তে পারেনি বলেই আমরা কখনো কখনো দেখতে পাই।

০

"চার আনা!" "চার আনা!" "লালদিকি!" "তেরজুরী!"

এসো গো বাবু ছোট আদালত!” ব’লে গাড়োয়ানরা শৌখিন স্বরে চিৎকার কচ্চে,—নবদ্ধাগমনের বউয়ের মতো দুই এক কুটিওয়ালা গাড়ির ভিতর বসে আচেন—সঙ্গী জুটচে না। দুই এক জন গবর্মেণ্ট আপিসের ক্যারানী গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরের কসাকসি কচ্চেন। অনেকে চ’টে হেঁটেই চলেচেন,—গাড়োয়ানরা হাসি টিটকিরির সঙ্গে “তবে ঝাঁকা মুটেয় যাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম নয়!” কমপ্লিমেণ্ট দিচ্চে!

দশটা বেজে গ্যাচে। ছেলেরা বই হাতে ক’রে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেচে। মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে ক’রে আফিমের দোকান ও গুলির আড্ডায় জম্‌চেন। হেটো ব্যাপারীরে বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে। কলকেতা সহর বড়ই গুল্‌জার,—গাড়ির হর্‌রা, সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠচে—বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড়ো সোজা কথা নয়।

* * *

বারো জনে একত্র হ’য়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মড়ক হ’তেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি ‘মা’ ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ারদলে গিয়ে পড়েন। মহাজন, গোলদার, দোকানদার ও হেটোরাই বারোইয়ারি পূজার প্রধান উদ্যোগী। সংবৎসর যার যত মাল বিক্রি ও চালান হয়, মণ পিছু এক কড়া, দু কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসাবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে দুই এক বৎসরের দস্তুরি বারোইয়ারি খাতে জম্‌লে মহাজনদের মধ্যে বর্ধিষ্ণু ও ইয়ার-গোচের শৌখিন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা হয়। তিনি বারো-ইয়ারি পূজার অধ্যক্ষ হন—অন্য চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্যে ঘোরা ও বারোইয়ারি সং ও রং-তামাসার বন্দোবস্ত করাই তাঁর ভার হয়।

* * *

এখন আর সে কাল নাই; বাঙালী বড়োমানুষদের মধ্যে অনেকে,

সভ্য হয়েচেন। গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্তভস্মের চূণ দিয়ে পান খাওয়া আর শোনা যায় না। কুকুরের বিয়েয় লাখ টাকা খরচ, যাত্রায় নোট প্যালা, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ি চ'ড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান কর্তে যাওয়া সহরে অতি কম হয়ে পড়েচে। আজ্ঞা হুজুর, উঁচুগতি কার্তিকের মত বাউরি চুল, এক পাল বরাখুরে মোসাহেব, রক্ষিত বেশ্যা আর পাকানো কাছা— জলস্তম্ভ আর ভূমিকম্পোর মতো "কখনোর" পাল্লায় পড়েছে!

কায়স্থ ব্রাহ্মণ বড়ো মানুষ (পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ছাড়া) প্রায় মাইনে করা মোসাহেব রাখেন না ; কেবল সহরে দু-চার বেনে বড়ো মানুষই মোসাহেবদের ভাগ্যে সুপ্রসন্ন। বুক ফোলানো, বাঁকা সিঁতি, পইতের গোচ্ছা গলায়, কুঁচের মতো চক্ষু লাল, কানে তুলোয় করা আতর (লেখা-পড়া সকল রকমই জানেন, কেবল বিস্মৃতিক্রমে বর্ণপরিচয়টি হয় নাই) আমরা খালি সোনারবেনে বড়োমানুষ বাবুদের মজলিশে দেখতে পাই।

মোসাহেবী পেশা উঠে গেলেই 'বারোইয়ারি' 'খ্যামটা' 'চোহেল্', ও 'ফর্‌রার' লাঘব হবে সন্দেহ নাই!

সন্ধ্যা হয় হয় হয়েচে—গয়লারা দুদের হাঁড়া কাঁদে করে দোকানে যাচ্চে। মেচুনীরে আপনাদের পাটা, বঁটি ও চুবড়ি ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্চে। গ্যাসের আলো জ্বালা মুটেরা মই কাঁদে করে দৌড়ুচ্চে— থানার সামনে পাহারাওলাদের প্যারেড (এঁরা লড়াই করবেন, কিন্তু মাতাল দেখে ভয় পান) হ'য়ে গিয়েচে। ব্যাঙ্কের ভেটো কেরানীরে ছুটি পেয়েচেন। আজ এ সময় বীরকৃষ্ণ দাঁর গদিতে বড় ধুম— অধ্যক্ষেরা একত্র হ'য়ে কোন কোন রকম সং হবে, কুমোরকে তারই নমুনো দেখাবেন ; কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের করবে ; দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত!

ফৌজদুরী বালাখানা থেকে কুড়িটি বেল লাল্‌ঠন (রং বেরং—সাদা, গ্রীন, লাল) টাঙানো হয়েচে। উঠোনে প্রথমে ঘর, তার উপর দরমা,

তার উপর মাদ্‌রাজী খেরোর জাজিম হাস্‌চে। দাঁড়িপাল্লা, চ্যাটা, কুলো ও চালুনীরে গণি ব্যাগ ও ছেঁড়া চটের আশপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মাচ্চে—আজ তারা ঘর-জামাই ও অন্নদাস ভাগ্‌নেদের দলে গণ্য !!

* * *

পাঠক ! নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মতো অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মতো ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠ্‌লো। বড়ো বড়ো বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুন্‌সি, ছিরে বেনে ও পুঁটে তেলি রাজা হলো। সেপাই পাহারা আসা সোটা ও রাজা খেতাব, ইণ্ডিয়া রবরের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মতো, রাস্তায় পাঁদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড়ো বড়ো ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ আখ্‌ড়াই, ফুল আখ্‌ড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্ম গ্রহণ কল্লে। সহরের যুবকদল গোমুরী, ঝকমারি ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগদী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠলো। এই সময়ে হাফ আখ্‌ড়াই ও ফুল আখ্‌ড়াই সৃষ্টি হয় ও সেই অবধি সহরের বড়ো মানুষরা হাফ্‌ আখ্‌ড়াইয়ে আমোদ কত্তে লাগলেন। শ্যামবাজার, রামবাজার, চক ও সাঁকোর বড়ো বড়ো নিষ্কর্মা বাবুরা এক এক হাফ আখ্‌ড়াই দলের মুরুব্বী হলেন। মোসাহেব, উমেদার, পাড়া ও দলস্থ গেরস্তগোছ হাড়হাবাতেরা শৌখিন দোহরের দলে মিশলেন। অনেকের হাফ আখ্‌ড়াইয়ের পুণ্যে চাকরি জুটে গ্যালো। অনেকে পুজুরী দাদাঠাকুরের অবস্থা হ'তে একেবারে আমির হ'য়ে পড়লেন—কিছু দিনের মধ্যে তক্‌মা, বাগান, জুড়ি ও বালাখানা ব'নে গ্যালো !

নকশা। ১৮৬২ ॥

কোকিল

চন্দ্রনাথ বসু

লোকে বলে কোকিলের রূপ নাই, কোকিল কুৎসিত—কেননা কোকিল কালো। স্বীকার করি, নানা রঙে রঞ্জিত সুকোমল-পক্ষবিশিষ্ট অনেক পক্ষী আছে—তাহারা কোকিল অপেক্ষা সুন্দর। তাহাদের মধ্যে অনেকের সৌন্দর্যে অপূর্ব কমনীয়তা, অনেকের সৌন্দর্যে জ্যোতি, অনেকের সৌন্দর্যে অপূর্ব কান্তি, অনেকের সৌন্দর্যে অপূর্ব মহিমাও লক্ষিত হয়। কোকিল কালো—অতএব কোকিলের সেরূপ সৌন্দর্য নাই। কিন্তু কালো বলিয়াই কি কোকিল কুৎসিত ? কালো জল সুন্দর, কালো মেঘ সুন্দর, কালো চুল সুন্দর। তবে কালো কোকিল সুন্দর নয় কেন ? তুমি বলিবে—কেন তাহা বলিতে পারি না, তবে কুৎসিত দেখি, তাই বলি কালো কোকিল কুৎসিত। আমি বলি—তুমি সৌন্দর্য দেখিতে জানো না, তাই কালো কোকিলকে কুৎসিত দেখ। দেখ, কালো জল কালো বলিয়া সুন্দর নয়; তাহা হইলে এই যে কালো কালিতে লিখিতেছি, ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই হইত না। কালো জলে নক্ষত্র-খচিত নীল আকাশের ছবি উঠে বলিয়া কালো জল সুন্দর। তেমনি কালো মেঘ অমৃতবৎ বারি বর্ষণ করিয়া কালো জলের সহিত কথা কয় বলিয়া সুন্দর। আর কালো চুল সতীর পায় লুটায় বলিয়া সুন্দর। ভালোর সম্পর্কে থাকিয়াই কালো ভালো। ছেলে নাড়ীছেঁড়া ধন বলিয়াই জননীর চক্ষে তাহার কালো রঙ এত সুন্দর। কালো কোকিলের কি এমন কিছুই নাই, যাহার গুণে তাহাকে কুৎসিত না দেখিয়া সুন্দর দেখি ? তুমি বলিবে—কিছুই তো নাই, থাকিলে তাহাকে কুৎসিত দেখিব কেন ? আমিও এই কথার একটি মীমাংসা করিব বলিয়া আজ কোকিলের কথা পাড়িয়াছি।

কোকিল অনেক দিনাবধি কবিদিগের সম্পত্তি। কবিরা কোকিলকে লইয়া অনেক খেলা খেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোকিলকে চিনিতে

পারেন নাই। তাই আজ কোকিল এত কুৎসিত পাখি। কবিরা বলেন যে, কোকিলের স্বরে বিষ বই আর কিছুই নাই—যে মধু আছে তাহাও বিষমাখা। কিন্তু কোকিলের স্বরে বিষ বই কি আর কিছুই নাই? সেই সুললিত, সুমধুর, সুঠাম, সর্বাঙ্গসুন্দর, সতেজ, হোমাগ্নি-শিখার ন্যায় পূর্ণাবয়ব, স্বতঃ-উৎপন্ন, স্ফূর্তিবৎ কু-উ ধ্বনিতে কি বিষ থাকিতে পারে? খলতাশূন্য, গ্লানিশূন্য, সরল বালক সমস্ত রাত্রি সুখের ঘুম ঘুমাইয়া, শেষ-নিশাতে দিবসের খেলার স্বপ্ন দেখিতেছে। গৃহপার্শ্বস্থ কাননে কোকিল কু-উ করিয়া উঠিল। বালক আহ্লাদে মাতিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া খেলা করিতে ছুটিল। কোকিল ডাকিয়াছে আর তাহাকে ধরে কে? কোকিলের স্বরে বিষ কই? কোকিলের স্বর তমসাচ্ছন্ন জগৎকে ফুটাইয়া দিল; নিদ্রিত বিষাদমণ্ডিত দিঙ্মণ্ডলকে হাসাইয়া তুলিল; সমস্ত শিরায় রক্তস্রোত ছুটাইয়া দিল; সর্বশরীরে এক অপূর্ব আনন্দ-তড়িৎ হানিল। কোকিলে কু-উ ধ্বনি ঐন্দ্রজালিকের নিঃশ্বাস!

আবার বালককে ছাড়িয়া বাল-সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখ। তমসাবৃত সুদূর গগনপ্রান্ত ঈষৎ লাল রঙে রঞ্জিত হইয়াছে। অন্ধকারের প্রাণের ভিতর চোরের ন্যায় নিঃশব্দে এবং অলক্ষিতে একটু একটু করিয়া অস্পষ্ট আলোক প্রবেশ করিতেছে। এখানে ওখানে কোথায় কি যেন আস্তে আস্তে খুস্ খাস্ করিতেছে—ঠিক বলিতে পারা যায় না, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন শূন্যে কোন একটা শব্দের নিস্তব্ধ রকম প্রতিধ্বনি শুনা গেল। যেন কানের কাছে একটা গাছের পাতা আস্তে আস্তে নড়িয়া উঠিল। যেন কোথায় কে রুদ্ধকণ্ঠে 'আব্', 'হাম্' এইরূপ একটা শব্দ করিল। নিদ্রিত মনুষ্য যেন গভীর সমুদ্রতল হইতে একটু একটু করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়া সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসিয়া পড়িল—তাহার মুদ্রিত চক্ষের পল্লবের ভিতর একটু একটু আলো খেলা করিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটা ফুটিলো-ফুটিলো বোধ হইতেছে। এমন সময়ে যেন সমস্ত ফোটনোন্মুখী পৃথিবীখান্না কু-উ শব্দ করিয়া উঠিল,—আর একেবারে বনে পাখি পাখা ঝাড়া দিয়া উঠিল, গ্রামে মানুষ 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া উঠিল, পূর্বদিকে একটা

প্রকাণ্ড রাঙা গোলা হুস্ করিয়া উঠিয়া পড়িল, চারিদিক ফরসা হইয়া গেল। কালো কোকিল ব্রহ্মাণ্ডটাকে ফুটাইয়া দিল!

কোকিলের কু-উ স্বরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্ফোট একীভূত। সেই বিশাল স্ফোটের অপূর্ব সংগীত কোকিলের কালো কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হয়। জগতে যত কিছু অপূর্ব স্ফোট, অপূর্ব বিকাশ, অতুল উন্নতি আছে, সবই যেন কোকিলের অপূর্ব কু-উ ধ্বনি। প্রস্ফুটিত ফুল, প্রস্ফুটিত শিশু, প্রস্ফুটিত যুবা,—হোমরের ইলিয়দ, কালিদাসের কুমার, সেক্সপিয়রের ম্যাক্‌বেথ, শেলীর স্কাইলার্ক, ফিদিয়সের যুপিতর,—বীরশ্রেষ্ঠ গর্দন, দয়াবতার হাউয়ার্ড, প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য, জ্ঞানোন্মত্ত শঙ্কর, ব্রহ্মাণ্ডরূপী ব্যাস—সকলই এক এক অপূর্ব কু-উ ধ্বনি!

ফুল ও ফল। ভাদ্র ১৩০৯॥

রসিকতা

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

এই বঙ্গদেশ রসিকতার সমুদ্রবিশেষ। পৌরাণিকেরা ক্ষীর লবণ প্রভৃতি সপ্ত সমুদ্রের বিবরণ লিখিয়াছেন। যদি তাঁহারা বঙ্গভূমির আধুনিক ইতিহাস দিব্যনেত্রে পাঠ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহাকে রস-সমুদ্র নাম দিয়া, পুরাণ-প্রসিদ্ধ ভূগোল-শাস্ত্রে সমুদ্রের সংখ্যা সাত না লিখিয়া আট লিখিতেন। জ্ঞানানন্দের অভিধানে বঙ্গের এক নাম দাস নিবাস, আর এক নাম রসবিলাস। কেন না, এদেশের সকলেরই ললাটপট্টে দাসত্বের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-রেখা এবং অধরে ও নয়নপ্রান্তে রসিকতার মধুরলাঞ্ছন, সকল সময়ে সমানরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পুত্রকন্যা কি ভ্রাতা ভগিনীর নাম রাখিতে হইবে,—বাঙালী তখনও রসিক। কারণ, পুত্রের নাম রসরাজ কি রসিকচন্দ্র, কন্যার নাম রসময়ী চৌধুরানী। ভ্রাতার নাম প্রাণনাথ দত্ত, কি রতিকান্ত রায়; ভগিনীর নাম অনঙ্গমঞ্জরী; নামে এইরূপ অসাধারণ রসিকতা পৃথিবীর আর কোন দেশে দৃষ্ট হইয়াছে?

দেশবিশেষের নামাবলী-পাঠ এক হিসাবে সেই দেশের প্রকৃতি পাঠ। বৃটনেরা জ্ঞানে গুণে, বৈজ্ঞানিকবলে এবং রাজনীতির কৌশলে আজিকালি সমস্ত সভ্যজগতে শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিলেও তাঁহারা কোনো একদিন যে গর্তে বাস করিতেন ও আম-মাংস ভালবাসিতেন, এবং এইক্ষণও তাঁহাদিগের বাস্তুরাজ্যে ডারউইনের বিজ্ঞান-বিনোদিনী কল্পনা যে বিরাজ করিতে পারিতেছে, তাঁহাদিগের নামেই তাহার নিদর্শন। কারণ, যদিও তাঁহাদিগের মিল, মেকলে প্রভৃতি ঐতিহাসিক-বর্গ পরকীয় জাতিচরিত ও সাহিত্যাদির সমালোচনায় ক্ষুরধারতীক্ষ্ণতা অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর পুরাণতম জাতিকেও অকুণ্ঠিত কণ্ঠে অসভ্য বলিয়া গালি দিতেছেন, এবং ভাষাতত্ত্বের ভাষ্যস্বরূপ দেবজনস্পৃহণীয়

সংস্কৃত ভাষাকেও বিকটবুলি জ্ঞান করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে Fox (শৃগাল), Wolf (বৃক), Savage (বন্যবর্বর), Hogg (শূকর) ও Badcock (মন্দকুক্কুট) প্রভৃতি শ্রুতিমধুর ও মধুরার্থক নামসমূহ সাহিত্যে গ্রথিত ও সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, এবং লোকে অদ্যাপি এই সকল নাম সাদরে গ্রহণ ও সসম্মানে ব্যবহার করিতেছে। স্বামী দিবসের পরিশ্রমের পর ক্লান্তকলেবরে গৃহে আসিতেছেন, গৃহলক্ষ্মী প্রেমভরে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছেন,—'হে শৃগাল, হে শৃগাল'! অথবা—'হে বৃক, হে বৃক'! পুনরপি বলিতেছি, কি মোহন ধ্বনি, কি মধুর! বঙ্গীয় কুলকামিনীরা ক্লান্তকলেবর কান্তকে 'হে শৃগাল', অথবা 'হে বৃক' বলিয়া সম্ভাষণ করেন না বটে, কেন না বাঙালী রসিক। কিন্তু রসিকতার অনুরোধে বাঙালীর নামাবলী যে মূর্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা পুরুষের শোভা পায় কি না এবং পুরুষের তাহাতে তৃপ্তিলাভ সম্ভব কি না, ইহা গভীর সন্দেহের বিষয়। অথবা ইহাতে সংশয় ও বিস্ময়ের কথা কি? যাঁহারা ভারত-উদ্ধারের জন্য আদ্ধার তালে গীত গাইতে পারেন, এবং তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া নাচনিচ্ছন্দের অশ্রাব্য কবিতায় জাতীয় হৃদয়ের মর্মনিহিত শোকবহ্নি উদ্গারণ করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ বীরেন্দ্র-কেশরী, সুরসিক ধুরন্ধর পুরুষদিগের নাম কামিনীকান্ত, যামিনীকান্ত, কুমুদিনীকান্ত ও বিনোদিনীকান্ত এবং রমণীমোহন ও সুন্দরীমোহন অথবা 'দলিতাঞ্জন পুঞ্জগঞ্জন' ও ভামিনীরঞ্জন ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কবিসমাজের কীর্তিস্তম্ভ শেক্ষপীর কহিয়াছেন—

"নামে কি করে,
গোলাপ, যে নামে ডাক, সৌরভ বিতরে।"

আমরা অকবি, সুতরাং একথা আমরা মানিতে পারি না। আমাদিগের এই বিশ্বাস যে, নামে আর কিছু না করুক, উহা দেশীয় রুচি এবং সাময়িক প্রকৃতির অন্তস্থল পর্যন্ত প্রদর্শন করে।

প্রাচীন আর্যবীরদিগের নাম ভরত, শত্রুঘ্ন, ভীষ্মার্জুন, বলদেব, বসুদেব, দুর্যোধন, ভীম ; ঋষিদিগের নাম ব্যাস, বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ;— শাস্ত্রকারদিগের নাম পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, কণাদ ; এবং দেশস্থ সাধারণ ভদ্রলোকদিগের নাম শতানন্দ, শাকটায়ন। যখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি মাননীয় আর্যগণ বঙ্গে প্রথম সমাগত ও উপনিবিষ্ট হইলেন তখন এই বঙ্গেরই বাঙালীদিগের নাম শূরসেন ও বীরসেন, বিজয় ও বল্লাল এবং সেই সমাগত মহানুভাব-দিগের নাম দক্ষ, বেদগর্ভ, মকরন্দ ও বিরাট। তাহার পর যবন অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব সময়ে বঙ্গভূমি যখন অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন এবং সর্বথা অধোগতি প্রাপ্ত হইল, শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোতে ভাটা লাগিল, বিদ্যা-বুদ্ধি ও মহত্ত্বের গৌরব পরপাদুকা-লেহন জন্য নূতন গৌরবের নিকট হীনপ্রভ হইয়া পড়িল, তখন তাঁহাদিগের নাম হইল, আই, চাই, কচু, ঘেচু, বিক, কোক ইত্যাদি।* এইক্ষণ বহুদিনের পর বহুযুগের তপস্যার পর বিলাস-সমুদ্রে ভাসমান সুশিক্ষিত, সুসভ্য, সুরুচিসম্পন্ন বাঙালী বীরদিগের নাম হইয়াছে রমণী, কামিনী, মানিনী, ভামিনী, কুমুদিনী, বিনোদিনী, রাই, কিশোরী।† ইহার পর কোনোদিন হয়তো কোন এক সুরসিক বাঙালী ব্রজবিলাস যাত্রায় জয়দেবের গীত শুনিয়া আত্মজের নাম রাখিবেন,—"ললিতলবঙ্গলতাবল্লভ" এবং অনুজের নাম রাখিবেন,— "প্রেমময়ী পদ-পঙ্কজ"। তিনকালের ত্রিবিধ রুচি, সুতরাং ত্রিবিধ নাম।

পূর্বে যেমন আমরা বাংলার ভারতউদ্ধাররত বীরভদ্রদিগের

* কুলাচার্যদিগের গ্রন্থে এইরূপ নামের অভাব নাই।

† এ-দেশের পুরুষদিগকে নামের সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে পুরুষেরা ইদানীং অনেকস্থলে এইরূপ সম্ভাষণ করিতে বাধ্য হন, "অ' সুন্দরী! অ' বিনোদিনী!" আবার মেয়েরা মেয়েদিগকে ব্রজেন্দ্র ও সুরেন্দ্র বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কারণ, পুরুষের নাম সুন্দরীমোহন ও অবলার নাম ব্রজেন্দ্রকিশোরী কি সুরেন্দ্রবালা হইলে ইহা বই আর কিরূপে সম্বোধন হইতে পারে?

নামাবলী পাঠ করিয়াছি, যে সকল অমূল্য গ্রন্থের দ্বারা সেই ভারত উদ্ধার লাভ করিবে, পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা এস্থলে তাহারও দুই একটি নাম উল্লেখ করিতে পারি। বাঙালীর মস্তিষ্কসম্ভূত বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থমালার নাম চিন্তামণিদীধিতি, শব্দশক্তি-প্রকাশিকা, শব্দতত্ত্বকৌমুদী। এইক্ষণকার গ্রন্থসমূহের নাম—'হায় কি মজার শনিবার', 'হায় কি রসের নূতন বাহার' ইত্যাদি। বঙ্গদেশ কাব্যের প্রিয়নিবাস, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই রসসমূহের আকালিক উচ্ছ্বাসে এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একেবারে একসঙ্গে কবি হইয়া বসিয়াছে, এবং দুর্ভিক্ষ-দুঃখকাতরা ক্ষীণকলেবরা বঙ্গভূমি কাব্যের তটাভিঘাতী তরঙ্গতাড়নে এবং বঙ্গের কথার উৎপীড়নে অহোরাত্র থরথর কাঁপিতেছে। গ্রন্থকার চতুর্দশ বৎসরের বালক, শিক্ষকের গলগর্জনে বিদ্যালয়ে তাঁহার স্থান হইল না; গৃহিণী একাদশবর্ষীয়া বালিকা, শ্বশ্রূজনের নিষ্ঠুর গঞ্জনায় গার্হস্থ্যজীবনে তাঁহার চিত্ত রহিল না। অতএব উভয়ে মিলিয়া কবিতা লিখিলেন, 'হায় বৃথা আছি' অথবা 'হায় বৃথা কাঁদি'। অনুসন্ধান করিলে সপ্রমাণ হইবে যে, আধুনিক কবিতাপুঞ্জের অনেক কবিতাই এইরূপ রসলিপ্সু বালক বালিকার রসিকতার বিজৃম্ভণ।

কেবল বালকবালিকারাই যে এই দোষে দোষী, এমন নহে। বৃদ্ধ এবং বয়ঃপ্রাপ্ত তরুণদিগের মধ্যেও অনেকে এই রসবিকারের প্রবল স্রোতে পড়িয়া ইদানীং হাবুডুবু খাইতেছেন। এদেশের একজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন অভিনব কবি আদিরসের কবিতা লিখিতে বড়ো ভালবাসেন। আদিরসের কবিতা লিখিতে তাঁহার ক্ষমতাও আছে। ঐ প্রকার আদি-রসের কবিতা নীতিবিগর্হিত বলিয়া অনেক সময়ে যার-পর-নাই অনিষ্টকর হইলেও ভাবের আবেগে এবং ভাষার পারিপাট্যে প্রায়শঃই পাঠক-সমাজের একান্ত প্রীতিকর হইয়া থাকে। তিনি কবিতা লিখিয়াছেন, —'কেন দেখিলাম'। কবিতাটি সুন্দর ও সুখপাঠ্য এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তির লেখনীযোগ্য। অমন কবিতা ঠিক ঐরূপ উদ্দীপনী ভাষায় বাংলায়

আর কেহ লিখিতে পারে কি না, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁহার ছন্দানুবর্তনে ন্যূনতঃ একশত মস্তিষ্কশূন্য এবং শতাধিক রস-পরিচয়শূন্য অকর্মণ্য যুবা কবিতা লিখিয়াছেন,—'কেন চাহিলাম,' 'কেন চাহিলে,' 'কেন নাচিল নয়ন,' 'কেন ঝাঁপিলে বদন'। এইভাবে যেন তেন প্রকারে অদ্যাপি অনন্তকোটি 'কেন' বাংলায় লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচলিত হইতেছে। এই 'কেন' এইরূপ রসিকতার রাজ্য ছাড়িয়া আর যে যায়, এমন ভরসা কি?

যে সময়ে যুবরাজ এদেশে পদার্পণ করিলেন, প্রফুল্ল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় আনন্দলহরী বিকীরণ করিয়া ভারতে ভারতসাম্রাজ্য সংস্থাপনের জন্য উপনীত হইলেন, তখন এদেশের কাব্যকণ্ঠে ভয়ানক এক কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইল। যেই দুই তিনটি প্রকৃত কবি জাতীয় সম্মান রক্ষার অভিলাষে কবিতায় যুবরাজকে সম্ভাষণ করিলেন, অমনি কবিতার ককার-বোধ-বিরহিত সহস্র যুবা, যেন কি এক রসাবেশে আবিষ্ট হইয়া যুবরাজকে কবিতায় অঞ্চলের ধন, শ্বেতরতন বলিয়া চতুর্দিক হইতে সমস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। লোকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিল—ইহা কি? বঙ্গভূমির বাৎসল্যরস সহসা এইরূপ উছলিয়া উঠিল কেন? কিন্তু যেহেতু শুধু এক বাৎসল্যরসেই কবিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন হয় না এই নিমিত্ত বঙ্গের এক বয়োবৃদ্ধ পুরাতন কবি বঙ্গভূমিতে দর্প-সহকারে প্রবেশ করিয়া কবিতায় বর্ণনা করিলেন যে, ভারতমাতা জরতী হইলেও আজি রসভাবের উচ্ছলিত প্রবাহে পুনরায় যুবতী হইয়াছেন, এবং যৌবনের শোভা দেখাইয়া,—কেশে ফুল, কর্ণে দুল এবং কপোলে চূর্ণ-কুন্তল দুলাইয়া মদনমোহন নৃপনন্দনকে প্রেমভরে আহ্বান করিতেছেন,—অতএব যুবরাজ সানন্দে আসিয়া সমাগত হউন। এই কবিতা আমা-দিগের কল্পিত প্রলাপ নহে। ইহা লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত, ও প্রচারিত হইয়াছিল এবং সহৃদয় পাঠকবর্গ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা রসের কথা। পঞ্চবিংশতি কোটি মনুষ্যের দগ্ধপ্রাণ ভারতমাতা বলিয়া যাঁহার নাম করিতেছে দেশে-বিদেশে

শাস্ত্রার্থদর্শী সুধীপুরুষেরা যাঁহাকে সভ্যতা ও সামাজিকনীতির আদি-জননী, পরমার্থতত্ত্বের রত্নখনি এবং সকল ভাষার ভাষা-প্রসবিনী বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই আর্যাশ্রুপ্রবাহরূপা নর্মদা ও ভাগীরথীর পবিত্রবারিবিধৌতা ভারতভূমিকে চটুলনয়না নবীন নায়িকা সাজাইয়া, তাঁহাকে রাজবেশে বিভূষিত নবীন নায়কের সঙ্গে সম্মিলিত করা সামান্য কবিত্বশক্তি এবং সামান্য রসিকতার পরিচয় নহে!

ভ্রান্তিবিনোদ। ৮ই শ্রাবণ ১২৮৮॥

গগন-পটো

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

গগন-পটোকে তোমরা সকলেই দেখিয়াছ ; পথে ঘাটে দাঁড়াইয়া কত-বারই দেখিয়া থাকিবে। কিন্তু তোমরা সকলে তাহার গুণাগুণ জানো না, তাই আমাদিগকে আজ তোমাদের কাছে সেই পরিচিতের পরিচয় দিতে হইতেছে।

কারিগর লোক প্রায়ই একটু খাম্‌খেয়ালি হয় ; কেহ বদ্ মেজাজের উপর খাম্‌খেয়ালি, আর কেহ বা রসখেপার উপর খাম্‌খেয়ালি। কিন্তু গগন-পটোর মত খাম্‌খেয়ালি রসখেপা লোক আর দুনিয়ায় নাই। সে কখনও কাহারও ফর্‌মাস মত চিত্র করে না! আপনার মনে আপনার ঝোঁকে নিয়তই আঁকিতেছে, আর পুঁচিতেছে ; কিন্তু যখন যেটা দাঁড় করাইবে, সেটা একেবারে চূড়ান্ত। যেমন রং তার তেমনি 'শেড্' ; যেমন ভাব-ভঙ্গি, তেমনি অঙ্গ-সৌষ্ঠব! তাহাতেই বলিতেছিলাম, গগন-পটো খাম্‌খেয়ালি বটে, কিন্তু মস্ত কারিগর।

তবে গগনের অনেক সময় সময়-অসময়-বোধ নাই। প্রথম আলাপে সেই জন্য গগনের উপর বড়োই বিরক্ত হইতে হয় ; কিন্তু তাহার পর ঘনিষ্ঠতা হইলে বুঝা যায়, লোকটা অসাময়িক হইলেও বদ্‌রসিক নহে ; রসখেপা বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে লুকানো ছাপানো সহৃদয়তা বিলক্ষণ আছে। তবে সহিষ্ণুতা না থাকিলে, ঘনিষ্ঠতা না হইলে তাহার সেই ভাবটুকু কিন্তু বুঝিয়া উঠা ভার।

তুমি স্বজনের সদ্যোনাশে শোকে জর্জর, সংসার আঁধার দেখিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া তলদেশে মেদিনী ঘুরিতেছে, বাতাসে হুহু করিয়া সেই স্বজনের নাম ধ্বনিত হইতেছে, বুকের ভিতর বামদিকে কে যেন কীলক পুঁতিয়া দিয়াছে,— ঘোরতর বিষাদে তুমি অবসন্ন হইয়াছ। আকুলস্বরা কুলকুলনাদিনী কল্লোলিনীর তীরে তুমি অবসাদে উপবিষ্ট হইয়া আছ। দূরে গগন-পটোর চিত্রপটে তোমার দৃষ্টি পড়িল। সে যেন তোমাকেই

ভুলাইবে বলিয়া রং ফলাইয়া বসিয়াছিল ; তুমি চাহিবা মাত্রই অমনই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার পটে আঁকিতে বসিয়া গেল। শোকগম্ভীর হৃদয় সহজেই এক-মনস্ক হয়,—তুমি একমনে সেই অপূর্ব চিত্রণ দেখিতে লাগিলে। তোমার সেই স্বজনের সৌম্যমূর্তিই বা আঁকিবে! কিন্তু তা তো নয়!—ভীষণ-দংষ্ট্র একটা ভীষণ ব্যাঘ্র কাহাকে যেন কামড়াইয়া রহিয়াছে। তোমার বোধ হইল, সেই ব্যাঘ্র-দষ্ট ব্যক্তিই যেন তোমার স্বজন। তোমার বুকের শেল কে যেন নাড়িয়া দিল, তোমার মর্ম-জ্বালা হইল,—গগন-চিত্রকরকে মহানিষ্ঠুর স্থির করিয়া মহাবিরক্ত হইলে।

তুমি মুখ ফিরাইবে, এমন সময় চকিতের মধ্যে দেখিলে যে, চিত্রপটে আর সে ভয়ানক ব্যাঘ্র নাই, তোমার সেই ভূপাতিত বন্ধু সৌম্যমূর্তিতে গগনের পট শোভা করিতেছেন, আর একখানি সুন্দর হস্ত যেন তাঁহাকে আস্তে আস্তে কোথায় মন্দ মন্দ লইয়া যাইতেছে। তোমার প্রাণ যেন একটু শীতল হইল, তুমি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে ; ভাবিলে গগন-পটো খেপা হউক, আর যাই হউক—মনের কথা বুঝিতে পারে,—পোড়া মন একটু শীতল করিতে পারে। মনে যদি একবার ধারণা হয় যে, লোকটা সহৃদয় এবং তোমার ব্যথার ব্যথী, তাহা হইলেই তাহাকে ভালবাসিতে হয়। আর হৃদয় যখন শোকে তাপে গম্ভীর, তখন সেই ভালবাসাও এক দিনে—এক মুহূর্তে প্রগাঢ় হইয়া পড়ে। তুমি অন্তরের অন্তরে বুঝিলে যে, গগন তোমার ব্যথার ব্যথী, অমনই যেন তাহার উপর তোমার একটু ভালবাসা জন্মিল। তুমি নদীতীরস্থ শষ্প-শয্যায় শায়িত হইয়া একমনে, স্থিরনয়নে, গগনের খাম্‌খেয়ালির কারিগরি পর্যালোচনা করিতে লাগিলে।

গগন আঁকিল—একটা বৃহৎ কুম্ভীর, সূচল' মুখ, কর্কশ গাত্র; কণ্টকিত লাঙ্গুল, কপিশ বর্ণ, ভয়ংকর ভঙ্গি—সব ঠিক্‌ঠাক্ হুবহু,—যেন অগাধ নীল জলে সাঁতার দিতেছে। হঠাৎ কুম্ভীর দ্বিখণ্ডিকৃত হইল, গায়ের কাঁটাগুলি তুলার মত ফুলো ফুলো হইল, মুখ-কোণ সংযত হইল, রংটা কেমন একটু ঘোলা ঘোলা হইল। পরক্ষণেই দেখ, দুইটি নিরীহ

মেষ পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সেই নীল প্রান্তরে শনৈঃ শনৈঃ বিচরণ করিতেছে। তুমি ভাবিতেছ, ভয়ংকর কুম্ভীর যমজ মেঘশিশু হইল; ভাবিতে না ভাবিতেই সে চিত্র নাই। সেই মেঘদ্বয়ের স্থলে বিচিত্র বর্ণের বৃহৎ এক সদণ্ড পতাকা, খর খর বাতাসে যেন ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতেছে। স্বজন-বিয়োগ-চিন্তা তোমার মন হইতে ক্ষণেকের তরে অন্তর্হিত হইল। বিষম রসখেপা গগন তোমাকে আপনার পাগলামির কীর্তি দেখাইয়া তোমাকে হাসাইল। তোমার সেই মলিন ম্লান মুখের অধরপ্রান্তে সেই অন্তরের হাসি ঈষৎ দেখা দিল। তুমি অন্তরে বলিলে, পাগলা পটোর ভিতরের কথাটা ঠিক—সংসারের সকলই ত এইরূপ পরিবর্তনশীল, তা ঐ কেবল স্থাবর চিত্র আঁকিবে কেন?

এই চিন্তায় তুমি অন্যমনস্ক হইয়াছিলে,—দেখিলে সে বিচিত্র নিশান আর নাই,—মৃদু আভায় একটি স্থির চিতা যেন ধীরিধীরি জ্বলিতেছে। সেই চিতার মধ্যে অস্পষ্ট অবয়বে তোমার সেই স্বজনের শবমূর্তি। শবদেহ কিন্তু নিষ্প্রভ নহে,—সূর্যাস্ত-কালের পূর্বদিকের পাত্‌লা মেঘের উপর ক্ষীণ রামধনুর ন্যায় একটু হাসি যেন সেই মুখ-প্রান্তে দেখা দিতেছে, চক্ষুর্দ্বয়ের প্রশান্ত শীতল জ্যোতিঃ গগনের চিত্রান্তরে যেন স্থাপিত রহিয়াছে। সে চিত্র গগনের আর এক অপূর্ব কীর্তি। স্বর্ণময়ী একটি দিব্যাঙ্গনা সতী-স্বভাব-সুলভ লজ্জায়, অথচ প্রৌঢ়া-প্রোষিত-ভর্তৃকার স্বামি-সমাগমের আগ্রহে এবং বনশোভিনী সদ্যঃ-কুসুমিতা বসন্তলতার প্রফুল্লতা-ভরে সেই চিতার সজীব, সহাস্য শব-দেহটিকে সুকোমল হস্ত-প্রসারণে আহ্বান করিতেছেন। সেই কাঞ্চনময়ী দিব্য মূর্তিতে তুমি তোমার বন্ধুর মৃতা পত্নীর মুখশ্রী লক্ষ্য করিলে;—সেইরূপ পুরু পুরু জোড়া ভ্রূ—যেন তেমনই করিয়াই নীচের দিকে নামানো আছে, সেই স্থির নয়নে যেন তেমনই করিয়াই জ্যোৎস্না মাখানো আছে!

উপর-স্তরে দিব্যাঙ্গনা ভাসিয়া ভাসিয়া নিম্নস্তরের চিতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নিম্নস্তরের চিতাও শবদেহ লইয়া দিব্যাঙ্গনার

দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল,—কাছাকাছি হইল, তোমার চক্ষুতে জল আসিল ; চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলে সে সব আর কিছু নাই,—গগন-পটো নীল পটের এখানে সেখানে কেবল কাঁচা সোনার স্তবক আঁটিতেছে। আর তাহাতে জরদ, ধূমল, পাংশু কত বিচিত্র রঙের শেড্ দিতেছে। তুমি উঠিয়া বসিলে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে, এবার মুখ ফুটিয়া বলিয়া উঠিলে,—"গগন সকলকেই জানে,—সকলকেই চেনে ; আমরা কিন্তু উহাকে কেহই চিনিতে পারিলাম না। দেখ, আমাদের সকল সংবাদই রাখে, আমরা কিন্তু উহার কিছুই জানি না।"

গগনের কার্যসাধন হইয়াছে। তাহার সহিত একবার ঘনিষ্ঠতা করিলেই সে তাহার অস্থাবর পট দেখাইয়া তোমার কিছু-না-কিছু ভাল করিবেই। হয় তোমার মনের কবাট খুলিয়া দিবে, নয় তোমার শোকে সান্ত্বনা করিবে। কখনো হয়তো তোমার আনন্দের সংবর্ধনা করিবে, আবার কখনো হয়তো তোমাকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিবে। আজ সে তোমার শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করিয়াছে, তোমার মাথা হাল্‌কা হইয়াছে বটে,—এখন আর ঘুরিতেছে না ; বাতাস এখনও হুহু করিতেছে—এখনও পিলুরাগিণীতে ভরিয়া আছে, কিন্তু এখন তো আর তোমার বন্ধুর নাম করিয়া কাঁদিতেছে না। বুকে এখনও শেল বিঁধিয়া আছে বটে, কিন্তু তেমন করিয়া আর তো কেহ তাহাকে মোচড় দিতেছে না। গগনের কার্যসমাধা হইয়াছে। গগন তোমার শোকবহ্নির প্রখরতা নষ্ট করিয়াছে। তুমি এবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া দেখিলে, পশ্চিমের দিক্‌চক্রবাল ব্যাপিয়া ঘন সন্নিবেশিত শাল-বিটপাচ্ছাদিত পর্বতবেদীর উপর জ্বলন্ত কাঞ্চনরাগে এক অপূর্ব প্রতিমা দীপ্তি পাইতেছে। গগন-পটোর সেই এক প্রিয় প্রতিমা। মাস মাস ধরিয়া প্রত্যহই আঁকে, আর প্রত্যহই পুঁচিয়া ফেলে,—বিরক্তিও নাই তৃপ্তিও নাই।

ঐ প্রতিমা একখানি আশ্চর্য ছবি। গগন-পটো প্রায়ই প্রত্যহ আঁকে, আর আমরাও তো প্রায়ই প্রত্যহ দেখি, তবু নিত্যই নূতন।

পুরাণের পুরাণ মহাপুরাণকে নূতন করিয়া দেখাইতে গগন-পটো যেমন পটু, এমন আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু কেবল তাই বলিয়া যে পশ্চিমের প্রতিমা আশ্চর্য ছবি, তাহা নহে। ও এক আজগুবি কাণ্ড।—মুখ নাই অথচ দেখ কেমন হাসিতেছে। চোখ নাই, ভ্রূ নাই—তবু দেখ কেমন চোখ রাঙাইয়া ভ্রূকুটি করিয়া রহিয়াছে। আর আশ্চর্যের আশ্চর্য —ঐ মধুর হাসিতে আর ঐ ভীষণ ভ্রূকুটিতে দেখ দেখি কেমন মাখা-মাখি, কেমন মেশামিশি। পৌরাণিকী অন্ধকারময়ী কালীমূর্তিতে একবার প্রসন্নাং স্মিতাননাং করালবদনাং দেখিয়াছ, আর একবার গগন-পটোর ঐ জ্বলন্ত চিত্রে ললিতে-ভৈরবে, কোমলে-ভীষণে অপূর্ব মিলন দেখ। ঐ দেখ কেমন অপূর্ব হাসি! ঢল ঢল তপ্ত কাঞ্চনসাগরে যেন অমৃতের লহরী উঠিল। ঐ দেখ কেমন রাগ! ব্রহ্ম-কোপানলে যেন খাণ্ডব-দাহ হইবে। ঐ দেখ নিঃশব্দ, তবু যেন তোমাকে স্বর্গের বার্তা ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিতেছে। চক্ষু নাই, তবু যেন তোমার মনের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। আর দেখ, নিশ্চল, সুস্থির—তথাপি যেন হাত তুলিয়া তোমাকে অভয়-দান করিতেছে, আশীর্বাদ করিতেছে। আইস, আমরা প্রণত হই। সঙ্গে সঙ্গে মহাশিল্পী গগন-চিত্রকরকে নমস্কার করি এবং তাহার ওস্তাদকে একবার দেখাইবার জন্য তাহার কাছে প্রার্থনা করি।

গগন-দাদা! তোমার খেপামিতে ক্ষান্ত দিয়া একবার আমাদের গুটিকত কথা শুন। গঙ্গার উপর তোমার প্রভাতছবি, পর্বত-পৃষ্ঠে তোমার এই সন্ধ্যার প্রতিমা, প্রাবৃটের সেই ঘনকৃষ্ণ সিংহাসন, নিদাঘের সেই রৌদ্রমূর্তি—ও সকল কারিগরি তোমার অনেকবার দেখিয়াছি। তোমার বিচিত্র পট দেখিয়া অনেকবার জ্বলিয়াছি, পুড়িয়াছি, হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি; কিন্তু ঐ সকল বিচিত্র চিত্রে আত্মহারা হই বটে, অথচ পরমার্থ পাই না, তুষ্টি হইলেও তৃপ্তি হয় না। না দাদা, আর খেপামি করিয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। তোমার এইসকল ছায়াময়ী প্রতিমার অন্তরস্থ প্রতিমা আমাকে সেই সে দিনের মতো আর

একবার দেখাও। তোমার সেই বিষম ভেল্কি আর একবার ভাঙিয়া দাও। এই ছায়াবাজীর ছায়া-পট একবার ক্ষণ-মুহূর্ত-জন্য সরাইয়া দাও!—আমি আর একবার তোমার সেই নীল, নীল, অতি নীল বাজি-ঘরের অভ্যন্তরস্থ তোমার ওস্তাদকে প্রাণ ভরিয়া দেখি। সে দিন তুমি দেখাইলে বটে, কিন্তু আমি যে কি দেখিলাম, তাহার কিছুই বুঝিলাম না। কোমলের কোমল অতি কোমল বংশীরবে আমার মোহ হইল; নীলমধ্যে অতি নীল দেখিতেছিলাম, সমস্ত জগৎ নীল আভায় প্রতিভাত হইল—আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর তুমি তোমার ছায়াপটে তুলারাশি ছড়াইয়া হাসিতে লাগিলে। না দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, এবার আর ও সময়ে খেপামি করিও না; ভালো করিয়া তোমার ওস্তাদকে একবার দেখাও।

'নবজীবন'। ১২৯২ বঙ্গাব্দ॥

(সাহিত্যসাধনা)

মোটা রসিকের প্রবন্ধ

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনাকে ভালোবাসা, আপনাকে বড়ো মনে করা, মানুষের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া ঘোষের ঝি নিজের গরুর দুধকে দুধ বলিলে তাহা যে দুধ না হইয়া জলই হইবে, তাহার কোনও মানে নাই। যাহা সত্য, তাহা তুমি বলিলেও সত্য, না বলিলেও সত্য; তবে কেহ বিচার করিয়া দেখিতে চাহিলে অবশ্যই তাহার বিচার করিবার অধিকার আছে। এ মুখবন্ধটুকুর তাৎপর্য ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মোটা না হইলে মানুষ রসিক হইতে পারে না। যাহারা রোগা, সরু, খিটখিটে বা পাতলা, তাহারা দুষ্ট হইতে পারে, পাজি হইতে পারে, কিন্তু রসিক হইতে পারে না। মোটা লোক দেখিলে, ইহারা ভোঁদা বলে, হাঁদা বলে, গোবরগণেশ বলে— বলুক, তাহাতে মোটা মানুষের রসিকত্বই প্রতিপন্ন হয়, তাহাদের নিজের রসিকতার প্রমাণ হয় না। আগুন আপনি গরম, যে আগুনের কাছে যায়, সেও গরম হয়। মোটাদের বেলাও তাই; মোটা আপনি রসিক, আর মোটার সংস্পর্শে যে আইসে, সেও তখন রসিক হইয়া ওঠে। রসের আধার মোটা, যে নীরস সেই শুষ্ক।

আমি নিজে কিঞ্চিৎ মোটা, আমার পেটের বেড় পৌনে চারি হাতের বেশি নয়; তথাপি আমি রসিক বলিয়া প্রসিদ্ধ, একবারও দেখিলাম না যে, আমার দরজী আমার কাপড়ের মাপ নিতে আসিয়া না হাসিয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু আমি রসিক বলিয়াই যে মোটা মানুষ মাত্রেই রসিক কিংবা আমি মোটা বলিয়াই যে রসিক লোক হইলেই মোটা হইবে, তাহা বলিতেছি না। হইতে পারে আমার বেলায় এটা একটা দৈব সমাবেশ মাত্র, এবং এই সমাবেশ জন্য আমার

এই স্বজাতি পক্ষপাত জন্মিয়া আমাকে অন্ধ করিয়াছে। কিন্তু যখন ইহার যুক্তি ও কারণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে, তখন মোটার রসিকত্ব যে প্রাকৃতিক সাধারণ তত্ত্ব এবং স্থল বিশেষের সমারেশ নহে—ইহা কেমন করিয়া না বলিব ?

স্মরণ করিয়া দেখো মোটা লোকে একটা কথা বলে, সহজে কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারে না ; তাহার পর মনে করো, বিদ্রূপের শাসন হইতে গুরুতর শাসন নাই, রসিকতার আশঙ্কা অপেক্ষা বেশি ভয়ানক আশঙ্কা নাই। এই দুই কথা একত্র করিয়া বলো দেখি, কি দাঁড়াইলো ? মোটা লোকের সম্মান বেশি, আদর বেশি, মর্যাদা বেশি, ধন বেশি—কি নয় ? ভালো বস্তু, দামী জিনিস হইলেই তাহা একটু দুর্লভ হয় ; মোটা মানুষও দুর্লভ, এক স্থান হইতে অন্যস্থানে মোটা মানুষের আমদানি রপ্তানি করিতেও সময় বেশি চাই, বন্দোবস্ত পাকা গোছের হওয়া চাই। ইহাতে কি প্রতিপন্ন হয় না, যে মোটা মানুষ দামী, রসিকতা দামী, অতএব মোটা মানুষ রসিক।

জল হইতে রসের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক ; চপলতা হইতে রসিকতারও তাই, এবং বাঁদরামি হইতে মনুষ্যত্ব অধিক। বাঁদর বেশি মোটা না মানুষ বেশি মোটা ? আধেয়ের গৌরব থাকিলে আধারেরও গৌরব জানিতে হইবে, রসিক মানুষকে মোটা হইতে হইবে। সামান্য তৃণে যত দিন রস থাকে, ততদিন তাহা কাব্যের বস্তু, সৌন্দর্যের আধার ইত্যাদি ; তৃণ যখন শুষ্ক নীরস, লঘু, তখন উপহাসের বস্তু। মোটা-ই রসিক।

শুদ্ধ ধারে সকল বস্তু কাটা যায় না, শুধু ভারে সবই কাটা যায়, নিতান্ত পক্ষে থেতো করা যায়। যাহার রস আছে তাহার ভার আসে, রস আর ভার থাকিলেই মোটা। বৈষ্ণবদের গ্রন্থে যত রস আছে, তত আর কোথাও নাই ; বৈষ্ণবদের গোঁসাইরা যেমন মোটা, তেমন মোটাও ভূভারতে নাই ; শুদ্ধ রস আছে বলিয়াই তো ? রসিকের আর এক নাম রসগ্রাহী ; আয়তন না থাকিলে কি গ্রহণ করা যায় ; বাস্তবিক মোটা না হইলে মোটা রসিক হইতেই পারে না।

চটুল্ চরণে চুট্‌কি পরিয়া খেমটাওয়ালী নাচে, তাতে যদি রসিকতা ভরপুর হইত, তাহা হইলে মোটা মোটা দর্শককে আদর করিয়া আসরের সম্মুখে সকলের আগে বসাইয়া দিবার নিয়ম হইত না। মোটারাই সে প্রশস্ত আসরের ভারকেন্দ্র, সেই রস জগতের সূর্য, সেই রস-কুরুক্ষেত্রের কুরুপাণ্ডব।

উপর্যুপরি কয়েকবার আবরণ বাদ দিয়া বিলক্ষণ মনোনিবেশপূর্বক পঞ্চানন্দের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। ইহার মধ্যে যে একটুকুও সরল স্থান নাই, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, ইহাতে মোটা বুদ্ধির অভাব আছে। পাতলা বুদ্ধিতে কুলাইবে না, ইহাও আমার বিশ্বাস। কার্যটা বড়ো সামান্য নয়, গুরুতর কার্যে গুরুতর বুদ্ধিরও প্রয়োজন—আমার এই উপদেশটা গ্রহণ করিলে সুখের বিষয় হয়।*

পাচু ঠাকুর। ১২৯৪ বঙ্গাব্দ॥
(গ্রন্থাবলী)

* গ্রহণ করিয়া দরকার কি? মোটা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াই পঞ্চানন্দ আপ্যায়িত হইয়াছেন; নিত্য নিত্য এইরূপ পাইলে পঞ্চানন্দ সুচতুর লেখককে দেবতাদের মধ্যে আসন দিতে প্রস্তুত আছেন। এ প্রকার "মোটা বুদ্ধি" দুর্লভ পদার্থ।

শীতসুন্দরী

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

আমি শৌর্যে সিংহিনী ; সৌন্দর্যে ইন্দ্রাণী ; আমি বিলাস-বৈভবে বহু-রূপিণী। আমি শীত। আমি নেমেছি।

আমি ইংরেজ-শাসনে ঋতুরাজ্যের পাটরানী। রাজদরবার ও শৈত্য-সোহাগে বিলাস-সম্ভার বুকে ক'রে আমি নেমেছি।

আমি সিমলা-শৈল-নিবাসে স্বর্গ-বিলাসে ছিলুম। শরকুট করিতে সখ ক'রে নিম্নে—নেটিভ-লোকে নেমেছি।

আমি এই সহরে মাস দুই তিন সফর-প্রবাস করিব। পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন। চৈত্র পড়িতে-না-পড়িতে আমার চতুর্দোল পুনঃ বিমানে উঠবে। চৌরঙ্গী ত্যজিয়া, আমার চতুরঙ্গ বল তখন চন্দ্রলোকে চম্পট দিবে। সুবিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যের শাসন পালনার্থে আমার এই প্রবাসকালের পবিত্র পদচিহ্নই প্রচুর।

আমি আট মাস অন্তরীক্ষে আরাম করি। মুহূর্তের তরে মাটিতে পা দিই না। নিদাঘের উষ্ণ নিশ্বাস আমার অতীব অপ্রিয়, আমি নিদাঘ তাপকে, প্রায় নেটিভ-সন্নিভ, সমগ্র প্রাণের সহিত ঘৃণা করি। আমি নিদাঘে নামি না।

আমার শৈত্যসম্পদে বঞ্চিত হ'য়ে, সমতলভূমি শ্মশানবৎ সন্তপ্ত হয়। আমি আট মাস এ রাজ্যে নামি না। এ রাজ্যের নিয়ন্তাদিগকেও নামাই না। আমরা একত্রে হিমালয়ের উচ্চচূড়ে ঈশ্বরের অনুপম পরমাণুস্পর্শে পুলকিত হই ; আর প্রমোদ প্রবাহে রাস-বিলাসের পানসি ছুটাই। পৃথিবীতে পা বাড়াই না।

আমি ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তাদিগকে নিষ্ঠুর নৈদাঘতাপ হইতে নবনীতবৎ রক্ষা করি। সোহাগ-শৈলের নীরদ-নীলিমা মধ্যে আমি তাঁদের নধরকান্তি লুকায়ে রাখি। আতপ-তাপে এক বিন্দুও উছলিতে দিই না। আমার মহিমায় তাঁদের চিত্ত মন মোলায়েম হয়। আমি

তাঁদের মহা মস্তিষ্কে মারুত-হিল্লোলের শৈত্য সঞ্চারিয়া তাহার মার্তণ্ড তেজ তরলিত করি। নইলে কি নিস্তার থাকিত! নেটিভ কোলাহল ও রবির কিরণ এ উভয়েরই উপর আমি ক্ষণ আবরণ ঝেপে তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত রাখি। নতুবা এই পুরাতন ভারতভূমির ভরসা বেশি ছিল না।

ভারত-ভাগ্যের যাঁরা নিয়ামক, আমি তাঁদের নিয়ন্ত্রী, আমার ইঙ্গিতে তাঁরা উঠেন নামেন। আমি তাঁহাদিগকে চালাই; তাঁদের শাসন-যন্ত্রটিও তাপমান-যন্ত্রের প্রত্যেক আকুঞ্চন প্রসারণে উঠাই নামাই। আমি এই হিন্দুস্থানের হনন-পালন-শাসন-কারিণী।

ভারত সাম্রাজ্যের শাসন-চক্র আমি আটমাস আসমানে ঘুরিয়ে আবার তায় নিম্নে নামাইয়েছি। ভারতীয় প্রজার প্রারব্ধ লিপি আমার এই পেটিকোটের পকেটে।

আমি নেমেছি। দেখ, এই সহরে সুরলোক নামাইয়েছি। বর্ষা-বিড়ম্বিত গ্রীষ্ম শুষ্ক শ্মশানকে আমি মূহূর্ত মধ্যে আমার মোহন স্পর্শে— আ! আমার ঐন্দ্রজালিক চুম্বনে পরমরমণীয় প্রমোদ-উদ্যানে পরিণত করেছি। আমার ইঙ্গিত মাত্রে দেব, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, বিদ্যাধর, অপ্সরা, স্ব স্ব সঙ্গিনী স্বজন সহ এখানে এসে সমবেত হয়েছেন। আমি অঙ্গুলি-হেলনে ত্রিশকোটি মানুষের অধীশ্বর, রাজরাজেশ্বর বৃটিশ রাজ-প্রতিনিধি প্রবল প্রতাপান্বিত ভারতীয় ভাইস্রয়কে ভারত রাজধানীর ক্ষুণ্ণ, ম্লান, শূন্য সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছি। আমারই আদেশে তিনি আজ নিদাঘ-ত্যক্ত রাজতক্তে সমারূঢ়, আমারই অনুরোধে শূন্য সিংহাসন সুরাসুর-বাঞ্ছিত শুভ্র অঙ্গ-সংস্পর্শে সুশোভিত করেছেন।

আমি এসেই গ্রীষ্মে গতাসু গভর্নমেণ্ট প্রাসাদে প্রাণসঞ্চার করেছি। আমার অনুপস্থিতিতে ঐ অত্যুচ্চ অট্টালিকা-গৌরবস্ফীত অহংকারোন্নত-গ্রীব গভর্নমেণ্ট হৌস সুবিস্তীর্ণ গোরস্থানে পরিণত হয়েছিল। আমার আবির্ভাবে পুনঃ উহা আত্মস্থ হয়েছে। আমারই প্রভাবে উহার ঐ আকাশভেদী উচ্চতম স্তম্ভে আজ বৃটিশ সিংহের

দিগ্‌বিদিগ্‌-বিজয়ী রক্তপতাকা সমগ্র সংসারের প্রতি সাহংকার কটাক্ষ করিয়া স্বকীয় সিংহদর্পে হেলিয়া দুলিয়া উড়িতেছে। আমি আজ উহা উড়াইয়েছি। তোমরা কি কেহ জানো আমার শক্তির পরিমাণ কত?

যে বৃটিশ সিংহ স্বেচ্ছা করিলে সসাগরা সমগ্র পৃথিবী রসাতলে প্রেরণ করতে পারেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বার্তকীবং-বরফ-ব্রাণ্ডির শরবতবং অবহেলে উদরস্থ করতে পারেন—এই বিশাল ভারতভূমি নিমেষ মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে পারেন, তাঁহার—সেই বৃটিশ সিংহের স্বাস্থ্য এবং অস্বাস্থ্য আমারই হ্রাস বৃদ্ধির উপর নিত্য ও নৈমিত্তিক ভাবে নির্ভর করে। তোমরা বুঝতে পেরেছ কি, আমি কে আর আমার শক্তি কত? আমি অপরিমেয় শক্তিশালিনী; বৃটিশ সিংহের বক্ষে, শোণিতে, শিরায় শিরায় বিশ্ব-বিঘাতক বল-সঞ্চারিণী; আমি শীত।

সহরচিত্র। ১৩০৮ বঙ্গাব্দ॥

তৈল

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

তৈল যে কি পদার্থ তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ—বাস্তবিক স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ, আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ করো অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে!

সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহারা সকল মনুষ্যকেই সমানরূপ স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন!

বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান, যাহা বলের অসাধ্য যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে সে সর্বশক্তিমান, তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা, তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না—উকিলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না—বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোনো কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।

যে তৈল দিতে পারিবে তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে, আহাম্মুক হইলেও মাজিস্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গভর্নর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ, তৈল নহিলে জগতের কোন কার্য সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহারা খোলে না, হাজার গুণ থাকুক তাহার

পরিচয় পাওয়া যায় না। তৈল থাকিলে তাহার কিছুই অভাব থাকে না।

সর্বশক্তিময় তৈল নানারূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিনীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম প্রণয়, যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম মৈত্রী, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার বা সৌজন্য, "ফিলনথ্রপি", যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়েলটি, যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম নম্রতা বা মডেষ্টি। চাকরবাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদগম হয়। সেই অগ্ন্যুদগম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল। এই জন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্বি দিয়া থাকে। এইজন্যই যখন দুইজনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা-পুত্রে স্বামী-স্ত্রীতে রাজায়-প্রজায় বিবাদ-বিসংবাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্বেই বলা গিয়াছে যে তৈল দিতে পারে সে সর্বশক্তিমান। কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে, সময় আছে, কৌশল আছে।

তৈলদ্বারা অগ্নি পর্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্তিমান।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয় তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাটসাহেব পর্যন্ত সকলেই তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিস নয় যে নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে সে-ই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র।

সময়—যে সময়েই হউক তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল—পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যেরূপেই হউক তৈল দিলে কিছু না কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট ১।০ পাঁচসিকা বই আদায় করিতে পারিল না---একজন ইংরেজীওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০৲ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া একবিন্দু দিলে যত কার্য হয়, বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তি বিশেষে তৈলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য সম্মিলনী-শক্তি আছে যে তাহাতে সে অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে তাহার তৈল আমার তৈল অপেক্ষা মূল্যবান। তাহার উপর যদি ধন থাকে তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।

তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধামতো আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর যে বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈলদান প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্র্যাক্‌টিক্যাল্ অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার—অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি বাছিয়া বাছিয়া কোন রায় বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপ্যাল করিয়া

শীঘ্র একটি স্নেহনিষেকের কালেজ খোলা হয়। অন্ততঃ উকিলি শিক্ষার নিমিত্ত লা কালেজে একজন তৈল অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। কালেজ খুলিতে পারিলে ভালোই হয়।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতঃই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন—কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে আমি দিই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার, এ বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমত লেক্‌চার পাওয়া যায় না। যদিও কোনো রীতিমত কলেজ নাই তথাপি যাঁহার নিকট চাকরির বা প্রোমোশনের সুপারিশ মিলে তাদৃশ লোকের বাড়ি সদাসর্বদা গেলে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। বাঙালীর বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই। সুতরাং বাঙালীর একমাত্র ভরসা তৈল—বাংলায় যে-কেহ কিছু করিয়াছেন সকলই তৈলের জোরে। বাঙালীদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়। এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে। যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড়ো লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হইবে ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এদেশে হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়ার আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক! তাঁহাদের থু হইলে শীঘ্র কাজে আইসে।

শেষে মনে রাখা উচিত এক তৈলে চাকা ঘোরে আর তৈলে মন ঘোরে।

'বঙ্গদর্শন'। চৈত্র ১২৮৫ ॥

(গ্রন্থাবলী)

বাজে কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।

যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে রাস্তা দিয়ে চলে, মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা যে পথে আপনার যোগান টানিয়া 'আনে সে পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।

এইজন্য চাণক্য ব্যক্তি বিশেষকে যে একেবারেই চুপ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, সেই কঠোর বিধানের কিছু পরিবর্তন করা যাইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় চাণক্যকথিত উক্ত ভদ্রলোক 'তাবচ্চ শোভতে' যাবৎ তিনি উচ্চ অঙ্গের কথা বলেন, যাবৎ তিনি আবহমান কালের পরীক্ষিত সর্বজনবিদিত সত্য ঘোষণায় প্রবৃত্ত থাকেন ; কিন্তু তখনই তাঁহার বিপদ যখনই তিনি সহজ কথা নিজের ভাষায় বলিবার চেষ্টা করেন।

যে লোক একটা বলিবার বিশেষ কথা না থাকিলে কোনো কথাই বলিতে পারে না, হয় বেদবাক্য বলে নয় চুপ করিয়া থাকে, হে চতুরানন, তাহার কুটুম্বিতা, তাহার সাহচর্য, তাহার প্রতিবেশ—

শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ !

পৃথিবীতে জিনিসমাত্রই প্রকাশধর্মী নয়। কয়লা আগুন না পাইলে জ্বলে না, স্ফটিক অকারণে ঝক্‌ঝক্ করে। কয়লায় বিস্তর কল চলে, স্ফটিক হার গাঁথিয়া প্রিয়জনের গলায় পরাইবার জন্য। কয়লা আবশ্যক, স্ফটিক মূল্যবান।

এক-একটি দুর্লভ মানুষ এইরূপ স্ফটিকের মতো অকারণ ঝল্‌মল্ করিতে পারে। সে সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে—তাহার

কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যের আবশ্যক হয় না। তাহার নিকট হইতে কোনো বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইবার গরজ কাহারও থাকে না ; সে অনায়াসে আপনাকে আপনি দেদীপ্যমান করে, ইহা দেখিয়াই আনন্দ। মানুষ প্রকাশ এত ভালোবাসে, আলোক তাহার এত প্রিয় যে, আবশ্যককে বিসর্জন দিয়া, পেটের অন্ন ফেলিয়াও, উজ্জ্বলতার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। এই গুণটি দেখিলে, মানুষ যে পতঙ্গশ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া যে জাতি অকারণে প্রাণ দিতে পারে, তাহার পরিচয় বিস্তারিত করিয়া দেওয়া বাহুল্য।

কিন্তু সকলেই পতঙ্গের ডানা লইয়া জন্মায় নাই। জ্যোতির মোহ সকলের নাই। অনেকেই বুদ্ধিমান, বিবেচক। গুহা দেখিলে তাঁহারা গভীরতার মধ্যে তলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আলো দেখিলে উপরে উড়িবার ব্যর্থ উদ্যমমাত্রও করেন না। কাব্য দেখিলে ইঁহারা প্রশ্ন করেন ইহার মধ্যে লাভ করিবার বিষয় কী আছে, গল্প শুনিলে অষ্টাদশ সংহিতার সহিত মিলাইয়া ইঁহারা ভূয়সী গবেষণার সহিত বিশুদ্ধ ধর্মমতে দুয়ো বা বাহবা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসেন। যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, তাহার প্রতি ইঁহাদের কোনো লোভ নাই।

যাহারা আলোক-উপাসক, তাহারা এই সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে নাই। তাহারা ইঁহাদিগকে যে-সকল নামে অভিহিত করিয়াছে আমরা তাহার অনুমোদন করি না। বররুচি ইঁহাদিগকে অরসিক বলিয়াছেন, আমাদের মতে ইহা রুচিগর্হিত। আমরা ইঁহাদিগকে যাহা মনে করি তাহা মনেই রাখিয়া দিই। কিন্তু প্রাচীনেরা মুখ সামলাইয়া কথা কহিতেন না, তাহার পরিচয় একটি সংস্কৃত শ্লোকে পাই। ইহাতে বলা হইতেছে—সিংহনখরের দ্বারা উৎপাটিত একটি গজমুক্তা বনের মধ্যে পড়িয়াছিল, কোনো ভীল রমণী দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল, যখন টিপিয়া দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তামাত্র, তখন দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রয়োজনীয়তা-বিবেচনায়

যাঁহারা সকল জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করেন, শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার বিকাশ যাঁহাদিগকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, কবি বর্বর নারীর সহিত তাঁহাদের তুলনা দিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় কবি ইঁহাদের সম্বন্ধে নীরব থাকিলেই ভালো করিতেন; কারণ, ইঁহারা ক্ষমতাশালী লোক, বিশেষতঃ, বিচারের ভার প্রায় ইঁহাদেরই হাতে। ইঁহারা গুরুমহাশয়ের কাজ করেন। যাঁহারা সরস্বতীর কাব্যকমলবনে বাস করেন, তাঁহারা তটবর্তী বেত্রবনবাসীদিগকে উদ্‌বেজিত না করুন, এই আমার প্রার্থনা।

সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্ধা রাখে না। সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্মের কথা নহে, কর্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন-অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায়, ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আশ্বাসে তুলিয়া লন তবে তখনই ফেলিয়া দিবেন। ইহাতে প্রয়োজনের কথা কিছুই নাই। ইহা নিটোল মুক্তা এবং ইহাতে বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিহ্ন কিছু লাগিয়াছে, কিন্তু সেটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না।

ইহার কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এ কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ, এমন উজ্জ্বল। ইহা একটি মায়াতরী; কল্পনার হাওয়ায় ইহার সজল মেঘনির্মিত পাল ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং একটি বিরহী হৃদয়ের কামনা বহন করিয়া ইহা অবারিত বেগে একটি অপরূপ নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে—আর-কোনো বোঝা ইহাতে নাই।

টেনিসন যে Idle Tears, যে অকারণ অশ্রুবিন্দুর কথা বলিয়াছেন, মেঘদূত সেই বাজে চোখের জলের কাব্য। এই কথা শুনিয়া অনেকে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে উদ্যত হইবেন। অনেকে বলিবেন, যক্ষ যখন প্রভুশাপে তাহার প্রেয়সীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তখন মেঘদূতের অশ্রুধারাকে অকারণ বলিতেছেন কেন? আমি তর্ক করিতে

চাই না, এ-সকল কথার আমি কোনো উত্তর দিব না। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ঐ যে যক্ষের নির্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার, ও-সমস্ত কালিদাসের বানানো, কাব্যরচনার ও একটা উপলক্ষ্যমাত্র। ঐ ভারা বাঁধিয়া তিনি এই ইমারত গড়িয়াছেন; এখন আমরা ঐ ভারাটা ফেলিয়া দিব। আসল কথা, 'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্' মন অকারণ বিরহে বিকল হইয়া উঠে, কালিদাস অন্যত্র তাহা স্বীকার করিয়াছেন; আষাঢ়ের প্রথম দিনে অকস্মাৎ ঘনমেঘের ঘটা দেখিলে আমাদের মনে এক সৃষ্টিছাড়া বিরহ জাগিয়া উঠে, মেঘদূত সেই অকারণ বিরহের অমূলক প্রলাপ। তা যদি না হইত, তবে বিরহী মেঘকে ছাড়িয়া বিদ্যুৎকে দূত পাঠাইত। তবে পূর্বমেঘ এত রহিয়া-বসিয়া, এত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এত যূথীবন প্রফুল্ল করিয়া, এত জনপদবধূর উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টির কৃষ্ণকটাক্ষপাত লুটিয়া লইয়া চলিত না।

কাব্য পড়িবার সময়েও যদি হিসাবের খাতা খুলিয়া রাখিতেই হয়, যদি কী লাভ করিলাম, হাতে হাতে তাহার নিকাশ চুকাইয়া লইতেই হয়, তবে স্বীকার করিব, মেঘদূত হইতে আমরা একটি তথ্য লাভ করিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছি। সেটি এই যে, তখনও মানুষ ছিল এবং তখনও আষাঢ়ের প্রথম দিন যথানিয়মে আসিত।

কিন্তু অসহিষ্ণু বররুচি যাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা কি এরূপ লাভকে লাভ বলিয়াই গণ্য করিবেন? ইহাতে কি জ্ঞানের বিস্তার, দেশের উন্নতি, চরিত্রের সংশোধন ঘটিবে? অতএব যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, হে চতুরানন, তাহা রসের কাব্যে রসিকদের জন্যই ঢাকা থাকুক—যাহা আবশ্যক, যাহা হিতকর, তাহার ঘোষণার বিরতি ও তাহার খরিদ্দারের অভাব হইবে না।

বিচিত্র প্রবন্ধ। ১৩১৪ বঙ্গাব্দ॥

কন্যাদায়

শরৎকুমারী চৌধুরানী

এদেশে ক্রমশঃ দেখিতেছি যে, পুত্র সন্তানের মূল্য হুহু শব্দে বাড়িতেছে। যেমন ছেলের দাম বাড়িতেছে, তেমনই মেয়ের দাম কমিতেছে। মেয়েদের নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে এক রূপ, তা এখন শুদ্ধ রূপে আর কিছু হয় না। এক একটি কুমারী কন্যা এক একটি বিশমণী বোঝার স্বরূপ পিতা মাতার জ্ঞান হয়—একটির বিবাহ দেন, একটু হাঁপ ছাড়িয়া সুস্থবোধ করেন।

সকল রকম বরের চেয়ে পাশ-করা বরের দর বড়ো বেশি। বর যদি একটি পাশ-করা এবং দরিদ্র হন, তবে দেড় হাজার দুই হাজারে বিবাহ হইতে পারে। গৃহস্থ হইলে চার-পাঁচ হাজার—ধনবান হইলে পাঁচ সাত দশ হাজার। পিতা উপার্জন করিতেছেন, ছেলে এল. এ. কি বি. এ., সে স্থলে দর বড়ো ভারি, সাত আট হাজার হাতে না করিয়া সে স্থানে সম্বন্ধ করিবার জো নাই। পূর্বে সালংকারা কন্যাদান বিধি ছিলো, এখন নিরলংকারা কন্যা ও নগদ টাকা বা কোম্পানীর কাগজ সহ বিবাহ বিধি হইয়াছে।

শুনিয়াছি, কোনো কোনো বুদ্ধিমান বর যতক্ষণ না টাকা গণনা শেষ হয়, ততক্ষণ ছাল্‌নাতলার পিঁড়ায় উঠিয়া দাঁড়ান না ; ভয়—পাছে কন্যাটি সমর্পণ করিয়া কন্যাকর্তা টাকা কিছু কম দেন—তখন তো ঐ অপদার্থ মেয়েটা ফেরত যাবে না।

তুমি আজ তোমার এত আদরের, এত সাধের মেয়েটিকে পরের হাতে সঁপিয়া দিতে বসিয়াছ, তুমি নিজের অবস্থামত যে তাহাকে সাজাইবে, তাহার আর জো নাই। তোমার ইচ্ছা যে, আপাততঃ তাহার যাহা কিছু আবশ্যক, সকলই তুমি তাহাকে দাও। যাঁদের ঘরে তোমার মেয়ের বিবাহ হইবে, তাঁহাদের রীতিনীতি স্বভাব-চরিত্র কেমন—তাঁরা মাদুর পেতে শুতে ভালবাসেন, কিংবা খাটে গদিতে

শোয়া পছন্দ করেন, তাহার কিছুই তোমরা জানো না—অথচ তোমার মেয়ের খাটে না শুলে ঘুম হয় না। যে ভাগ্যবান তোমার বেহাই হইবেন, তিনি খাটের পরিবর্তে নগদ দেড়শত টাকা চাহিবেন—তিনি বলিবেন, "এখনকার যেমন সব টাকা ধ'রে লওয়া নিয়ম হইয়াছে, তেমনই লইব। নিজের মেয়েদের নগদ সমস্ত ধরিয়া দিলাম, এখন ছেলের বেলায় বুঝি ফাঁকি পড়িব, তা হবে না। আমার এই বি. এ. পাশ ছেলে, নগদ সাত হাজার দাও,—তারপর তোমার মেয়ে, তোমার জামাই, ইচ্ছা হয় খাট-বিছানা দাও, তাদেরই থাকবে।" সুতরাং নিঃশব্দে তোমাদের টাকাগুলি গনিয়া দিতে হইবে। কোনো কোনো বরকর্তা গহনা গড়াইয়া দিতে অনুমতি দেন বটে, কিন্তু সোনা-রূপা ভরি হিসাবে ওজন বুঝিয়া লইয়া থাকেন। যিনি কন্যার গহনার টাকা ও বরসজ্জার টাকার সহিত নগদ লইয়া থাকেন, তিনি গহনা গড়াইবার মজুরির টাকাটিও যে হিসাবের মধ্যে ধরিতে ভুলিয়া যান, এমন ভ্রম যেন কাহারও না হয়। বরঞ্চ অল্প মজুরি দিলে স্বর্ণকার যে বধূর গহনা খারাপ করিয়া দিবে, ইহা তাঁহার অসহ্য বোধ হয়, সেইজন্য মজুরির হিসাবের টাকা দুই টাকার স্থলে তিন টাকা হিসাবেও লইতে পারেন। কোনো কোনো স্থলে গায়ে হলুদের দিনে কন্যাপক্ষ হইতে টাকা বুঝিয়া লইয়া বরপক্ষ নিজ গৃহ হইতে গহনা কন্যাকর্তাকে পাঠাইয়া দেন। অনেক ধনীর ঘরে পুরাতন গহনা থাকে, তাঁহারা সেই সকল ব্যবহার্য অব্যবহার্য, ছোটো বড়ো সেকালে-গঠনের নানাবিধ গহনা বধূর পিতাকে এইরূপে বিক্রয় করিয়া কোম্পানীর কাগজ বৃদ্ধি করেন। কন্যাকর্তা এই সকল অলংকার পরাইয়া সালংকারা কন্যাদানের ফল লাভ করিয়া ও কন্যাকে উপযুক্ত ঘরে বরে সমর্পণ করলাম ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে বহুকালের পর একবার ভালো করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন। কোনো কোনো স্থলে কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া আসিলে পিতামাতা নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়া পরে কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। পুত্রবধূর গহনা ও পুত্রের বরসজ্জার দ্বারা অনায়াসে নিজ কন্যার বিবাহ সমাধা হয়।

বিবাহের মধ্যে আর স্নেহ বা প্রেম নাই—বর নাই, কন্যা নাই; আছে কেবল বরের পাশ, এবং কন্যার পিতার টাকা। দুটো মনিষ্যিকে আজন্ম স্নেহবন্ধনে বাঁধিবার জন্যই ফুলশয্যার আয়োজন। ফুলের মালায় শোভিত হইয়া, বন্ধুবান্ধবের সহিত হাস্যপরিহাস করিয়া, নব বিবাহিতার সহিত আহারান্তে একত্রে নূতন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানায় শয়ন করিয়া তাহাকে আপনার ভাবিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, কন্যার পিতা কন্যার হিতার্থে, জামাতার প্রীত্যর্থে যথাসম্ভব ফুলফল সকলই সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন। পাছে জামাতার মনে অনটনের ভাব আসিয়া মন উচাটন হয়, পাছে তিনি প্রশান্তমনে পত্নীর সহিত প্রথম আলাপ না করিতে পারেন, তাই কন্যার পিতামাতা ফুলশয্যার সমস্ত ভার বহন করেন। সে জিনিস পাঠানো নিয়ম যে একেবারে রহিত হইয়াছে, এমন নহে— বরকর্তা গাছেরও পাড়েন, তলারও কুড়ান। কর্তা নগদ টাকা লন, ওদিকে গৃহিণী বলেন, "ওমা, সে কি গো, টাকা ধ'রে দিয়েছেন ব'লে কি মেয়ে জামাইয়ের কাপড় আর জলখাবারটি দেবেন না! ফুলশয্যার সামগ্রী দেওয়া তো মেয়ে জামাইকে আশীর্বাদ করা। মেয়ের মা-ই বা কেমন যে, আশীর্বাদ না করে চুপ ক'রে থাকবেন। তবে বেহানকে ব'লো, তার মেয়ে জামাই উপবাস ক'রে থাক্‌বে!" পরিহাসের সম্পর্কীয়ারা কহেন—"বেশ তো, আমরা তবে তাঁদের মেয়েকে বিনা বসনেই শয়ন করাইব!" বেচারা কন্যার পিতা-মাতা তখন এসে আবার সেই সকল ফল, ফুল, বস্ত্র, দধি, ক্ষীর, সন্দেশ সকলই পাঠাইয়া দেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েই এমন নিয়ম হইতেছে যে, অনেক স্থলে টাকাও লওয়া হয়, আবার জিনিসও আদায় করা হয়। না দিলে মেয়ে পাঠান না ও বিস্তর তিরস্কার করেন। মাঝে মাঝে এমন দেখিতে পাওয়া যায় যে বাসীবিয়ের দিন, কন্যা বরের বাড়ি পৌঁছিবার পরেই অলংকারগুলি ফেরত আসে। দাসী আসিয়া উপস্থিত, কি সমাচার? না, "কর্তা এই গহনা ফেরত দিলেন, আর বললেন যে, তাঁর গহনায় কাজ নেই, তাঁর এমন ক্ষমতা

আছে যে, তিনি তাঁর বৌকে এমন পাঁচ স্যুট গহনা দিতে পারবেন! তা আপনারা আর মেয়ে আনতে যাবেন না—তা হ'লে সুবিধে হবে না।" সবে মাত্র বর কন্যা বিদায় করিয়া মাতা কাতর হৃদয়ে ভবিষ্যৎ ভাবিতেছেন, কুটুম্বিনীরা ঘর-দুয়ার গুছাইতে ব্যস্ত, কর্তা গৃহসজ্জা—ঝাড়-লণ্ঠন যথাস্থানে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। সন্দেশওয়ালা ফুল-শয্যার সন্দেশের ফরমাস লইতে আসিয়াছে, মালিনী ফুলের গহনার বায়নার টাকা চাহিতেছে, এমন সময় এই অলংকার সমেত প্রেরিত প্রস্তাবে যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে নিস্তব্ধভাবে রহিল। পরে, "কেন কেন, কি হয়েছে বাছা, আজকের দিন কি ওর সন্ধ্যাবেলা গহনা খুলিতে আছে!" ইত্যাদি কথা কোনো মুখরা প্রতিবেশিনীর মুখ হইতে বাহির হইলে, তবে পিতামাতা অনুনয় বিনয় দ্বারা আসল কথাটা অবগত হয়েন। কথাটা এই যে, গহনা ওজন করিয়া দেখা হইয়াছে যে, সোনা ভরি হিসাবে কম আছে এবং গহনায় অনেক পান বাদ যাইবে। সুতরাং যদি ভালো চাও, তবে গহনাগুলি ফেরত লইয়া নগদ টাকা ধরিয়া দেওয়া হোক। এই তো ব্যাপার! যাহা হউক, এই যে মনোভঙ্গ আরম্ভ হয়, ইহা আর শীঘ্র জোড়া লাগে না। বরপক্ষের অমোঘ অস্ত্র যে, মেয়ে পাঠাইব না। এই অস্ত্র তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করেন। যদি কন্যাপক্ষের এম্প্রেসমুখী ঢাল থাকে, তবে তাঁহারা সামলাইয়া যান, নচেৎ জন্মের মতোন প্রতিমা বিসর্জন দিতে হয়।

ছেলেবেলা দিদিমার কাছে আমরা ঘুমপাড়ানি গান শিখেছিলুম :

"আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে,
দুর্গা যাবেন শ্বশুর বাড়ি কোনখান দিয়ে,
আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
সরু ধানের চিঁড়ে দেব পথে জল খেতে।"

এখন যদি ভাই, কন্যা ছায়ায় ছায়ায় যাবে ব'লে কোন মা স্নেহবশে আম-কাঁঠালের বাগান দিতে চাহিতেছেন, এমন কথা বেহাই শুনিতে

পান—তা হ'লে অমনই কহিবেন—"বেয়ান, আম-কাঁঠালের বাগান আর কি হবে, আমরা কলিকাতায় থাকি, এত দূরে এসে আম-কাঁঠাল নিয়ে যেতে ঢের খরচ পড়বে—আর কে দেখে, কে বা শুনে ; তা দুর্গাকে আমরা ভিজে গামছা মাথায় দিয়ে নিয়ে যাব এখন, আম-কাঁঠালের বাগানের দামটা আমাকে দিয়ে দাও—ও টাকা তোমার মেয়ে জামাইয়েরই থাকিবে।"

'সাধনা'। আষাঢ় ১৩০০ ॥

(রচনাবলী)

ফাল্গুন

প্রমথ চৌধুরী

আমাদের দেশে কোনো কিছুরই হঠাৎ বদল হয় না, ঋতুরও নয়। বর্ষা কেবল কখনো-কখনো বিনা নোটিশে একেবারে হুড়দ্দুম করে এসে গ্রীষ্মের রাজ্য জবরদখল ক'রে নেয়। ও ঋতুর চরিত্র কিন্তু আমাদের ধাতের সঙ্গে মেলে না। প্রাচীন কবিরা বলে গেছেন, বর্ষা আসে দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার মতো—আকাশে জয়ঢাক বাজিয়ে, বিদ্যুতের নিশান উড়িয়ে, অজস্র বরুণাস্ত্র বর্ষণ ক'রে, এবং দেখতে-না-দেখতে আসমুদ্র হিমালয় সমগ্র দেশটার উপর একছত্র আধিপত্য বিস্তার ক'রে। এক বর্ষাকে বাদ দিলে, বাকি পাঁচটা ঋতু যে ঠিক কবে আসে আর কবে যায়, তা এক জ্যোতিষী ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন না। আমাদের ছয় রাগের মধ্যে এক মেঘ ছাড়া আর পাঁচটি যেমন এক সুর থেকে আর একটিতে বেমালুমভাবে গড়িয়ে যায়—আমাদের স্বদেশী পঞ্চঋতুও তেমনি ভূমিষ্ঠ হয় গোপনে, ক্রমবিকশিত হয় অলক্ষিতে, ক্রমবিলীন হয় পরঋতুতে।

ইউরোপ কিন্তু ক্রমবিকাশের জগৎ নয়। সে-দেশের প্রকৃতি লাফিয়ে চলে, এক ঋতু থেকে আর এক ঋতুতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বছরে চারবার নব কলেবর ধারণ করে, নবমূর্তিতে দেখা দেয়। তাদের প্রতিটির রূপ যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি স্পষ্ট। যাঁর চোখ আছে তিনিই দেখতে পান যে, বিলেতের চারটি ঋতু চতুর্বর্ণ। মৃত্যুর স্পর্শে বহু যে এক হয়, আর প্রাণের স্পর্শে এক যে বহু হয়, এ সত্য সেদেশে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেখানে শীতের রঙ তুষার-গৌর, সকল বর্ণের সমষ্টি ; আর বসন্তের রঙ ইন্দ্রধনুর, সকল বর্ণের ব্যষ্টি। তারপর নিদাঘের রঙ ঘন সবুজ, আর শরতের গাঢ় বেগনি। বিলেতি ঋতুর চেহারা শুধু আলাদা নয়, তাদের আসা যাওয়ার ভঙ্গিও বিভিন্ন।

সেদেশে বসন্ত শীতের শব-শীতল কোল থেকে রাতারাতি গা-ঝাড়া

দিয়ে ওঠে, মহাদেবের যোগভঙ্গ করবার জন্য মদন-সখা বসন্ত যেভাবে একদিন অকস্মাৎ হিমাচলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোনো এক সুপ্রভাতে ঘুম ভেঙে চোখ মেলে, হঠাৎ দেখা যায় যে, রাজ্যির গাছ মাথায় একরাশ ফুল প'রে দাঁড়িয়ে হাসছে; অথচ তাদের পরনে একটিও পাতা নেই। সে রাজ্যে বসন্তরাজ তাঁর আগমনবার্তা আকাশের নীল পত্রে সাতরাঙা ফুলের হরফে এমন স্পষ্ট এমন উজ্জ্বল ক'রে ছাপিয়ে দেন যে, সে বিজ্ঞাপন—মানুষের কথা ছেড়ে দিন—পশুপক্ষীরও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

ইউরোপের প্রকৃতির যেমন ক্রমবিকাশ নেই, তেমনি ক্রমবিলয়ও নেই; শরৎও সেদেশে কালক্রমে জরাজীর্ণ হ'য়ে অলক্ষিতে শিশিরের কোলে দেহত্যাগ করে না। সেদেশে শরৎ তার শেষ উইল—পাণ্ডুলিপিতে নয়—রক্তাক্ষরে লিখে রেখে যায়; কেননা, মৃত্যুর স্পর্শে তার—পিত্ত নয়—রক্ত প্রকুপিত হয়ে ওঠে। প্রদীপ যেমন নেভবার আগে জ্ব'লে ওঠে, শরতের তাম্রপত্রও তেমনি ঝরবার আগে অগ্নিবর্ণ হ'য়ে ওঠে। তখন দেখতে মনে হয়, অস্পৃশ্য শত্রুর নির্মম আলিঙ্গন হ'তে আত্মরক্ষা করবার জন্যে প্রকৃতিসুন্দরী যেন রাজপুত রমণীর মতো স্বহস্তে চিতা রচনা ক'রে সোল্লাসে অগ্নিপ্রবেশ করছেন।

২

এদেশে ঋতুর গমনাগমনটি অলক্ষিত হ'লেও তার পূর্ণাবতারটি ইতিপূর্বে আমাদের নয়নগোচর হতো। কিন্তু আজ যে ফাল্গুনমাসের পনেরো তারিখ, এ সুখবর পাঁজি না দেখলে জানতে পেতুম না। চোখের সুমুখে যা দেখছি তা বসন্তের চেহারা নয়, একটা মিশ্রঋতুর—শীত ও বর্ষার যুগল মূর্তি। আর এদের পরস্পরের মধ্যে পালায় পালায় চলছে সন্ধি ও বিগ্রহ। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও শীত ও বর্ষার দাম্পত্যবন্ধন এভাবে চিরস্থায়ী হওয়াটা আমার মতে মোটেই ইচ্ছনীয়

নয়। কেননা, এহেন অসবর্ণ বিবাহের ফলে শুধু সংকীর্ণবর্ণ দিবানিশার জন্ম হবে।

এই ব্যাপার দেখে আমার মনে ভয় হয় যে, হয়তো বসন্ত ঋতুর খাতা থেকে নাম কাটিয়ে চিরদিনের মতো এদেশ থেকে সরে পড়্লো। এ পৃথিবীটি অতিশয় প্রাচীন হয়ে পড়েছে; হয়তো সেই কারণে বসন্ত এটিকে ত্যাগ ক'রে এই বিশ্বের এমন কোনো নবীন পৃথিবীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, যেখানে ফুলের গন্ধে পত্রের বর্ণে পাখির গানে বায়ুর স্পর্শে আজও নরনারীর হৃদয় আনন্দে আকুল হ'য়ে ওঠে।

আমরা আমাদের জীবনকে এমন দৈনিক ক'রে তুলেছি যে, ঋতুর কথা দূরে থাক, মাস-পক্ষের বিভাগটারও আমাদের কাছে কোনো প্রভেদ নেই। আমাদের কাছে শীতের দিনও কাজের দিন, বসন্তের দিনও তাই; এবং অমাবস্যাও ঘুমোবার রাত, পূর্ণিমাও তাই। যে জাত মনের আপিস কামাই করতে জানে না; তার কাছে বসন্তের অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই, কোনো সার্থকতা নেই—বরং ও একটা অনর্থেরই মধ্যে; কেননা, ও ঋতুর ধর্মই হচ্ছে মানুষের মন-ভোলানো, তার কাজ-ভোলানো। আর আমরা সব ভুলতে সব ছাড়তে রাজি আছি, এক কাজ ছাড়া; কেননা, অর্থ যদি কোথাও থাকে তো ঐ কাজেই আছে। বসন্তে প্রকৃতিসুন্দরী নেপথ্যবিধান করেন; সে সাজগোজ দেখবার যদি কোনো চোখ না থাকে, তাহলে কার জন্যই-বা নবীন পাতার রঙিন শাড়ি পরা, কার জন্যই-বা ফুলের অলংকার ধারণ, আর কার জন্যই-বা তরুণ আলোর অরুণ হাসি হাসা? তার চাইতে চোখের জল ফেলা ভালো। অর্থাৎ এ অবস্থায় শীতের পাশে বর্ষাই মানায় ভালো। শুনতে পাই কোনো ইউরোপীয় দার্শনিক আবিষ্কার করেছেন যে, মানব সভ্যতার তিনটি স্তর আছে। প্রথম আসে শ্রুতির যুগ, তারপর দর্শনের, তারপর বিজ্ঞানের। একথা যদি সত্য হয় তো আমরা বাঙালীরা, আর যেখানেই থাকি মধ্যযুগে নেই; আমাদের বর্তমান অবস্থা হয় সভ্যতার প্রথম অবস্থা, নয় শেষ অবস্থা। আমাদের এ যুগ যে দর্শনের যুগ নয়, তার

প্রমাণ—আমরা চোখে কিছুই দেখি নে ; কিন্তু হয় সবই জানি, নয় সবই শুনি। এ অবস্থায় প্রকৃতি যে আমাদের প্রতি অভিমান ক'রে তাঁর বাসন্তী মূর্তি লুকিয়ে ফেলবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি।

৩

আমি এইমাত্র বলেছি যে, এ যুগে আমরা হয় সব জানি, নয় সব শুনি। কিন্তু সত্যকথা এই যে, আমরা একালে যা-কিছু জানি সেসব শুনেই জানি—অর্থাৎ দেখে কিংবা ঠেকে নয় ; তার কারণ আমাদের কোনো কিছু দেখবার আকাঙ্ক্ষা নেই—আর সব-তাতেই ঠেকবার আশঙ্কা আছে।

এই বসন্তের কথাটাও আমাদের শোনা-কথা ও একটা গুজব মাত্র। বসন্তের সাক্ষাৎ আমরা কাব্যের পাকা খাতার ভিতর পাই, কচি পাতার ভিতর নয়। আর বইয়ে যে বসন্তের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়—তা কস্মিনকালেও এ ভূ-ভারতে ছিলো কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার বৈধ কারণ আছে।

গীতগোবিন্দে জয়দেব বসন্তের যে রূপবর্ণনা করেছেন, সে রূপ বাংলার কেউ কখনো দেখেনি। প্রথমতঃ, মলয় সমীরণ যদি সোজাপথে সিধে বয়, তাহলে বাংলা দেশের পায়ের নীচে দিয়ে চলে যাবে, তার গায়ে লাগবে না। আর যদি তর্কের খাতিরে ধ'রেই নেওয়া যায় যে, সে বাতাস উদভ্রান্ত হ'য়ে, অর্থাৎ পথ ভুলে, বঙ্গভূমির গায়েই এসে ঢ'লে পড়ে, তাহলেও লবঙ্গলতাকে তা কখনোই পরিশীলিত করতে পারে না। তার কারণ, লবঙ্গ গাছে ফলে কি লতায় ঝোলে, তা আমাদের কারও জানা নেই। আর হোক-না সে লতা, তার এদেশে দোদুল্যমান হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই এবং ছিলো না। সংস্কৃত আলংকারিকেরা "কাবেরীতীরে কালাগুরুতরু"র উল্লেখে ঘোরতর আপত্তি ক'রেছেন, কেননা ও-বাক্যটি যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন—প্রকৃত নয়। কাবেরীতীরে যে কালাগুরুতরু কালেভদ্রেও জন্মাতে পারে না, একথা

জোর ক'রে আমরা বলতে পারি নে ; অপরপক্ষে, অজয়ের তীরে লবঙ্গ-লতার আবির্ভাব এবং প্রাদুর্ভাব যে একেবারেই অসম্ভব, সেকথা বঙ্গভূমির বীরভূমির সঙ্গে যাঁর চাক্ষুষ পরিচয় আছে তিনিই জানেন। ঐ এক উদাহরণ থেকেই অনুমান, এমনকি প্রমাণ পর্যন্ত, করা যায় যে, জয়দেবের বসন্তবর্ণনা কাল্পনিক—অর্থাৎ সাদা ভাষায় যাকে বলে অলীক। যার প্রথম কথাই মিথ্যে, তার কোনো কথায় বিশ্বাস করা যায় না ; অতএব ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে এই কবি-বর্ণিত বসন্ত আগাগোড়া মন-গড়া।

জয়দেব যখন নিজের চোখে দেখে বর্ণনা করেন নি, তখন তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের বই থেকে বসন্তের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন ; এবং কবিপরম্পরায় আমরাও তাই ক'রে আসছি। সুতরাং এ সন্দেহ স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, বসন্তঋতু একটা কবি-প্রসিদ্ধি মাত্র ; ও-বস্তুর বাস্তবিক কোনো অস্তিত্ব নেই। রমণীর পদ-তাড়নার অপেক্ষা না রেখে অশোক যে ফুল ফোটায়, তার গায়ে যে আলতার রঙ দেখা দেয়, এবং ললনাদের মুখমদ্যসিক্ত না হ'লেও বকুল ফুলের মুখে যে মদের গন্ধ পাওয়া যায়—এ কথা আমরা সকলেই জানি। এ দুটি কবিপ্রসিদ্ধির মূলে আছে মানুষের ঔচিত্য-জ্ঞান। প্রকৃতির যথার্থ কার্যকারণের সন্ধান পেলেই বৈজ্ঞানিক কৃতার্থ হন ; কিন্তু কবি কল্পনা করেন তাই, যা হওয়া উচিত ছিলো। কবির উক্তি হচ্ছে প্রকৃতির যুক্তির প্রতিবাদ। কবি চান সুন্দর, প্রকৃতি দেন তার বদলে সত্য। একজন ইংরেজ কবি বলেছেন যে সত্য ও সুন্দর একই বস্তু—কিন্তু সে শুধু বৈজ্ঞানিকদের মুখ বন্ধ করবার জন্য। তাঁর মনের কথা এই যে, যা সত্য তা অবশ্য সুন্দর নয়, কিন্তু যা সুন্দর তা অবশ্যই সত্য—অর্থাৎ তার সত্য হওয়া উচিত ছিলো। তাই আমার মনে হয় পৃথিবীতে বসন্ত ঋতু থাকা উচিত—এই ধারণাবশতঃ সেকালের কবিরা কল্পনাবলে উক্ত ঋতুর সৃষ্টি করেছেন। বসন্তের সকল উপাদানই তাঁরা মন-অঙ্কে সংগ্রহ ক'রে প্রকৃতির গায়ে তা বসিয়ে দিয়েছেন।

আমাদের এ অনুমানের স্পষ্ট প্রমাণ সংস্কৃত কাব্যে পাওয়া যায়, কেননা পুরাকালে কবিরা সকলেই স্পষ্টবাদী ছিলেন। সেকালে তাঁদের বিশ্বাস ছিলো যে সকল সত্যই বক্তব্য, সে সত্য মনেরই হোক আর দেহেরই হোক। অবশ্য এ কালের রুচির সঙ্গে সেকালের রুচির কোনো মিল নেই; সেকালে সুরুচির পরিচয় ছিলো কথা ভালো ক'রে বলায়, একালে ও-গুণের পরিচয় চুপ ক'রে থাকায়। নীরবতা যে কবির ধর্ম, এ জ্ঞান সেকালে জন্মে নি। সুতরাং দেখা যাক, তাঁদের কাব্য থেকে বসন্তের জন্মকথা উদ্ধার করা যায় কি না।

সংস্কৃত মতে বসন্ত মদন-সখা। মনসিজের দর্শনলাভের জন্য মানুষকে প্রকৃতির দ্বারস্থ হ'তে হয় না। কেননা, মন যার জন্মস্থান, তার সাক্ষাৎ মনেই মেলে।

ও-বস্তুর আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গেই মনের দেশের অপূর্ব রূপান্তর ঘটে। তখন সে রাজ্যে ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, আকাশ-বাতাস বর্ণে গন্ধে ভরপুর হয়ে ওঠে। মানুষের স্বভাবই এই যে, সে বাইরের বস্তুকে অন্তরে আর অন্তরের বস্তুকে বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই ভিতর-বাইরের সমন্বয় করাটাই আত্মার ধর্ম। সুতরাং মনসিজের প্রভাবে মানুষের মনে যে রূপরাজ্যের সৃষ্টি হয়, তারই প্রতিমূর্তি স্বরূপে বসন্ত ঋতু কল্পিত হয়েছে; আসলে ও-ঋতুর কোনো অস্তিত্ব নেই। এর একটি অকাট্য প্রমাণ আছে। যে শক্তির বলে মনোরাজ্যের এমন রূপান্তর ঘটে, সে হচ্ছে যৌবনের শক্তি। তাই আমরা বসন্তকে প্রকৃতির যৌবনকাল বলি, অথচ একথা আমরা কেউ ভাবিনে যে, জন্মাবামাত্র যৌবন কারও দেহ আশ্রয় করে না; অথচ পয়লা ফাল্গুন যে বসন্তের জন্মতিথি, এ কথা সকলেই জানি। অতএব দাঁড়ালো এই যে, বসন্ত প্রকৃতির রাজ্যে একটা আরোপিত ঋতু।

আমার এ সব যুক্তি যদিও সুযুক্তি না হয়, তাহলেও আমাদের মেনে

নিতে হবে যে, বসন্ত মানুষের মনঃকল্পিত; নচেৎ আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, বসন্ত ও মনোজ উভয়ে সমধর্মী হলেও উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বলা বাহুল্য, এ কথা মানার অর্থ সংস্কৃতে যাকে বলে দ্বৈতবাদ এবং ইংরেজীতে প্যারালালিজম্—সেই বাতিল দর্শনকে গ্রাহ্য করা। সে তো অসম্ভব। অবশ্য অনেকে বলতে পারেন যে, বসন্তের অস্তিত্বই প্রকৃত এবং তার প্রভাবেই মানুষের মনে যে বিকার উপস্থিত হয়, তারই নাম মনসিজ। এ তো পাকা জড়বাদ, অতএব বিনা বিচারে অগ্রাহ্য।

আমার শেষ কথা এই যে, পৃথিবীতে বসন্তের যখন কোনোকালে অস্তিত্ব ছিলো না, তখন সে অস্তিত্বের কোনোকালে লোপ হতে পারে না। আমরা ও-বস্তু যদি হারাই, তবে তা আমাদের অমনোযোগের দরুন। যে জিনিস মানুষের মন-গড়া, তা মানুষের মন দিয়েই খাড়া রাখতে হয়। পূর্ব-কবিরা কায়মনোবাক্যে যে রূপের ঋতু গড়ে তুলেছেন, সেটিকে হেলায় হারানো বুদ্ধির কাজ নয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা যখন বস্তুগত্যা প্রকৃতিকে মানুষের দাসী করেছেন, তখন কবিদের কর্তব্য হচ্ছে কল্পনার সাহায্যে তাঁর দেবীত্ব রক্ষা করা। এবং এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে তাঁর মূর্তির পূজা করতে হবে; কেননা, পূজা না পেলে দেবদেবীরা যে অন্তর্ধান হন, এ সত্য তো ভুবনবিখ্যাত। দেবতা যে মন্ত্রাত্মক। আর এ পূজা যে অবশ্যকর্তব্য তার কারণ, বসন্ত যদি অতঃপর আমাদের অন্তরে লাট খেয়ে যায়, তাহলে সরস্বতীর সেবকেরা নিশ্চয়ই স্ফীত হ'য়ে উঠবে, তাতে ক'রে বঙ্গসাহিত্যের জীবনসংশয় ঘটতে পারে। এ স্থলে সাহিত্যসমাজকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, একালে আমরা যাকে সরস্বতীপূজা বলি, আদিতে তা ছিল বসন্তোৎসব।

বীরবলের হালখাতা। ১৩২৪ বঙ্গাব্দ ॥

হুকা কলিকা বনাম চুরট সিগ্‌রেট

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল দেখিতেছি হুকা কলিকার বদলে চুরট সিগ্‌রেট বিড়ি বার্ডসাই-এর বেশি বেশি চল হইতেছে। এমন কি, যাঁহারা কখনও হুকায় মুখ দেন না, তাঁহারাও ফ্যাশানের খাতিরে সিগ্‌রেট টানিতেছেন, এরূপ দৃশ্যও বিরল নহে। যুক্তি-তর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, তুলনায় সমালোচনা, প্রভৃতিও হইতে দেখি। যথা—

শৌখিন ছোকরা বাবুরা বলেন,—হুকা-কলিকায় ফৈজত ঢের, বড় লেঠা, নানান নটখটি ; তামাক-টিকা চাই, হুকা-কলিকা চাই ; তামাক হয়তো ভ্যালসা, টিকা হয়তো ভিজা, খোল দিয়া হয়তো জল পড়ে, নল্‌চে হয়তো বন্ধ, কলিকা হয়তো ভাঙা, জলটা হয়তো ঝাল হইয়া গিয়াছে,—ঠিকরে হয়তো কোথায় পড়িয়া গিয়াছে—অনেক অসুবিধা পোহাইতে হয়, অনেক সময় অপব্যয় হয়, হাত নোংরা হয়, যা'র তা'র হুকায় খাইতে গা ঘিনঘিন করে, মশারি বিছানা পোড়ে, দাড়িতে আগুন ধরে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর—এক প্যাকেট হাওয়াগাড়ি সিগ্‌রেট ও এক বাক্স দুয়ানি-মার্কা দিয়াশলাই পকেটে রাখ, বস্‌, রাজারও রায়ত নও, মহাজনেরও খাতক নও। তোফা আরাম, যত ইচ্ছা জ্বালো আর খাও। (প্রায় 'ঢালো আর খাও' এর ধাক্কা !) এই সম্বল লইয়া চাই কি দক্ষিণমেরু আবিষ্কারে (দক্ষিণদ্বারেরই কাছাকাছি) গেলেও আটক নাই।

পক্ষান্তরে সিগ্‌রেটের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ শুনা যায়। ডাক্তার চুনীবাবু হয়তো বলিবেন, সিগ্‌রেটে স্বাস্থ্যের হানিকর অনেক রকম জিনিস থাকে। কিন্তু একথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহারই মতো বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ স্বচ্ছন্দে অকুতোভয়ে সুস্থশরীরে খোশমেজাজে বাহালতবিয়তে সিগ্‌রেট টানিতেছেন, তাহাও দেখিতেছি। হুকায় যেভাবে তামাকু খাওয়া হয়, মাখা তামাকুকে যেভাবে নরম করিয়া ফেলা

হয়, জলের ভিতর দিয়া টানিবার সময় ইহার বিষাক্ত ভাগকে যে ভাবে কাবু করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ইহার উগ্রতা অনেকটা কমিয়া যায়, সুতরাং মাদকতা শক্তিও অনেকটা নষ্ট হয়, ইত্যাদি যুক্তিও প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এ হইল বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব, আমরা অব্যবসায়ী, এ সব কথা আমাদের মুখে ভালো শুনাইবে না। সাবেক গুড়ুক খাওয়া ও হালের সিগ্‌রেট টানা—এ দুটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। বিজ্ঞানের স্বাস্থ্যতত্ত্বের নজির তুলিব না, সুনীতির বা সুরুচির দোহাই দিব না। আশা করি, এই মন্তব্য সুধী-সমাজে নিরপেক্ষ ও অপক্ষপাতী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আমার মনে হয়, এই দুইটি সামান্য ব্যাপারের তুলনায় সমালোচনা করিলে ভারতীয় সভ্যতা ও ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভেদটা বেশ ফুটিয়া উঠে। অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের ন্যায়, এক্ষেত্রেও ভারতীয় সমাজতন্ত্রতা ও ইউরোপীয় ব্যক্তিতন্ত্রতা স্পষ্টীভূত। কথাটা খোলসা করিয়া বুঝাইতেছি।

প্রথমতঃ দেখুন, সিগ্‌রেটে সবই তৈয়ারি থাকে, কিছু করাকর্মার দরকার হয় না, ঠিক যেন হোটেলে খাওয়া। অতএব ইউরোপীয় সমাজের স্পষ্ট ছায়া। তাহার পর সিগ্‌রেট একা একা টানিতে হয়, কাহাকেও ভাগ দেওয়া চলে না।* নিজের পকেট হইতে সিগ্‌রেট-কেস ও দিয়াশলাই-এর বাক্স বাহির করিলাম, নিজে দিয়াশলাই জ্বালিলাম। নিজে সিগ্‌রেট ধরাইলাম (স্বয়ংসিদ্ধ যাহাকে বলে), তারপর নিজে হুস হুস করিয়া টানিলাম, আর নিঃশেষ করিয়া টানিতে টানিতে যখন ঠোঁটে ঈষৎ উত্তাপ অনুভব করিলাম, তখন দূরে ছুঁড়ে ফেলিয়া দিলাম; বস্ আপৎশান্তি। কাহারও তোয়াক্কা নাই, কাহারও খাতির নাই, কাহারও মুখাপেক্ষা নাই, দশজনকে ভাগ

* কোনো কোনো স্থলে একটি সিগ্‌রেট দুই ইয়ারকে টানিতে দেখিয়াছি—কিন্তু আশা করি আমার পাঠকবর্গের মধ্যে এমন লোক কেহ নাই।

দেওয়া নাই। পার্শ্বস্থ ব্যক্তিবর্গের লাভ—ধূমের যন্ত্রণা, দুর্গন্ধের লাঞ্ছনা ও ক্বচিৎ উড়ো ছাই গায়ে পড়া। ইউরোপীয় সমাজের স্ব-স্ব-প্রধান ভাবের হুবহু নকল। অবশ্য সিগ্রেট-কেস হইতে বাহির করিয়া এক একটি সিগ্রেট পার্শ্বস্থ ভদ্রলোকদিগকে দিয়াশলাই সমেত offer করা যায় বটে, কিন্তু এক হুকায় বা এক কলিকায় তামাক খাওয়ার মতো ইহাতে তেমন হৃদ্যতা হয় কি? হুকা বা কলিকা যেমন অসংকোচে গ্রহণ করা হয়, সিগ্রেট তেমনভাবে গ্রহণ করিতে, যেন কেমন একটা দীনতা প্রকাশ হয়।

আর তামাকু—এক কলিকা তামাকু অনেকক্ষণ পোড়ে, বহু লোক প্রতিপালন হয়, সিগ্রেট এক মিনিটে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, একজন বই খাইতে পারে না। তামাকু এক কলিকা সাজো, তৈয়ারি তামাকু দশজনকে পরিবেষণ কর, অপরিচিত লোকও চাহিয়া খাইবে, লজ্জা বা সংকোচ বোধ করিবে না, মানের হানি হইবে না। ইতর জাতি হইলে কলিকা খুলিয়া প্রসাদ দাও, জাতিভেদের কঠিন নিয়মও তামাকুর কল্যাণে কতকটা শিথিল হইয়া যায়—যেমন 'কয়লাকো ময়লা ছোট্রে যব আগ্ করে পরবেশ।' তামাকু সাজিবার সময় কেহ বা হুকার জল ফিরাইল, কেহ বা নল্চেয় ছিঁচকে দিল, কেহ বা ঠিকরের চেষ্টায় গেল, কেহ বা টিকে ধরাইল, কেহ বা কড়া ও নরম তামাকু ঠিকমত মিশাইয়া লইল, কেহ বা তামাক সাজিল, কেহ বা কলিকায় ফুঁ দিল, কেহ বা আমপাতার নল তৈয়ারি করিল, সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেছে—ঠিক হিন্দু পরিবারের তথা হিন্দু-সমাজের প্রতিরূপ। ফল কথা, ইহাতে কেমন সৌহার্দ্য, কেমন হৃদ্যতা, কেমন অন্তরঙ্গতা, কেমন সামাজিকতা, কেমন 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভাব, বলুন দেখি?

তবে দৈবাৎ দুই একজন লোক দেখা যায় বটে, তাঁহারা অপরের উচ্ছিষ্ট হুকায়, এমন কি অপরের টানা কলিকায়, খান না—যেমন অনেকে স্বপাক ছাড়া আহার করেন না। সেটা অবশ্য নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা, স্পর্শদোষ-পরিহারের উৎকট চেষ্টা, অথবা বিংশ শতাব্দীতে

বৈজ্ঞানিক ব্যাসিলাস্‌-নিবারণের বিধিমত ব্যবস্থা। কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার, অতএব ধর্তব্য নহে, ফরশি আলবোলা গড়গড়া গুড়গুড়ির বেলায় এরূপ বারোইয়ারি ভাব থাকে না বটে, ওসব যন্ত্রও নিজস্ব (বা reserved)—কিন্তু সেটা বড়োমানুষি, আমিরি। বঙ্কিমচন্দ্র পদ-গৌরব ও বংশ-গৌরবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেবেন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকান্ত রায়, রমণবাবু, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি ধনীদিগের প্রসঙ্গে আলবোলা গড়গড়া সটকার গুণ গাহিয়াছেন। আমরা 'রামচাঁদ শ্যামচাঁদের' মত সাধারণ গৃহস্থের কথাই বলিতেছি।†

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গুড়ুকের পূর্ববর্ণিত সামাজিকতা গুণ থাকাতে কেহ বাড়ি আসিলে আমরা তাহাকে তামাকু সাজিয়া দিয়া অভ্যর্থনা করি। (ইদানীং চা ও সিগ্‌রেট এই সনাতনী প্রথার লোপ করিতে বসিয়াছে।) অতএব যাঁহারা প্রাচীন সমাজের পক্ষপাতী, আশা করি, তাঁহারা পূজার বাজারে স্বদেশী মেলায় এক আধ সের ফৌজদারী বালাখানার মিঠেকড়া তামাকু কিনিয়া পল্লিভবনে ফিরিবেন ও দশজন প্রতিবেশীকে খাওয়াইয়া, হিন্দুগৃহস্থের কর্তব্য পালন করিবেন। বলা বাহুল্য, আমার এই অনুরোধ খাঁটি নিঃস্বার্থ পরোপকার—কেন না, 'জনম অবধি হম' ও-রসবঞ্চিতা। তথাপি যেমন—

"অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্‌।
অনধিগত-পরিমলা হি হরতি দৃশং মালতীমালা॥"

তেমনি অজ্ঞাতস্বাদ হইলেও মশলাদার তামাকু ঘ্রাণেই আমাকে মশগুল করিয়াছে। আর শাস্ত্রেও আছে—ঘ্রাণেই অর্ধভোজন।

পাগলাঝোরা। ১৩২৩ বঙ্গাব্দ॥

† ইষ্টমন্ত্রজপ ও পাড়ার বারোইয়ারি পূজায় যে প্রভেদ ফরশি গড়গড়া গুড়গুড়িতে ও হুকায় সেই প্রভেদ। ইতি সুধীভিবিভাব্যম্‌।

প্র্যাক্‌টিক্যাল্

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইঁহারা প্র্যাকটিক্যাল্, অর্থাৎ পরম সাবধানী এক একটি বিজ্ঞ বক, ঝোপ না বুঝিয়া কোপ মারেন না, এবং কোপ দেখিলেই ঝোপে লুকান। সর্বদাই সতর্ক এবং সন্দিহান, ছাতা ঘাড়ে, খাতা হাতে, মাথায় গোল-টুপি, পকেটে ছুরি কাঁচি, দড়াদড়ি, কাগজপত্র, এবং একখণ্ড নামের আদ্যক্ষরযুক্ত রুমাল মুখ বাড়াইয়া। দলের কেহ কেহ এখন চোখে চশমাও দেন এবং চশমার উপর দিয়া ভিন্ন দেখেন না। লোকের নাকের উপর যখন খাতা ধরেন, তখন অবিচলন পক্ষে চশমায় অনেকটা সহায়তা করে। একে ত স্বভাবতঃই চক্ষুলজ্জা ইঁহাদের কম, তাহার উপরে কাচের চশমা, সোনায় সোহাগা!

সাধারণের নিকট প্র্যাক্‌টিক্যাল্ বলিয়াই ইঁহারা আপনাদের পরিচয় দেন, সুতরাং আমরাও তাহাই দিলাম। মা বীণাপাণির সহিত বিমাতৃ-সম্বন্ধ জ্ঞাপনার্থেই নাকি ইঁহারা এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ এমন দুর্নাম না রটনা করে যে, ইঁহাদিগকে নিংড়াইয়া এক বিন্দু রস বাহির করা যাইতে পারে। কবিতা পড়েন না, কাব্যালাপ করেন না, আকাশে চাঁদ উঠিলে এবং উঠানে ঘাস গজাইলে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকেন, প্রেয়সীর প্রেমে মজেন না, উদরের বাহিরে বুঝেন না,—অন্ততঃ বুঝিবার কিছু আছে স্বীকার করেন না, এবং আপনার বাহিরে বুঝদার বলিয়া কাহাকেও মানেন না। প্র্যাক্‌টিক্যালের এই সব লক্ষণ। তবে গোপনে প্রেয়সীকে কে কি পত্র লেখেন, এবং তাহাতে কখন কি রস থাকে না থাকে, সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে অক্ষম। এ পর্যন্ত তো কোনও প্রেয়সী আমাদের কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার প্র্যাক্‌টিক্যাল্ প্রেয়ানের চিঠিপত্র দেখিতে পাঠান নাই। বোধ করি, পৃথিবীতে এরূপ সাধারণ হিতৈষিণী প্রেয়সী নিতান্ত বিরলা।

কিন্তু যেরূপ দিনকাল পড়িতেছে, এরূপ গুণসম্পন্না প্রেয়সীর ঐকান্তিক আবশ্যক সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না।

কবির প্রতি প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌দিগের পিঠ-থাবড়ানো ভাব। যেন কবিত্ব ছেলেমানুষি বই আর কিছুই নয়, কবি কেবল নির্বোধের নামান্তর মাত্র। সুতরাং বিজ্ঞ প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌গণ কি করেন? তাঁহারা উপেক্ষাভরে একটু মুচ্‌কিয়া হাসেন, পিঠ থাবড়াইয়া বিজ্ঞতাসহকারে উপদেশ দেন, যথাসাধ্য পৃথিবীর হিতেচ্ছায় জ্যোৎস্না, ফুল, পাখি, বাতাসকে বিদায় দিতে অনুরোধ করেন। ছন্দে যদি একান্তই লিখিতেই বাসনা থাকে, ম্যাঞ্চেষ্টারের দুরভিসন্ধি, বিলাতী পার্লামেণ্টে বাঙালী প্রতিনিধি, রেলের গাড়িতে তৃতীয়শ্রেণীর আরোহীদের দুর্দশা, কত ধানে কত চাল, কত প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌ বুদ্ধিতে কি পরিমাণে কার্যসিদ্ধি, এবং জ্যোৎস্না মলয় ইত্যাদি সৃজনে বিধাতা অতিবুদ্ধি প্র্যাক্‌টিক্যালগণের কার্যসিদ্ধি পথে কত দুস্তর বাধা-বিঘ্ন অর্পণ করিয়াছেন, এবং কাজের লোক প্র্যাক্‌টিক্যালের এই সকল বিধাতৃ-বিহিত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কিরূপে অসাধ্য সাধন করেন, এই সকল হৃদয়োত্তেজক হিতকর বিষয়ের অবতারণা করুন।

অকূল সংসারে বাধাবিঘ্নের এইরূপ দারুণ প্রতিপত্তি হওয়ায় প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌দিগের সময়ের বড়ো টানাটানি, এমন কি, লোক দেখিলে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পর্যন্ত থাকে না। হাতে কাজ কত! ঘড়ি খুলিতে বন্ধ করিতেই দিনে এমন কত সময় যায়! ইহার উপর আবার পকেটসাৎ করিতে সময় লাগে! আলস্য নাকি ইঁহাদের স্বভাবের নিতান্ত বিরুদ্ধ, তাই রক্ষা। এক দণ্ড ইঁহারা স্থির হইয়া থাকেন না, নাকে-মুখে-চোখে কাজের হিসাব ফেনাইয়া উঠে। অবোধ লোকে ঠাহরায়, ইঁহারা আপনার কথায় পাঁচ কাহন। কিন্তু অহংকার ইঁহাদের এমনি অস্বাভাবিক যে, আত্মগোপন না করিয়া থাকিতে পারেন না, কেবল গোপনকার্যে তাদৃশী ব্যুৎপত্তি না থাকায়, আপনাকেই

বার বার বাহির করিয়া বসেন। কিন্তু পাঠকেরা মনে রাখিবেন, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছাপূর্বক আদবেই নহে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌ শব্দে আমরা বিষয়-বুদ্ধির প্রতি আক্রমণ করিতেছি। কিন্তু এরূপ অভিসন্ধি আমাদের কুত্রাপি নাই। সকল প্রকার ভান এবং অতির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি। কবিত্বের সহিত সেন্টিমেণ্ট্যালের যেরূপ সম্বন্ধ, বিষয়-বুদ্ধির সহিত প্র্যাক্‌টিক্যালেরও প্রায় সেই সম্বন্ধ। প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌ হওয়া একদল লোকের ফ্যাশান। হাঁক-ডাক-দৌড়াদৌড়ি করিয়া কাজের ভানে আপনাকে এবং অন্যকে প্রবঞ্চিত করাই ইঁহাদের কাজ। কাজ যে কখনও কিছু হয় না এমন নয়, কিন্তু গর্জনই প্রবল। অতি সহজসাধ্য কাজও খুব গুরুতর করিয়া না করিলে চলে না। সেন্টিমেণ্ট্যালের মতো ইঁহাদেরও একরূপ অস্বাভাবিক ছট্‌ফটানি দেখা যায়। প্রভেদের মধ্যে একদল কবিয়ানা করে, অপর দল কাজীয়ানা।

'সাহিত্য'। ভাদ্র ১২৯৮॥

(গ্রন্থাবলী)

লুকিবিদ্যে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টিক্‌টিকি, গির্‌গিটি, মশা, মাছি, ঘুঘু, গায়ে-পড়া আলাপী, ঘাড়ে-চড়া বন্ধু, এক কথায় সমস্ত পরকীয়া-সাধকদের দলের কাছ থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখা চলে এমন লুকিবিদ্যেটা আংটি করে কর্তা আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন শুনে আমাদের কৌতূহলের সীমা রইলো না। আমরা আংটির কেচ্ছা শোনবার জন্যে কর্তাকে চেপে ধরলেম। কোন সূত্রে কোনখান থেকে আংটিটি তাঁর আঙুলের গাঁটে এসে যে আটকে রইলো, সেটা জানাতে কর্তা নারাজ। কাজেই কাণ্ডের আদিপর্বের শেষ থেকে তিনি আরম্ভ করলেন—

'অন্যের দেশালাইয়ের বাক্স যেমন করে অজান্তে সময়ে-অসময়ে আমাদের পকেটে থেকে যায়, তেমনি ক'রে রাঙ এবং সীসা এই দুই ধাতু দিয়ে গড়া লুকিবিদ্যের এ আংটি হাতে নিয়ে সুন্দরবনের অঘোরপন্থীদের আড্ডা ছেড়ে হাঁটা-পথে অনেক ঘুরতে ঘুরতে শেষে আমি তমলুকে এসে হাজির। তমলুক খুব একটা ভারি শহর। সেখানে আমি একবার ছেলেবেলায় আমার বড়োমামার সঙ্গে গিয়েছিলুম। মামা তখন ফুরুস কোম্পানির মুচ্ছুদ্দি। সাহেবটা যে পাজি ছিল, তা আর কী বলবো! একবার এক কেরানী তার কাছে বাপ মরে গ্যাছে ব'লে ছুটি চাইতে সে বললে কিনা, 'ইয়োর ফাদার হ্যাজ নো বিজ্‌নেস টু ডাই হোয়েন্‌ বজেট প্রেসার ইজ গোয়িং অন!' দেখো দেখি, বাপ মরে, তাকে কিনা এই কথা! সেকালের সাহেব দু-একটা ভালোও ছিল। টুনি—সে বড়ো মজার সাহেব ছিল। ধুতি প'রে সে কালীপুজোর যাত্রা শুনতে যেতো। তার পাখি শিকারে ভারি শখ। সেটার এক রোগ ছিলো এই যে, পাখিটাকে মেরেই আগে তার ল্যাজটা কেটে নেবে! সেইজন্য তার নামই হয়ে গিয়েছিল ল্যাঁজ-কাটা টুনটুনি। সে প্রথম আসে ১৮৩৫ সালে ফৌজের ডাক্তার হ'য়ে।

তারপর মিউটিনির কিছু আগে একটা নীলকরের মেয়েকে বিয়ে ক'রে কোনো বড়ো মিলিটারি পোস্টে বহাল হয়ে সাংহাই চলে যায়। সেইখেনে বসে লোকটা সাংহাই টু ইণ্ডিয়া একটা রেল খোলবার প্ল্যান হোম্-গভর্মেণ্টকে পাঠায়। তখন চীনে মিস্ত্রি আসতো জাহাজে ক'রে, আমরা দেখেছি।—ওই বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের তুধারে জুতোওয়ালা। সন্ধ্যাবেলা ছুরি হাতে তারা ঘুরে বেড়াতো। যত সেলার আর চীনের আড্ডা ছিলো ওইখানটায়! ওই 'আচীন', ওর অনেক দিনের দোকান। আমার জ্যাঠার মামাশ্বশুর, তিনি ওই দোকান থেকে জুতো নিতেন। সেকালে তাঁর মতো শৌখিন ছিলো না। 'ওই যেখানটায় এখন রিপন কলেজ হয়েছে, ওইটে ছিলো তাঁর বৈঠকখানা। তাঁর বাগানে একটা সাদা চাঁপার গাছ ছিলো ; তাই থেকে ও-পাড়াটার নাম হয়েছিলো চাঁপাতলা। শুনেছি সেই চাঁপাফুলে তাঁর দোলমঞ্চ সাজানো হতো। দেলোয়ার খাঁর নাম শুনেছ তো ? ওই তাঁরই ওস্তাদ ; তাঁর কাছে চাকর ছিলো। ওই মিশনারিরা তাঁর ছিরামপুরের বাগানখানা কিনে প্রথম ছাপাখানা বসায়। তখন সব কাঠের টাইপ। রামধন ব'লে এক ব্যাটা যে কারিকর ছিলো, তার মতো পরিষ্কার অক্ষর কাটতে কেউ পারতো না, বাপু! তার বংশের একটা ছোঁড়া এখন আমাদের পাড়ায় ওষুধের দোকান ক'রে ডাক্তার হ'য়ে বসেছে। সব প্রথম এদেশে বিলিতি ওষুধের ডাক্তারখানা খোলেন আমাদের নাকাসি-পাড়ার শ্যাম ডাক্তার। সাহেবরা তাঁর ওষুধ ছাড়া খেতো না। কবিরাজগুলো কিন্তু তাতে বড়ো চটেছিলো—চটবারই কথা!'

আমরাও কর্তার গল্পের বহর দেখে যে না-চটছিলুম তা নয়। কথাটা আংটি থেকে কবিরাজি শাস্ত্র, সেখান থেকে ইংলণ্ডের ইতিহাস, মামাশ্বশুরের রূপবর্ণন, মিশনারিদের জুয়োচুরি, ব্রাহ্মদের ভণ্ডামো, চৈতন্যদেবের কয় পার্শ্বদের সঠিক জীবনবৃত্তান্তে এসে পৌঁছালো। তারপর বুদ্ধের দাঁতের হিসেব থেকে ক্রমে যখন রাসমণির মন্দির যে মিস্ত্রি বানিয়েছিল সে যে হিন্দু নয়, মুসলমান, এবং তার নাতির নাতি এখন

পোর্টকমিশনারের এই জাহাজের খালাশি হয়েছে, এইরকম একটা জটিল সমস্যাতে এসে পড়লো তখন আমাদের জাহাজ প্রায় বড়োবাজার পৌঁচেছে।

আমি অবিনের গা টিপে বললেম, 'ওহে লুকিবিদ্যেটা কি লুকিয়েই থাকবে? আংটিটার তো কোনো সন্ধান পাচ্ছি নে!'

'তারপর আংটিটার কি হলো, কর্তা?' ব'লেই অবিন চোখ বুজলে।

গল্প চললো, 'লুকিবিদ্যে বড়ো সহজ বিদ্যে নয়! রাজা কেষ্টচন্দরের সভায় নবরত্নের এক রত্ন রসসাগর, তিনি লুকিবিদ্যে জানতেন। লর্ড ক্লাইবের জীবন চরিতে এই রসসাগরের লুকিবিদ্যের কথা লেখা আছে—'

লর্ড ক্লাইব থেকে ফোর্ট উইলিয়াম, সেখান থেকে ব্ল্যাক হোল্ ও সমস্ত বাংলার ইতিহাসের গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে গল্প ক্রমে রুমের বাদশার কত টাকা, রামমোহন সাহা কী দিয়ে ভাত খেতেন, এমনি সব ঘরাও খবর আবিষ্কার করতে করতে বড়োবাজারের পণ্টুনের দিকে ক্রমেই এগিয়ে চললো—আংটির দিক দিয়েও গেলো না! কর্তার শেষ বক্তব্য দেশের এক নমস্য ব্যক্তির নামে একটা কুৎসা। ভদ্রলোকটির খুব আত্মীয়রাও যে খবর ঘুনাক্ষরে জানে না, এমন একটা গোপনীয় সংবাদ চুপিচুপি জাহাজের সকলকে জানিয়ে এবং কাউকে বলতে মানা ক'রে দিয়ে কর্তা ডাঙায় পা দিলেন।

আমি অবিনকে বললেম, 'ওহে যথার্থই কর্তা লুকিবিদ্যে জানেন। গল্পটা কিছুতেই ধরা গেলো না!'

অবিন খুব গম্ভীর হয়ে বললো, 'আমি ওই জন্যেই তো ওঁর নাম দিয়েছি আবিষ্কর্তা! নিজের খবর এঁর কাছে লুকোনো থাকে, আর পরের গোপনীয় খবর আবিষ্কৃত হয় এঁর কাছে ওই আংটির প্রভাবে। পরের ছোটোখাটো ব্যবহারের জিনিস—চুরুট, দেশলাই, পান, মায় তার ডিবে, এঁর পকেটে আপনি গিয়ে প্রবেশ করে; পরের লাঠি,

ছাতা, বই ইত্যাদির মতো সামগ্রী আপনি গিয়ে হাতে ওঠে ; পরের বিত্তেয় ইনি পণ্ডিত; পরচর্চায় ইনি অদ্বিতীয় পরকীয়া-সাধক, ইনি পরের যা-কিছু পার করবার কর্তা—আপনার কেউ নয় অথচ আমারও কেউ নয়।'

পথে বিপথে। চৈত্র ১৩২৫ ॥

লিচুফল

শশিশেখর বসু

পশ্চিমে বলে "যৌবন, জিন্দ্‌গী, লিচি মেমান হ্যায়",—অর্থাৎ কুটুম্ব এরা, অল্পদিন থাকে। কুন্তী, স্বর্গের পরী, প্যারাডাইজের হাউরী এবং ওয়ারেন হেস্‌টিংসের বিলাতে হট-হাউস (যেখানে বারো মাস লিচু ফলতো) এ-কথার অপলাপ করেছে। 'মেমান' যে অল্পদিন থাকেন তার-ই ঠিক কি। মনে আছে গল্প? উট মানুষের ঘরের কাছে গিয়ে বলল, "নাকটি ঢুকিয়ে রাখবো? বড়ো শীত।" কুটুম্ব বরেণ্য ভেবে মানুষ রাজি হলো। তারপর উট একটা ঠ্যাং ঢোকালো, তারপর আর একটা, তারপর সর্বশরীর। মানুষ যখন বললো, "আমার ঘর তোমার বৃহৎ বপুতে ভ'রে গেলো! আমার কষ্ট হবে ভাই," তখন অতিথি বললেন, "কষ্ট হয় তো বেরিয়ে যাও"।

লিচুকে অল্পকালের কুটুম্ব বা অভ্যাগত ভাবতে সকলেরই মনঃকষ্ট হয়। এত মনোহর ফল ক্ষণিকের অতিথি! তাই ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে কয়েকজন ধনবান বাঙালী মিলে একটা ক্যানিং কম্পানি খুললেন। ১৯০৯-১০ সালে এলাহাবাদ একজিবিসনে 'ক্যান্‌ড' ফলের মধ্যে এই লিচু শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করলো। ষ্টলে চেয়ার পাতা, তাতে ভদ্রলোকরা ব'সে হাঁ করতো। টাটকা টিন সামনে খুলে আইস-টংএ এক একটা বিচিশূন্য লিচু তুলে মুখে ফেলা হতো। কোঁক্‌ ক'রে একটি আওয়াজ হতো। এ সব 'রোজ-সেন্‌টেড' লিচু; গোলাপের গন্ধ ভুরভুর করচে।

ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে প্রিজার্ভড লিচু আইসক্রিমের মতোন ঠাণ্ডা। মুখ থেকে আলজিব, সেখান থেকে কণ্ঠনালী, তারপর কলেজাতর,—তারপর 'আপনভোলা' ভাব। লিচুর পর লিচু এই রুট দিয়ে আপনার পাকস্থলীতে পৌঁছাতো, পেট ভরে-উঠতো। ভাবতেন, বা রে বিপ্লবী

ক্ষুদিরাম বোসের শহর !—বা-রে বাঙালীর যৌথ ব্যবসায়! এবার বারো মাস লিচু খাবো।

বিনামূল্যে ভদ্রলোককে পেট ভ'রে এই বাঞ্ছিত ফল খাওয়ানো ও দেখানো একটা উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞাপন। ছাপা বিজ্ঞাপনগুলো এর কাছে হার মানে। একটা নিগ্রো লণ্ডনে টুথপাউডারের ব্যবসা করতো ; হাতে কৌটাগুলো নিয়ে সাদা ধপধপে দাঁত বের করে চৌরাস্তায় দাঁড়াতো। লণ্ডনবাসী তার দাঁত দেখে বুঝতো ছাপা হরফের চেয়ে বেশি বিশ্বাস-যোগ্য বিজ্ঞাপন এটা। সে অনেক টাকা করেছিলো।

কিন্তু এই লিচুর কারবার চললো না। বারো মাস লিচু খাওয়ার পরিকল্পনা অন্যান্য পরিকল্পনার মতোন কল্পনায় পরিণত হলো। তা হলেও আমার হিসাবে ৫ সপ্তাহ না খেয়ে চেষ্টা করলে আমরা লিচু সাড়ে তিন মাস খেতে পারি, এপ্রিল ১৫ই থেকে জুলাই ৩১।

বাঙালীর কারবার ফেল হ'য়েই থাকে। ভারতচন্দ্র বলেছেন, 'যার কর্ম তারে সাজে অন্যজনে লাঠি বাজে।' সারকুলার রোডে এক প্রফেসরের সঙ্গে দেখা, হেসে বললেন, শুনেছেন ? সার অমুক আজ হাসিয়েছেন ; একটা মিটিংএ বললেন, 'আমি ১২টা কম্পানির ডিরেক্টার।' তার ১১টা তো ফেল-ই মেরেছে।

ডায়মণ্ডহারবার লাইন থেকে কলকাতায় যা লিচু আসে সেই প্রথম আমদানি। বাংলার নতুন বৎসর আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে এই 'সরু মাজা' জাতির আবির্ভাব। এপ্রিলের শেষে এর বহুল উদ্ভব। এর ধড়ের শেষে মাংস নেই বললেই হয়,— সামান্য সাদা আবরণ মাত্র। বিচি বড়ো ও শেষটা ঢাকা প্রায় নয়। বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির মতোন। খুসবু আছে, রস আছে। খোলা ছাড়ালে এ সব দোষ মালুম হবে। শেষটা অতি সরু।

এই ক্ষীণ-নিতম্ব লিচুর মাথা মোটা বটে, কিন্তু বোঁটা ছাড়ালে দেখবেন পোকা ভরা। এ লিচু কিনে দুঃখ করচেন 'যেমন বোঁটা দাঁতে ছিঁড়লাম যেন একটা উড়ে গেল।' শুনে আর একজন বললেন,

'যেমন বোঁটা দাঁতে ছিঁড়লাম যেন একটা শালিক পাখি উড়ে পালালো।'

মে মাসের মাঝামাঝি কৃষ্ণনগর গিয়ে লিচু খান। দেখবেন ডায়মণ্ডহারবারের লিচুর চেয়ে এই লাট্টু-আকৃতি লিচু ঢের ভালো। খোলা অত লাল টকটকে নয় বটে। মে মাসের ২০শে নাগাত দিনাজপুরও যান! লিচু খাবেন ও বলবেন তোফা ফল। মে শেষে ও পুরা জুন মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা বা সীতামারীতে মিথিলার জগৎ-বিখ্যাত লিচু খাবেন। ওয়ারেন হেস্‌টিংস এইখান থেকে নিয়ে ট্রান্‌সপ্ল্যান্ট করেছিলো বিলাতে। এই হচ্ছে ভুঁইডোল, লিচু ও সংস্কৃতির এপি-সেনটার। সীতার বাপের বাড়ীর নিকটেই জনকপুর।

তারপর ডেরাডুন চলুন। সেখানে জুলাই ভর্ লিচি রহতা হ্যায়। এমন কি আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। খুব মোটা 'মাংস'। রস কম। রং রেডিশ-ব্রাউন। 'বাংলা'র কম্পাউণ্ডে লিচুর গাছ, ফলে ঝামরে পড়েছে। 'রাখোয়া' বা ঠিকেদার যে পাহারা দেয় সেই বিক্রি করে। 'লিচি মিলি?' জিজ্ঞাসা করেন যদি সে বলবে 'কয় মণ চাহি, বাবুজী?' সেকালে ৫০০ লিচু একদিনে কেউ কেউ হজম করতো। একটা আঁটি শেষে কোঁক ক'রে গিলে ফেলতো। এতেই সব হজম হয়ে যেতো।

শুনতে পাই এক বাগানের মালিক সে খুব বড়াই ক'রে বলতো 'মেরা ঘর হ্যায় দালিয়ানওয়ালা দেহরাদন্,' বাগানের ফাটকে মানুষ ওজন করতো। তারপরে তাকে 'ছড়দেওয়ালি বালা' বাগান ছেড়ে দিতো। সে ঘণ্টাখানেক গাছে চ'ড়ে লিচু খেয়ে বেরিয়ে এসে আবার ওজন হতো! যদি আধ সের বাড়তো তবে এক সের লিচুর দাম তাকে দিতে হতো। কলকাতায় লিচু কখনও ওজন ক'রে বিক্রি হয় না।'

মিথিলা ও দেহরাদন্ লিচুর বিচি খুব ছোটো। খোলা বিচি বাদ দিলে এক সের আধ সেরে দাঁড়ায়। সোনারপুর লিচু এক সের ছাড়ালে এক পোয়া হয়। এই একপো এক সের ঘন দুধে ছেড়ে দেবেন। ঠাণ্ডা হ'লে ক্ষীর কমলা বা আতার পায়েসের চেয়ে ভালো চিজ খাবেন।

৭০-৭৫ বছর আগে আমরা মিথিলায় দৈ-চিঁড়ে ও লিচুর শাঁস তাতে দিয়ে ফলার খেতাম। অতি উপাদেয় উপকরণ। চিঁড়ে ভিজতে তর সইতো না, মন্ত্র পড়া হতো ঃ—

হরি বল মন
চিঁড়ে ভিজতে কতক্ষণ?
চট্‌কে লিচু চিনি কিছু,—
গিল্‌তে কতক্ষণ?

[অন্যান্য ফলেরও ছড়া আছে,

"আম জাম গাছে পাকে
পানিআল্‌লা হাতে পাকে"

আমলকীর মতোন এই ফল দুহাতের চেটোয় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মন্ত্র দ্বারা পাকিয়ে খেতে হয়। দেখতে দেখতে লাল ও মিষ্টি হয়ে ওঠে। এই পানিআল্‌লা গাছে পাকে না, এটা দ্বারভাঙ্গাতে হয়। একবার হগসাহেবের বাজারে দেখেছিলাম মাত্র।]

দেহরাদন্‌ লিচু গাছ খুব উঁচু। মিথিলার গাছে তলা থেকেই কাঁঠালের মতো লিচু ধরে। একটা লোক শুয়ে শুয়ে লিচু খেতে পারে। ফাটকের দুদিকে দুটো লিচু গাছ থাকলে মে মাসে বোধহয় যেন দুটা প্রকাণ্ড তুবড়ি রাঙা টুকটুকে আগুনের ফোয়ারা ছাড়ছে।

দেহরাদন্‌ লিচু উঁচু ডালে ফলে। কৃষ্ণনগরের লিচু গাছে চ'ড়ে খেয়েছি এককালে। কাঠ-পিঁপড়ে ও মৌমাছির খপ্পর বেশ মনে আছে। পশ্চিমে 'রাখোয়া' (চৌকিদার) মুখোস প'রে চোখ বাঁচায়।

শুখনো রেলওয়ে কটিংএ তীরহুতে এক জাতের ছোটো ভালুক বাস করে। তারা লিচুবাগানে গাছে মৌমাছি খায়, মধুসমেত চাক কড়মড় ক'রে চিবায়। 'ডালু লালচিঁউটি জবান সে লপেটকে ভোজন করতা হায়।' কাঠপিঁপড়ে ও মৌমাছির ভয় অনেক কমে যায়। ভালুক লিচু নষ্ট করে না।

কিন্তু বাঁদর লিচু ধ্বংস করে। মিথিলার একটা বীর বাঁদর যখন

তার পঞ্চাশটা সহধর্মিণীর সহিত বাগানে হানা দেয় তখন বোধহয় সাক্ষাৎ ওয়ারেন হেস্‌টিংস সব লিচু সাবাড় করতে এসেছেন।

'মজঃফরপুর' লিচু মিথিলার সকল স্থানে ফলে, নাম হয়েছে 'মজঃফরপুর'; 'লখনউ খরবুজা' যেমন ইউ-পির সকল জেলায় ফলে, 'বেনারসী ল্যাংড়া' যেমন এলাহাবাদে সর্বোৎকৃষ্ট, 'বোম্বাই আম' যেমন বিহারেও ফলে।

এক বাগানে খোঁড়া মালিকের ঠ্যাং দেখে 'ল্যাংড়া আম' নাম হয়েছে। মানুষের নাম থেকে অনেক ফল ও শস্যের নামকরণ হয়, যেমন কামিনী ধান, দা(উ)দখানী চাল, সীতাফল, Adam's apple. Li Chi নামে এক চিনেম্যান পিকিংএর উত্তরে বাগান করতো। আর পিকিংএর পশ্চিমে তার বন্ধু Pi Chi আপেল ফলাতো তার বাগানে, লালচে হলদে গালভরা ফল। এই 'আপেল' পারসিয়া হয়ে ইওরোপে গেল। নাম হল Pichi (peach) আর Li Chir বাগানের রাঙা (গায়ে wort বা কাঁটাওয়ালা) ফল ভারতে এলো, নাম হলো L-i-c-h-i লি চি। বিলাতে অনেক লোক 'লি কি' উচ্চারণ করতো বলে একটা 't' লাগানো হলো, বানান হলো, Litchi. [দুই লিচুখোর ওয়ারেন হেস্‌টিংস এবং মেকলে এ বানান লিখতো না ; সুরেন বাঁড়ুয্যের মতোন তারা The Bengalee, the leechee, the Bengalese লিখতো।]

কেউ বলেন Li Chir বাপের নাম ছিলো Fi Choo, অতএব তার ব্যাটার নাম নিশ্চয়ই Li Choo ছিলো। বাঙালী ঠিক উচ্চারণ করে 'লি-চু'; দামু ঘোষের ব্যাটা শিশুপাল মানায় না'।

বাঙালী মনে করেন 'মজঃফরপুর' লিচু বুঝি বাংলাদেশে হ'তে পারে না। দমদম রোডে এক কম্পাউণ্ডে উৎকৃষ্ট 'মজঃফরপুর' ফলচে। সাইজও প্রায় সমান। বছরে এককুড়ি আন্দাজ আমার জঠরে যায়।

আর Adam's apple কোথা ফলে জানেন? খুব বেশি হুকো

খেলে বা সিগারেট ফুঁকলে ছোটো একটি গলগণ্ডর মতোন গলার ওপোর ফলে। রাষ্ট্রভাষায় একে 'ঘেঘা' বলে।

৭০ বছর পূর্বে নর্থ বিহারে লিচু চার আনায় হাজার বাড়িতে দিয়ে যেতো। ঘরে ঘরে দেওয়ালে গোছা গোছা টাঙানো থাকতো,—হরদম মুখ চলচে। আমরা উলোর ভোজনলোলুপ বাঙাল, কথার ঢং বদলেছি: কিন্তু এক ভদ্রলোক পুরানো চাল এখনও বজায় রেখেচেন! লিচুর গল্প হতেই দুঃখ করে বললেন, 'আমরা লিচু তখন গুনে খেতাম না!' দ্বারভাঙ্গা ষ্টেশনে লিচুর স্পেশেল গুডস ট্রেন ছাড়তো, হাজার হাজার ঝুড়ি চালান যাচ্ছে, রাত্রেও বুকিং চলতো। 'গুণে' খাবার দরকার। 'মজঃফরপুর' লিচু আগে কলকাতায় রেফ্রিজারেটর 'কারে' চালান আসতো। টাট্‌কা দুই একবার খেয়েছিলাম—কি ঠাণ্ডা! এখন বারুই-পুর একটু বড়ো পেলেই 'মজঃফরপুর কা লিচি হ্যায়' ব'লে বাজারে ঠকায়। আমদানি কমে গেছে। যা আসে হগসাহেবের বাজারেই পাওয়া যায়।

মেকলের লিচুর নামে লাল গড়াতো। অন্য লোক লিচু ভালো-বাসলে তার তারিফ করতো—

"Warren Hastings naturalised in Worcestershire the delicious leechee, the only fruit of Bengal which deserves to be regretted even amidst the plenty of Covent Garden."

ওয়ারেন হেস্‌টিংস লিচুর কদর বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। আর কিছু দিন থাকলে ছোঁড়া সব গাছগুলো উপড়ে নিয়ে যেতো।

কলকাতার ফেরিওয়ালা 'লিচু ফল!' হাঁকে। এটা ভাষাবিদ্‌দের অনুমোদিত নয়। এত ছোটো শব্দ লোকে বুঝতে পারবে না ব'লে 'ফল' যোগ করে। 'লে লিচি!' পশ্চিমে হাঁকে। অন্ততঃ দুটো শব্দ চাই, তবে সুর তাল বজায় থাকবে।

আম কাঁঠাল লিচু আনারস জাম কোনওটাতেই 'ফল' শব্দ ন্যায্য নয়।

'ফল'যুক্ত ফল গোটাকতক আছে বটে ঃ—পানিফল, মাজুফল, শ্রীফল, আঁশফল, মাকালফল, জায়ফল, সীতাফল, প্রতিফল এবং কর্মফল [যা রোজ ভোগ করি] ; এর আগেরটি গোল-লম্বাটে দেখতে ; রুশ-মার্কিণ উভয় উভয়কে উপহার দেবার জন্য ব্যগ্র। হিন্দিতে জায়ফর্ বলে। 'ফর' হচ্চে গ্রাম্য 'ফল',—'ই কি ফর্ আঁটে ?' এক টুকরা ভেলিগুড় নিয়ে এই কথা ব'লে ফল মনে ক'রে এক গাঁওইয়া ছুরি দিয়ে খোলা চাঁচতে লাগলো, বলছে 'ছোলত্ ছোলত্ ছোলত্,' অর্থাৎ সব ছাড়ানো হ'ল তবু শাঁস পেলাম না। ইংরেজীতে মোটে দুটি ফল আছে যাতে 'ফল' লাগে,—Bread-fruit, Jackfruit.

হাঁ, ঠিক বটে, মনে পড়েছে। কে বলে যে লিচুর সঙ্গে 'ফল' নিয়মবিরুদ্ধ ? পুরোহিতের সংস্কৃত জ্ঞান যদি আমার মতোন টন্‌টনে হয় এবং সেই কারণে তাঁকে বাংলায় মন্ত্র পাঠ করতে হয় তা হলে লিচুতে 'ফল' লাগানো যুক্তিসংগত। কিন্তু একটা খাঁটি সংস্কৃত শব্দ শেষে থাকা চাই। কারণ সংস্কৃতর দাপটেই যজমান ঠকানো চ'লে আসচে চিরকাল।

এক তাঁতী-মায়ের পায়ে গোদ হয়েছিলো। সেকালে পুরুতেই মন্ত্র পড়ে চিকিৎসা করতো, নাপিত অস্ত্রোপচার করতো। বাড়িতে ছিলো তাঁতী, তার বউ ও মা, আর একটা পোষা ছাগল।

পুরুতঠাকুর চার রকম ফল নিয়ে পূজায় বসলেন। সংস্কৃত ভুলে গেছেন ব'লে বাংলায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে মন্ত্র পড়বেন। সকলকে বললেন, আমার সামনে বস, ছাগলটাকেও আনো। আমি একটি সংস্কৃত শব্দ শিখে এসেছি, সেটি বাংলা মন্ত্রের শেষে দেব ; তিন দিনে গোদারোগ্য ঃ—

আম ফলো, জাম ফলো, কাঁটাল ফলো,
লিচু ফলো, তিন মনুষ্য এক ছাগলো :
তাঁতীর মাএর গোদারোগ্যং করিষ্যামি !

'যুগান্তর' সাময়িকী। ১২ই বৈশাখ ১৩৬১ ॥

প্রেম ও ডাণ্ডা

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেজে ঘষে রূপ আর ধ'রে-বেঁধে প্রেম—এটা নাকি হবার জো নেই। কিন্তু আমার মনে হয় এত বড়ো মিথ্যে কথা তুনিয়ায় খুব কমই পাচার হয়েছে। মেজে ঘষে যদি রূপ না ফুটতো তাহলে তো আমাদের থিয়েটারগুলি একেবারে অচল হয়ে যেতো। এই দেখ না আমাদের খেঁদী সুন্দরীকে। ইনি যখন আলু'চেরা চোখগুলিতে সুর্‌মা লাগিয়ে, চুলগুলি ফুলিয়ে দিয়ে কপালের পরিমাণ ঢেকে ফেলে জোঁকের মতো ঠোঁট তুখানিতে তরল আলতা লাগিয়ে সুমুখে এসে দাঁড়ান, তখন সাক্ষাৎ তুর্বাসার দশ বছরের তপস্যা ভেঙে যাবার যোগাড় হ'য়ে যায়। অরূপের মধ্যে রূপ ফোটানো এই তো সৃষ্টির গোড়ার কথা।

আর তারপর ধ'রে-বেঁধে প্রেম। হয় না বলছো? বলি, জাহাঙ্গীর বাদশা যখন নূরজাহান বিবিকে বর্ধমান থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলেন তখন ব্যাপারটা যে খুব নন ভায়োলেণ্ট রকমের হয়নি একথা ইতিহাসে তো লেখে। বেগম সাহেব যে প্রথমটা চ'টে একেবারে লাল হয়ে তাঁর সতীত্ব প্রমাণ করেছিলেন, এ প্রমাণও পাওয়া যায়। কিন্তু তিন দিন যেতে না যেতে রাগের লালটুকু যে প্রেমের গোলাপীতে পরিণত হয়েছিলো, এ-কথা তো আর অস্বীকার করবার জো নেই। ম্যাদামারা ভালোমানুষ স্বামীর স্ত্রী দজ্জাল; আর দস্যি স্বামীর স্ত্রী হয় একেবারে মেনী বেড়ালটির মতো পতিব্রতা—কেন বলো দেখি? স্বামী যেখানে মডারেট, স্ত্রী সেখানে একদম সাফ্রেজিট।

রাজনীতিতে যেমন তুটো রাস্তা—মডারেট আর এক্সট্রিমিস্ট, প্রেমনীতিতেও ঠিক তাই। এ-কালের মডারেট প্রেমিকেরা লতানে চুলে সিঁথি কেটে প্রেমিকার পানে কাতর দৃষ্টি হানতে হানতে কবিতার খাতা বোঝাই করেন; আর সেকালের এক্সট্রিমিস্ট প্রেমিকেরা বেড়ালে যেমন ক'রে ইঁতুর ধরে, তেমনি প্রেমিকাকে বগলে পুরে ঘোড়ায় চ'ড়ে

পগার পার হতেন। ছিঁচকাঁদুনে প্রেমের চেয়ে যে মিলিটারী প্রেমটা জমতো ভালো, তার সাক্ষী ইতিহাস আর পুরাণ। আমাদের প্রপিতামহীরা যে প্রপিতামহদের সঙ্গে চিতায় পুড়ে স্বর্গে চ'লে যেতেন সেটা শুধু স্বর্গে গিয়েও ঐ মিঠে মিঠে জবরদস্তিটুকু পাবার লোভে। বিশ্বাস না হয় গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ।

* * *

রাজনীতির দিকেও চেয়ে দেখ না। সেখানেও প্রেম আদায় করবার জন্যে মন্ত্র হচ্ছে জবরদস্তি। ওয়াশিংটন যদি কাঁদুনি গেয়ে বলতেন যে আমেরিকা স্বাধীন ক'রে না দিলে তিনি মনের দুঃখে সাতরাত্রি উপোস ক'রে মারা যাবেন, না হয় গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তা'হলে আজ আমেরিকার দুঃখে শেয়ালকুকুর কাঁদতো। আজ যে ইংরেজ আমেরিকার সঙ্গে প্রেমে পড়বার জন্যে এত ব্যস্ত তার মূলে হচ্ছে ঐ ওয়াশিংটনের ডাণ্ডা। তাল বুঝে ঐ ডাণ্ডা লাগাতে পারলে, নবদ্বার ভেদ ক'রে প্রেমের প্রবাহ ছুটবেই ছুটবে।

উনপঞ্চাশী। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ॥

নামতত্ত্ব

রাজশেখর বসু

হরিনাম নয়, সাধারণ বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকের নামের কথা বলিতেছি।

কবি যাহাই বলুন, নাম নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস নয়। পুত্রকন্যার নামকরণের সময় অনেকেই মাথা ঘামাইয়া থাকেন। অতএব নাম লইয়া একটু আলোচনা করা নিরর্থক হইবে না।

প্রথম প্রশ্ন—বাঙালীর সংক্ষিপ্ত নাম কিরকম হওয়া উচিত। মিস্টার ব্রাউনের নকলে মিস্টার ব্যানার্জি চলিয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক হাজার আছেন। এত বড়ো গোষ্টীর প্রত্যেকে যদি মিস্টার ব্যানার্জি হইতে চান তবে লোক চেনা মুশকিল। বিলাতী প্রথার অন্ধ অনুকরণে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। পাড়াগাঁয়ে বা অন্তরঙ্গগণের মধ্যে বাঁড়ুজ্যে মশায় চলিতে পারে, কারণ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে লোক চেনা সহজ। কিন্তু সর্বসাধারণের কাছে বাঁড়ুজ্যে বলিলে ব্যক্তি বিশেষকে বোঝায় না। সুরেন্দ্রবাবু বরং ভালো। সুরেন্দ্রের সংখ্যা অনেক হইলেও বোধ হয় বাঁড়ুজ্যের সংখ্যা অপেক্ষা কম। যদি নামের বিশেষ করা বাঞ্ছনীয় হয় তবে নামকরণের সময় সুরেন্দ্রের পরিবর্তে অন্য কোনও অসাধারণ নাম রাখা যাইতে পারে। কিন্তু বৈশিষ্ট্যের জন্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেশি রকম রূপান্তরিত করা অসম্ভব। বাঁড়ুজ্যে, ব্যানার্জি, বনারজি—বড়ো জোর বানরজি। সুরেন্দ্রবাবুতে অরুচি হইলে মিস্টার সুরেন্দ্র বা শ্রীযুত সুরেন্দ্র বা সুরেন্দ্রজী চলিতে পারে। কেউ হয়তো বলিবেন—বাপের নাম মিস্টার সুরেন্দ্র আর ছেলের নাম মিস্টার রমেশ ইহা বড়ো বিসদৃশ; মিস্টার ব্রাউনের পুত্র মিস্টার ব্ল্যাক—এ রকম বিলাতী নজির নাই। বাপের নাম বজায় রাখার উদ্দেশ্য সাধু; কিন্তু তাহা অন্য উপায়েও হইতে পারে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশে

পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নাম যোগ করার রীতি আছে। বংশগত পদবীটা ছাড়িতে বলিতেছি না, পুরা নাম বলিবার সময় ব্যবহার করিতে পারেন। মিস্টার স্থরেন্দ্র যদি স্বনামে জগদ্বিখ্যাত হন তবে বংশপরিচয় না দিলেও চলিবে। কালিদাস পাঁড়ে ছিলেন কি চৌবে ছিলেন, সক্রেটিস কোন কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাহা এখনও জানা যায় নাই, কিন্তু সেজন্য কোনও ক্ষতি হয় নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—নাম শ্রীযুক্ত না শ্রীহীন হইবে। এই জটিল বিষয় লইয়া অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে। শ্রী-বিরোধী বলেন—শ্রীঅর্থে ভাগ্যবান, নিজের নামে যোগ করিলে সৌভাগ্যগর্ব প্রকাশ পায়; আর অক্ষরটিও নিষ্প্রয়োজন বোঝা মাত্র। শ্রীর আদিম অর্থ যাহাই হউক সাধারণে এখন গতানুগতিক ভাবেই ব্যবহার করে, অতএব গর্বের অপবাদ নিতান্ত ভিত্তিহীন। যিনি অনাবশ্যক বোধে ভার কমাইতে চান তিনি শ্রী বর্জন করিতে পারেন। তবে অনেকে যেসব ভারি ভারি বোঝা নামের সঙ্গে যোগ করিবার জন্য লালায়িত তাহার তুলনায় শ্রী-অক্ষরটি নগণ্য।

তাহার পর সমস্যা নামের গঠন লইয়া। বাঙালী পুরুষের নাম প্রায় দুই শব্দ-বিশিষ্ট, যথা—নরেন্দ্র-নাথ, নরেন্দ্র-কৃষ্ণ। দুই শব্দ কি সমাসবদ্ধ না পৃথক? ষষ্ঠীতৎপুরুষে নরেন্দ্রনাথও তদ্রূপ, অর্থাৎ রাজার রাজা তস্য রাজা। নরেন্দ্রকৃষ্ণ বোধ হয় দ্বন্দ্ব সমাস, অর্থাৎ ইনি নরেন্দ্র বটেন কৃষ্ণও বটেন। নরেন্দ্রলাল সংস্কৃত-ফারসীর খিচুড়ি, ভাবার্থ বোধ হয় নরেন্দ্র নামক দুলাল। নিবারণচন্দ্র বোঝা যায় না, হয়তো আন্নাকালীর পুং সংস্করণ। মোট কথা, লোকে ব্যাকরণ অভিধান দেখিয়া নাম রাখে না, শুনিতে ভালো হইলেই হইল। রাজা-মহারাজেরা গালভরা নাম চান, যথা জগদিন্দ্রনারায়ণ, ক্ষৌণীশচন্দ্র। কিন্তু তাঁহারা বিলাতী অভিজাতবর্গের তুলনায় অনেক অল্পে তুষ্ট। George Fitzpatrick Fitzgerald Marmaduke Baron Figgins—এরকম নাম এখনও এদেশে চলে নাই। উড়িষ্যায় আছে

বটে—শ্রীনন্দনন্দন হরিচন্দন ভ্রমরবর রায়। সুখের বিষয় আজকাল অনেক বাঙালী ছোটোখাটো নাম পছন্দ করিতেছেন।

বাঙালী বিদ্যাভিমানী শৌখিন জাতি। শরীরে আর্যরক্তের যতই অভাব থাকুক, বিশুদ্ধ সংস্কৃতমূলক নাম বাঙালীর যত আছে অন্য জাতির বোধ হয় তত নাই। তথাপি অর্থবিভ্রাট অনেক দেখা যায়। মন্মথর পুত্র সন্মথ, শ্রীপতির পুত্র সাতকড়িপতি, তারাপদর ভাই হীরাপদ, রাজকৃষ্ণের ভাই ধিরাজকৃষ্ণ দুর্লভ নয়।

আর এক ভাবিবার বিষয়—নামের ব্যঞ্জনা বা Connotation। যেসকল নাম অনেক দিন হইতে চলিতেছে তাহা শুনিলে মনে কোনও রূপ ভাবের উদ্রেক হয় না। নরেন্দ্রনাথ বা এককড়ি শুনিলে মনে আসে না নামধারী বড়োলোক বা কাঙাল। রমণীমোহন সুপ্রচলিত সেজন্য অতি নিরীহ, কিন্তু মহিলামোহন শুনিলে lady killer মনে আসে। অনিলকুমার নাম বোধহয় রামায়ণে নাই, সেজন্য ইহা এখন শৌখিন নামরূপে গণ্য হইয়াছে কিন্তু পবননন্দন নাম হইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দুরূহ। কালিদাসী সেকেলে হইলেও অচল নয়, কালীনন্দিনীর বিবাহের আশা কম, নাম শুনিলেই মনে আসিবে রক্ষাকালীর বাচ্চা। অতএব নামকরণের সময় ভাবার্থের উপর একটু দৃষ্টি রাখা ভালো। আজকাল পুরুষের মোলায়েম নাম অতিমাত্রায় চলিতেছে। রমণী, কামিনী, সরোজ, শিশির, নলিনী, অমিয় ইত্যাদি নাম পুরুষরা অনেক দিন হইতে বেদখল করিয়াছেন, এখন আবার কুসুম, মৃণাল, জ্যোৎস্না লইয়া টানাটানি করিতেছেন। চলন হইয়া গেলে অবশ্য সকল নামের ব্যঞ্জনা লোপ পায় কিন্তু কোমল নারীজনোচিত নামের বাহুল্য দেখিয়া বোধ হয় বাঙালী পিতামাতা পুত্র-সন্তানকে কমলবিলাসী সুকুমার করিতে চান।

পুরুষের নাম একটু জবরদস্ত হইলেই ভাল হয়। ঘটোৎকচ বা খড়্গেশ্বর নাম রাখিতে বলি না, কিন্তু যাহা আমরণ নানা অবস্থায়

ব্যবহার করিতে হইবে তাহা একটু টেকসই গরদখোর হওয়া দরকার। উপন্যাসের নায়ক তরুণকুমার হইতে পারেন, কারণ কাহিনী শেষ হইলে তাঁহার বয়স আর বাড়িবে না। কিন্তু জীবন্ত তরুণকুমারের বয়স বাড়িয়া গেলে নামটা আর খাপ খায় না। বালকের নাম চঞ্চলকুমার হইলে বেমানান হয় না, কিন্তু উক্ত নামধারী যদি চল্লিশ পার হইয়া মোটা থপথপে হইয়া পড়েন তবে চিন্তার কথা। জ্যোৎস্নাকুমার কবি বা গায়ক হইলে মানায়, কিন্তু চামড়ার দালালি বা পুলিশ কোর্টে ওকালতি তাঁহার সাজে না।

মেয়েদের বেলা বোধ হয় এতটা ভাবিবার দরকার নাই। তাঁহারা সুরূপা, কুরূপা, বালিকা, বৃদ্ধা যাহাই হউন, নামটা তাঁহাদের অঙ্গের অলংকার বা বেনারসী শাড়ির মতোই সর্বাবস্থায় সহনীয়।

কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে আর একদিক হইতে কিছু ভাবিবার আছে। কিছুকাল পূর্বে এক মাসিক পত্রিকায় প্রশ্ন উঠিয়াছিল—মেমেদের যেমন নামের আগে মিস বা মিসিস যোগ হয় বাঙালী মহিলার নামে সেরূপ কিছু হইবে কিনা। অবিবাহিতা বাঙালী মেয়ের নামের আগে আজকাল কুমারী লেখা হয়, কিন্তু বিবাহিতার বিশেষণ দেখা যায় না। ভারতের কয়েকটি প্রদেশে সধবাসূচক শ্রীমতি বা সৌভাগ্যবতী চলিতেছে। জিজ্ঞাসা করি—কুমারী বা সধবা বা বিধবাসূচক বিশেষণের কিছুমাত্র দরকার আছে কি? পুরুষের বেলা তো না হইলেও চলে। স্ত্রীজাতি কি নিলামের মাল যে নামের সঙ্গে for sale অথবা sold টিকিট মারা থাকিবে? বিলাতী প্রথার কারণ বোধহয় এই যে বিলাতী সমাজে নারীর উপযাচিকা হইয়া পতিপ্রার্থনা করিবার রীতি এখনও তেমন চলে নাই, সেজন্য পুরুষ বিবাহিত কিনা তাহা নারীর না জানিলেও চলে। কিন্তু বিবাহার্থী পুরুষ আগেই জানিতে চায় নারী অনূঢ়া কিনা। এদেশে অধিকাংশ বিবাহই ভালোরকম খোঁজখবর লইয়া সম্পাদিত হয়, সেজন্য নারীর নামে মার্কা দেওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক।

পরিশেষে আর একটি কথা নিবেদন করি। বাঙালী মহিলা দ্বিজবর্ণা হইলে দেবী লেখেন। যাঁহারা দ্বিজা নহেন তাঁহারা সেকালে দাসী লিখিতেন, এখন স্বামীর পদবী বা অনূঢ়া হইলে পিতৃপদবী লেখেন। যাঁহারা দ্বিজাতির দেবত্বের দাবি করেন তাঁহারা দেবী লিখুন, কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যে সকল মহিলা বংশগত শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করেন না তাঁহারা কেন নামের শেষে দেবী লিখিয়া দ্বিজেতরা নারী হইতে পৃথক গণ্ডিতে থাকিবেন? অবশ্য নারী মাত্রই যদি দেবী হন তবে আপত্তির কারণ নাই, বরং একটা সুবিধা হইতে পারে। অনাত্মীয়া অথচ সুপরিচিতা মহিলাকে মাসী পিসী দিদি বউদিদি বলিয়া অথবা নাম ধরিয়া ডাকা চলে। কিন্তু অল্পপরিচিতার সঙ্গে হঠাৎ সম্বন্ধ পাতানো যায় না, কেবল নাম ধরিয়া ডাকাও বেয়াদবি। যদি নামের সঙ্গে দেবী যোগ করিয়া ডাকার প্রচলন হয় তবে বাংলা কথাবার্তায় শ্রুতিকটু মিস আর মিসিস বাদ দেওয়া চলে। কুমারী বা বিবাহিতা তরুণী বা বৃদ্ধা যাহাই হউন, 'শুনছেন অমুকা দেবী' বলিয়া ডাকিলে দোষ কি?

লঘুগুরু। আষাঢ় ১৩৪৬॥

গণেশ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

সর্ববিঘ্নহর ও সর্বসিদ্ধিদাতা ব'লে যে দেবতাটি হিন্দুর পূজা-পার্বণে সর্বাগ্রে পূজা পান, তাঁর 'গণেশ' নামেই পরিচয় যে তিনি 'গণ' অর্থাৎ জনসঙ্ঘের দেবতা। এ থেকে যেন কেউ অনুমান না করেন যে, প্রাচীন হিন্দুসমাজের যাঁরা মাথা, তাঁরা জনসঙ্ঘের উপর অশেষ ভক্তিমান ও প্রীতিমান ছিলেন। যেমন আর সব সমাজের মাথা, তেমনি তাঁরাও সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তিকে ভক্তি করতেন না, ভয় করতেন! 'গণেশ' দেবতাটির আদিম পরিকল্পনায় এর বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আদিতে 'গণেশ' ছিলেন কর্মসিদ্ধির দেবতা নয়, কর্মবিঘ্নের দেবতা। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির মতে এঁর দৃষ্টি পড়লে রাজার ছেলে রাজ্য পায় না, কুমারীর বিয়ে হয় না, বেদজ্ঞ আচার্যত্ব পান না, ছাত্রের বিদ্যা হয় না, বণিক ব্যবসায়ে লাভ করতে পারে না, চাষীর ক্ষেতে ফসল ফলে না। এই জন্যই 'গণেশে'র অনেক প্রাচীন পাথরের মূর্তিতে দেখা যায় যে, শিল্পী তাঁকে অতি ভয়ানক চেহারা দিয়ে গড়েছে। এবং গণেশের যে পূজা, তা ছিলো এই ভয়ংকর দেবতাটিকে শান্ত রাখবার জন্য; তিনি কাজকর্মের উপর দৃষ্টি না দেন, সেজন্য ঘুষের ব্যবস্থা। গণ-শক্তির উপর প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার কর্তাদের মনোভাব কি ছিল, তা গণেশের নরশরীরের উপর জানোয়ারের মাথার কল্পনাতেই প্রকাশ।

কিন্তু এ মনোভাব প্রাচীন হিন্দুর একচেটিয়া নয়। সকল সভ্যতা ও সমাজের কর্তারাই জনসঙ্ঘকে 'লম্বোদর গজানন' ব'লেই জেনেছেন। ওর হাত-পা মানুষের, কিন্তু ওর কাঁধের উপর যে মাথাটি তা মানুষের নয়, মনুষ্যেতর জীবের। আর ওর উদর এত প্রকাণ্ড যে, তাকে যথার্থ ভরাতে হ'লে, যাদের কাঁধের উপর মানুষের মাথা, তাদের সুখ-সুবিধার উপকরণ অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং সব দেশের যারা বুদ্ধিমান লোক, তারা, মগজে মানুষের বুদ্ধির পরিবর্তে জানোয়ারের নির্বুদ্ধিতা রয়েছে

ভরসায়, ওর বিরাট উদরের যতটা খালি রেখে সারা যায়, সেই চেষ্টা ক'রে এসেছে। সেইজন্য কখনও তাকে অঙ্কুশে ক্লিষ্ট, কখনও বা খোসামোদে তুষ্ট করতে হয়েছে। কারণ আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত কোনও 'পলিটিশ্যানের পলিটিক্যাল খেলা' এ-দেবতাটির সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয়নি। অথচ সে সাহায্য পেতে হবে বিশেষ খরচের মধ্যে না গিয়ে। অর্থাৎ গণদেবতার পূজায় ভোগের উপকরণের দৈন্য সকলেই মন্ত্রের বহরে পূরণ করেছে ;— 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা,' 'গণবাণীই ভগবদ্বাণী,' 'সুরাজ থেকে স্বরাজ শ্রেষ্ঠ,' 'জননায়ক হচ্ছে জনসেবক,' ইত্যাদি। এবং সকলেই 'লম্বোদর গজেন্দ্রবদনে'র সৌন্দর্য-বর্ণনায় শ্লোক রচনা ক'রে তাকে তোষামোদে খুসি করেছে।

যারা গণদেবতাকে খোসামোদে ভুলিয়ে নিজের কাজ হাসিল করতে চায় না, চায় ঐ দেবতাটির নিজের হিত—তাদের এ কথা মেনে নেওয়াই ভালো যে, এ দেবতার মানুষের শরীরের উপর গজমুণ্ডের কল্পনা একেবারে মিথ্যা কল্পনা নয়। কোন শনির কুদৃষ্টিতে এর নরমুণ্ড খসেছে সে ঝগড়া আজ নিরর্থক। কোন দেবতার শুভদৃষ্টি এর মুণ্ডকে মানুষের মাথায় পরিণত করবে, সেইটি জানাই প্রয়োজন। কারণ, খোসামুদেরা যাই বলুক, মানুষের কাঁধে হাতির মাথা সুন্দর নয়, নিতান্ত অশোভন।

যে দেবতার সুদৃষ্টি এই অঘটন ঘটাতে পারে, তিনি হচ্ছেন বীণাপাণি, যিনি জ্ঞানের দেবতা। এক জ্ঞানের শক্তি ছাড়া গজমুণ্ডকে নরমুণ্ডে পরিবর্তনের ক্ষমতা আর কিছুরই নেই। সুতরাং গণদেবতার যারা হিতকামী, তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে এই দেবতাটির মাথার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের তড়িৎ সঞ্চালন করা। জনসঙ্ঘকে সভ্যতার ভারবাহী মাত্র না রেখে, সভ্যতার ফলভোগী করতে হ'লে, প্রথম প্রয়োজন জনসাধারণকে জ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করা।—আকাশে বিস্তৃত বিশ্ব ও তার জটিল কার্যকারণজাল, কালে প্রসৃত মানুষের বিচিত্র ইতিহাস, ও এই দেশ ও কালের মধ্যে বর্তমান মানুষের গতি ও পরিণতির জ্ঞান,

আজকের দিনের পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের, এক দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্বন্ধ, ধন উৎপাদন ও বিতরণের অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান এমন অদ্ভুত জটিল ও বহুবিস্তৃত হ'য়ে উঠছে যে, অজ্ঞান জনসাধারণকে মাঝে মাঝে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে বুদ্ধিমান লোকের নিজের হিত খুব সম্ভব হ'লেও, জনসাধারণের হিত একেবারেই সম্ভব নয়। বাইরের পরামর্শে গড়া ঐ সব সাময়িক উত্তেজনার দল, সঙ্ঘের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের অন্তর্দৃষ্টির অভাবে ক্রমাগত ভেঙে যায়; আর যতদিন টিকে থাকে, ততদিনও ঐ পরামর্শদাতাদের ক্রীড়নক হ'য়েই থাকে।

জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে তার নিজের হিতের পথ নিজেকে চিনতে শেখানো কেবল বহুকষ্টসাধ্য ও অনেক সময়সাপেক্ষ নয়, ঐ দীর্ঘ ঘোরানো পথ ছেড়ে, খাড়া সরল পথে তার হিতচেষ্টার প্রলোভন দমন করাও দুঃসাধ্য। এই নিরন্ন বঞ্চিত মানুষের দলকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে, কেবলমাত্র সংখ্যার জোরে তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করিয়ে দিতে কোন জন-হিতৈষীর না লোভ হয়! কিন্তু, মানুষের প্রকৃতি ও সমাজের গতির দিকে চেয়ে এ লোভ দমন করতে হবে। অজ্ঞান মানুষের খুব বড়ো দলও চক্ষুষ্মান মানুষের ছোটো দলের বিরুদ্ধে অনেক দিন দাঁড়াতে পারে না। এবং পৃথিবীর সব দেশে যে অল্পসংখ্যক লোক জন-সাধারণের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থের বিরোধী মনে ক'রে তাকে চেপে রেখেছে, তারা আর যা-ই হোক, অতি কৌশলী ও বুদ্ধিমান লোক। এদের সঙ্গে লড়তে হ'লে, ভেবে না বুঝলে একদিন ঠেকে শিখতে হবে যে, সরল পথই সোজা পথ নয়।

কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার এইটিই একমাত্র, এমন কি প্রধান প্রয়োজন নয়। জ্ঞান যে বাহুতে বল দেয়, জ্ঞানের তাই শ্রেষ্ঠ ফল নয়; জ্ঞানের চরম পরম ফল যে তা চোখে আলো দেয়। জন-সাধারণের চোখে জ্ঞানের সেই আলো আনতে হবে, যাতে সে মানুষের সভ্যতার যা সব অমূল্য সৃষ্টি,—তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, তার কাব্যকলা—তার মূল্য জানতে পারে। জনসাধারণ যে বঞ্চিত, সে কেবল অন্ন

থেকে বঞ্চিত ব'লে নয়, তার পরম দুর্ভাগ্য যে সভ্যতার এই সব অমৃত থেকে সে বঞ্চিত। জনসাধারণকে যে শেখাবে একমাত্র অন্নই তার লক্ষ্য, মনে সে তার হিতৈষী হলেও, কাজে তার স্থান জনসাধারণের বঞ্চকের দলে। পৃথিবীর যে সব দেশে আজ জনসঙ্ঘ মাথা তুলছে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচারেই তা সম্ভব হয়েছে। তার কারণ কেবল এই নয় যে, শিক্ষার গুণে পৃথিবীর হালচাল বুঝতে পেরে জনসাধারণ জীবনযুদ্ধে জয়ের কৌশল আয়ত্ত করেছে। এর একটি প্রধান কারণ সংখ্যার অনুপাতে জনসাধারণের সমাজে শক্তিলাভের যা গুরুতর বাধা, অর্থাৎ সভ্যতালোপের আশঙ্কা, শিক্ষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে সে বাধার ভিত্তি ক্রমশঃই দুর্বল হ'য়ে আসে। জনসাধারণের বিরুদ্ধে আভিজাত্যের স্বার্থের বাধা সভ্য মানুষের মনের এই আশঙ্কার বলেই এত প্রবল। এই আশঙ্কার মধ্যে যা সত্য আছে, তা যতটা দূর হবে, জনসাধারণের শক্তিলাভের পথের বাধাও ততটা ভেঙে পড়বে। উদরসর্বস্ব গজমুণ্ডধারী গণদেবের অভ্যুত্থান স্বার্থান্ধ মানুষ ছাড়া অন্য মানুষের কাছেও বিপৎপাত ব'লেই গণ্য হবে। গণদেবতা যেদিন নরদেহ নিয়ে আসবে, সেদিন তার বিজয়যাত্রার পথ কেউ রুখতে পারবে না।

শিক্ষা ও সভ্যতা। আশ্বিন ১৩৩৪ ॥

স্টোভ

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বর্তমান সভ্যতার, বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক হলো স্টোভ। নানা পথ দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এই প্রবন্ধে গোটাকয়েক পথের নির্দেশ থাকবে। সভ্যতার পথগুলি স্বর্গাভিমুখী পথের মতোন বাঁকা ও বন্ধুর কিন্তু সেজন্যে আমি দায়ী নই। অনেক পথই বাঁকাচোরা, ধরা পড়েছে শুধু সারপেনটাইন লেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে বাঁকের মুখের চিহ্নগুলি সুস্পষ্ট। এখন বর্তমান সভ্যতা বলতে আমরা রুশিয়ার ইতিহাস এবং স্ত্রী-পুরুষের নতুন সামাজিক সম্বন্ধ বুঝি। স্টোভের সঙ্গে একাধারে রুশিয়ার ও অন্যধারে স্ত্রী-পুরুষের নতুন সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। এই দুমুখো যোগাযোগ দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য। ছোটো কাজের মধ্যেই যেমন মানুষের চরিত্র ফুটে উঠে, তেমনি ছোট্ট একটি যন্ত্রে কিংবা অনুষ্ঠানের মধ্যে সভ্যতার রূপ মূর্ত হয়। ছোটোকেও শ্রদ্ধা করতে হয়, বিজ্ঞানের মারফত আমাদের সে শিক্ষা হয়েছে। নচেৎ পরমাণু ও ব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম এক হতো না।

প্রথমে রুশিয়ার কথাই ধরা যাক। রুশিয়া আমাদের চা কেনে, অত বড়ো খরিদ্দারকে আমাদের ভালোবাসতেই হয়। রুশিয়াকে ভারত-সরকার বরাবরই ভয় ক'রে এসেছে, তাই রুশ-প্রীতি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। আধুনিক বাংলা সাহিত্য রুশ-সাহিত্যের কাছে ঋণী। আমি নিজে জানি রবীন্দ্রনাথ তুর্গেনিভ ভালো ক'রে পড়েছেন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন এ তথ্যটি লক্ষ্য করেছেন দেখে অনেক তরুণ সাহিত্যিক আশ্বস্ত হয়েছেন। আমার যুবা বয়স থেকে 'সেন ব্রাদার্স' পুস্তক বিক্রেতার দৌলতে বাঙালী যুবক সম্প্রদায় তুর্গেনিভ, টলষ্টয়, গোগল, পুশকিন, গর্কীর অনুবাদ পড়তে সুরু করে। (তারপর আমাদের সাহিত্যের নরুইজীয়ান যুগ আসে।) সত্যই

রুশিয়ান নভেল আমাদের ভালো লাগতো। মানুষ, বিশেষতঃ দলিত ও পতিত মানুষের (উভয় লিঙ্গের) প্রতি অমন প্রগাঢ় সহানুভূতি আমাদের অতি সহজেই আচ্ছন্ন করতো। সব সাহিত্যেই সহানুভূতির প্রয়োজন, নচেৎ সাহিত্যই হয় না। ইংরাজী সাহিত্যেও আছে কি ন্তু সেটা এত সংযত এবং এত দেশকাল ও শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে তার সহজ স্ফুরণ সেখানে অসম্ভব। স্কটের রোমাঞ্চ তোলার অদ্ভুত ক্ষমতা, ডিকেন্সের ভাবালুতা ও হাসাবার শক্তি, থ্যাকারের অদ্ভুত লিখনভঙ্গি সে অভাব পূরণ করতে পারতো না। এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল আমাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন ক'রে দিয়েছিলেন। আমরা বাঙালী, চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের অবতার, সাহিত্য আমাদের বৈষ্ণবী, চরিত্র আমাদের ভাবপ্রবণ, চণ্ডীদাসের উক্তিই হলো আমাদের ধর্মের মূলকথা, আমরা এক কথায় humanist, আমাদের দেবতা নর-নারায়ণ, বিবেকানন্দের দেবতা দরিদ্র-নারায়ণ এই নর-নারায়ণের অংশ মাত্র। আমরা দেখলাম যে রুশ সাহিত্যও এই আদর্শ ও এই ধর্মের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। অতএব রুশ-সাহিত্য আমাদের ধাতে ব'সে গেল। আর সমগ্র ভারতবাসীই-ত রুশজাতির মতো পতিত ও দলিত।

এই মানবকতা (কি বিশ্রী কথা!) যে ভাবে রুশ সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছিলো সেটি আমাদের নিতান্তই মনোজ্ঞ। রুশ সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার মধ্যে নিষ্ফলতা, ছটফটানি, অস্বাভাবিকতা ও অসংযম প্রভৃতি দোষগুলি পর্যন্ত যেন আমাদেরই। এবং আমাদের ব'লেই সে-দোষগুলিকে আমরা বড়োই স্নেহ করতাম।

আমরা ভাবতাম—এ-দোষগুলি আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়; এ দোষ সমাজের, রাষ্ট্রের, অতএব দোষমুক্তির প্রতি নিজেদের দায়িত্বের অপেক্ষা পরের দায়িত্বই বেশি। ইতিমধ্যে, পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা যেমন বলেন 'কি করা', করবো আর কি? কথা কইবো, কেবল কথা কইবো। বড়ো বড়ো বিষয়ে কথা কইবো, যেমন আত্মা, স্বদেশ, ভগবান,

স্বাধীনতা, সমাজ, শাসন-তন্ত্র, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, জগতের যাবতীয় সমস্যা। কথা কইবো হ্যামলেটের মতোন, কিংবা তাঁর রুশিয়ান বংশধর আইভানফ, রাজারফ, নেলুডফ, লেভিনের মতোন। অর্থাৎ সবই হবে প্রাণের কথা, ফরাসীরা যেভাবে কথা কয় সেভাবে নয়; কথা কইবার জন্য নয়, সবই সমস্যা নিরাকরণের জন্য। তবে সমস্যা যে কালে গুরুগম্ভীর, ভাষাও তখন হবে অস্পষ্ট, point of view-ও হবে হ্যামলেটের মতোন subjective। এই হ্যামলেটিয়ানার রুশিয়ান সংস্করণই হলো, বিনয় সরকারের ভাষায়, নয়া বাংলার অর্থাৎ ১৯০৫ সালের পরের যুগের বাংলার গোড়াপত্তন।

কিন্তু সামাজিক ইতিহাসের মূল কথাটি বাদ পড়লো। সেটি হলো, কথার সঙ্গে চা পান, অনর্গল কথার সঙ্গে অনর্গল চা পান। সেই সঙ্গে সিগারেট। এই সময় অলিতে গলিতে চা-এর দোকান খোলা হয়; সকালে বিকেলে আড্ডা, বাজে আড্ডা নয়, সে আড্ডায় যেসব বিষয় আলোচনা হতো সে বিষয় এখন 'পরিচয়ে'র বৈঠকেও রোজ আলোচিত হয় না। এই চা-ই হল আমাদের সেই যুগের প্রধান খাদ্য। ঠিক যেমন রুশিয়ানদের, রুশ নায়ক-নায়িকাদের ছিলো। রুশদের ছিলো 'সামোভার', আমাদের ছিলো খোলা উনুন। সামোভারের হিস্ হিস্ শব্দ সাহিত্যের বস্তু, আমাদের ছিলো ঐ শব্দের অভাব। খোলা উনুনের ধোঁয়া নিয়ে সাহিত্য হয় না। একটা শব্দের অভাব আমরা বড়োই অনুভব করতাম। গুড়গুড়ি আমরা পরিত্যাগ করে-ছিলাম, চায়ের পেয়ালাতে আর কতটুকু কবিত্ব সম্ভব! জোর জাপানী কবিতা! আজ স্টোভের দৌলতে শব্দের অভাব পূরণ হয়েছে ব'লেই আমরা কম্যুনিজ্‌ম্ পর্যন্ত গলাধঃকরণ করতে প্রস্তুত হয়েছি। গত পঁচিশ বছরের বাংলা তথা ভারতের যৌবনের ইতিহাস হলো দেশাত্ম-বোধ থেকে কম্যুনিজমে পরিণতি। সেই পরিণতির চিহ্ন হলো খোলা উনুনের পরিবর্তে স্টোভের প্রসার। একজন চক্ষুষ্মান বিদেশী পর্যটক নব্য রুশিয়ান সমাজ সম্বন্ধে লিখেছেন,—"রুশিয়ায় আজ তিনটে

জিনিসের প্রচার দেখে বোঝা যায় যে রুশিয়ানরা একদম বদ্‌লে গিয়েছে। প্রত্যেক বাড়ীতে স্টোভ, প্রত্যেক যুবক-যুবতীর হাতে attache case কিংবা wallet, প্রত্যেক সহরবাসীর মুখে পাইপ ও গ্রামবাসীর মুখে সূর্যমুখীর বিচি।" আমাদের দেশে স্টোভ এসেছে, যদিও silencer আসেনি, attache case-ও আসছে, ফাউনটেন পেন ও বিড়ি এসে গিয়েছে। বাকিটা আসতে কত দেরি পাঠক নিজেই বুঝবেন। "ভারত তবু কই"-এর উত্তর বোধহয় এত দিনে মিললো। রুশিয়ার মতোন এই গ্রাম-প্রধান পঞ্চায়েৎ-শাসিত নিরক্ষর, ধর্মপ্রাণ, কুসংস্করাচ্ছন্ন নিপীড়িত দেশের সুদিন এসেছে—শপথ ক'রে বলতে পারি—নচেৎ স্টোভ আসতো না। ওধারে রুশিয়া, এধারে ভারতবর্ষ, দুই মহাদেশ মিলে হবে নতুন জগত। তখন লীগ অব নেশনস নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। স্টোভের পাশে বসে গা ঘামলেই world state আপনা থেকে তৈরি হবে। ওয়েলস্ সাহেব এই স্টোভের নামে এক মহাকাব্য লিখতে পারতেন, যদি না তিনি হতেন—'what a bourgeois !'

এতটা যা লিখলাম তা হলো খাঁটি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস; অর্থাৎ পাকা ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত সাবধানী সিদ্ধান্ত। ভবিষ্যৎ বাণীটুকু রুশিয়ান আদর্শবাদ ও হিন্দুর দিব্যদর্শনের সংমিশ্রণ। স্টোভের মূল্য নির্ধারণ এইবার করবো। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতবর্ষের বর্তমান সভ্যতার স্টোভটি স্বাস্থ্যের চিহ্ন, না রোগের চিহ্ন? যদি স্বাস্থ্যের চিহ্ন হয়, তা হলে স্টোভ কিনবো, দেশের লোককে কেনাবো, যদি অস্বাস্থ্যের চিহ্ন হয় তাহলে ট্যারিফ বোর্ডের কাছে ভিক্ষা চাইবো, দেশী স্টোভ-ব্যবসা রক্ষা করতে। তাহলে স্টোভটা অহিন্দু যন্ত্র ব'লতে হিন্দুসভাকে বাধ্য করবো। অন্যান্য উপায়ও আছে। এক চটকায় দেখতে গেলে মনে হয় যে স্টোভ আমাদের অনেক উপকার করেছে—বিশেষতঃ পুরুষজাতির। বাড়ির মেয়েদের আর রান্নাঘরে যেতে হয় না, তাঁদের শাড়িতে ধোঁয়ার গন্ধ থাকে না, ড্রয়িংরুমে একই শাড়িতে আসতে

পারেন, এতে গৃহকর্তার ও তাঁর বন্ধুদের সৌন্দর্যজ্ঞান অটুট থাকে, পয়সার সাশ্রয় হয়, বাড়িরও লক্ষ্মীশ্রী থাকে।

স্টোভ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হবার জন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ মধুরতর হ'য়ে উঠেছে। পূর্বে ছিল অন্দর-মহলের একপ্রান্তে রান্নাঘর এবং সে ঘর নিতান্তই অপরিচ্ছন্ন। রান্নাবান্নার জন্য যতটা সময় লাগতো যত শ্রম খরচ হতো তার অনুপাতে কাজ হয়তো ততটা পরিপাটি হতো না। ফলে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ দুর্লভ হতো, যখন সাক্ষাৎ হতো তখন পট্টবস্ত্রের পরিবর্তে বসনের হরিদ্রা-রঞ্জনে বুভুক্ষু হৃদয়ও রঙিয়ে উঠতো না। এখন বিকেলের জলখাবার আধঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়, রান্নাঘরে না গিয়ে ড্রয়িংরুমের পাশেই সে কাজ সম্ভব হয়। Theoretically, বাদামভাজা, পেস্তার বরফী প্রভৃতি (সবগুলির নাম জানবার জন্য মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যের বদলে মণীন্দ্রলালের নভেল পড়তে পাঠিকাবর্গকে অনুরোধ করছি) শৌখিন টুকি-টাকি স্টোভেতেই প্রস্তুত হ'তে পারে। খোলা উনুন আর চিংড়ীর কাটলেট এ দুটো পরস্পর-বিরোধী। সেইজন্য আজকালকার বিধবা শাশুড়ীরা বৌমাদের স্টোভ কিনে দিয়ে হিন্দু পরিবারের শান্তি রক্ষা করেন। ভূদেববাবু যদি আজ সশরীরে জীবিত থাকতেন, তিনি অন্য শরীরে এখনও বর্তমান, তাহলে পারিবারিক প্রবন্ধের নতুন সংস্করণে শাশুড়ীকে বৌমাদের স্টোভ কিনে দিতে এবং বৌমাদের সেই স্টোভে রেঁধে দেবরবৃন্দকে খাওয়াতে বলতেন,—এটি শপথ ক'রে বলতে পারি না, কেননা ভূদেববাবুর আদর্শ পরিবারে স্বামীর বন্ধুদের জন্য চিংড়ী মাছের কাটলেট ক'রে, ফলসা রংএর শাড়ি প'রে, সেই কাটলেট হাতে নিয়ে, মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে ড্রয়িংরুমে আপ্যায়িত করবার সুযোগ মিলতো না। মোদ্দা কথা এই, ভূদেববাবুর আদর্শ পরিবার না মিললেও, আজকালকার আদর্শ পরিবারে সে সুযোগ মেলে। ভগবানকে ধন্যবাদ, এ সুযোগ আমরা পাচ্ছি। স্বামী আজকাল জমিদার নন, স্ত্রীও শুধু প্রজা নন, সম্বন্ধটিও মালেকানা

সম্পত্তির নয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ও সঙ্গ আজকাল বহুবচনে। সেটা কাম্য। যদি তাই হয়, তাহলে স্টোভের গুণগান করতেই হয়। স্টোভ এই ভদ্র যুগের, এই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার যুগের টোটেম; নিদর্শন কিংবা প্রতীকের চেয়েও বেশি।

কিন্তু সত্য ব'লে একটা জিনিস আছে, তার খাতির করতেই হয়। এই সত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিলো আমার মাসিমার বাড়ি, দ্বিতীয়বার মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে, ঠিক হাসপাতালে নয়, মর্গে (Morgue) এ দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মাসিমার বাড়ি সাহিত্য সভা। রস, রূপ ও ভাবের আলোচনায় সুহৃদবৃন্দের খিদে বেড়ে গেল, একজন মুখ ফুটে ব'লেই ফেললেন, 'একটু চা হলে চলে না?' মেসোমশায় ব্যস্ত হ'য়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি ভিতরে গিয়ে দেখলাম, পাশের ঘরের দরজা বন্ধ, পাখা বন্ধ, মেঝের ওপর বসে বৌদি। সামনে স্টোভ। হিস্ হিস্ শব্দ হচ্ছে, অথচ নীল আলো নেই। বৌদি একটু রেগে পাম্প করতেই হঠাৎ এক ঝলক আগুন প্রায় হাত তিনেক উঁচুতে লাফিয়ে উঠলো। বৌদি বল্লেন—রতনের কাণ্ড, কেরোসিন তেল কেনা থেকে এক পয়সা লাভ করতে জল মিশিয়েছে। বৌদি আজকালকার মেয়ে, ছাড়বার পাত্র নন, তিনি মুখ খুলতেও জানেন, খোলাতেও জানেন। তাই মাথার কাঁটা দিয়ে স্টোভের মুখ পরিষ্কার ক'রে আবার নিজ কার্যে মনোনিবেশ করলেন। স্ত্রীজাতিকে নিরস্ত করবার অক্ষমতা সম্বন্ধে পুরুষজনোচিত অভিজ্ঞতা আমার ছিলো। বাইরে এসে মেসোমশায়ের দিকে কাতর নয়নে চাইলাম। মেসোমশায় লোহার ব্যবসায়ে বড়োলোক হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সব বুঝে আমাকে সাহিত্যালোচনা চালাতে ইঙ্গিত ক'রে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমিও কথা চালালাম, দেশের ভবিষ্যৎ কি করে উজ্জ্বল হবে যদি বর্তমান সাহিত্যের ধুরন্ধরগণ এক স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন? এই ছিলো আমার প্রশ্ন। সবের মুখে উত্তর না শুনতে শুনতেই রতন খাবার নিয়ে এলো—লুচি,

হালুয়া, আলুর দম। সভাভঙ্গের পর বাড়ির ভেতরে গিয়ে শুনলাম বৌদি স্নানের ঘরে, এবং দেখলাম মাসিমা রান্নাঘরের দরজায়। ব্যাপারটা বুঝলাম। বৌদির দেরি দেখে মাসিমা নিজে উনুন জ্বালিয়ে, লুচি, হালুয়া, আলুর দম বানিয়ে পাঠিয়েছেন। সেই থেকেই আমি মহাত্মাজীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাবান হয়েছি। গরুর গাড়ি একটা নতুন মোটর টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে আগে তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা হয়েছিলো, সেটি ক্ষণস্থায়ী, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে তার কিছু পূর্বে। তখন স্নেহলতা দেবীর মৃত্যুর দৃষ্টান্তে সামাজিক কল্যাণসাধনের গতিতে একটু ভাটা পড়েছে। নতুন ঝড় ও ফ্যাসান উঠবার পূর্বে একটা lull আসে। বাঙালী সমাজ তখন মন্দমধুর হাওয়ায় উল্টা বইছে। এমন যুগের এক অশুভ মুহূর্তে তলব এলো—হাঁসপাতালে যেতে হবে। ব্যাপার কী? বন্ধুর স্ত্রী স্টোভের আগুনে শাড়ি ধরিয়ে ফেলেছেন, তার সোনার অঙ্গ ঝলসে গিয়েছে। ছুটতে হলো হাঁসপাতালে। বীভৎস দৃশ্য! ঘণ্টাখানেক পরে তিনি মারা গেলেন, নার্সের হাতে মাথা রেখে। নার্স ছিলেন ইঙ্গবঙ্গ সমাজের, তাই হিন্দু স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে দেন নি। তারপর আমরা শব নিয়ে যেতে চাইলুম। পেলাম না। শব থাকল মর্গে, পরের দিন করোনার্স কোর্ট, তার পরের দিন বন্ধু বেকসুর খালাস পেলেন, লাসও খালাস হলো। সে কি দুর্গন্ধ! চার শিশি ইয়ুকালিপটাসেও সে গন্ধ দূর হয় নি। এখনও আমার সে গন্ধ নাকে আসে। আর মনে পড়ে বন্ধুর একটা ছোট্ট চিঠির কয়েক ছত্র। "আমি ভাই তাকে শুধু ঠাট্টা করেছিলাম। অফিস যাবার সময় সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো হাতে দুটি পান নিয়ে। আমার কি কুবুদ্ধি হলো, আমি বল্লাম—যাত্রার সময় কটা চোখ দেখতে নেই।" এ চিঠিটার কথা করোনার জানতেন না। তাঁর রায় ছিল—স্টোভের দুর্ঘটনায় মৃত্যু। এই official version-টাই নেওয়া যাক। আমার বক্তব্য হচ্ছে স্টোভে দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে। লাভের মধ্যে এইটুকু, স্বামীদের জেলখানা

যেতে হয় না। কিন্তু দেশবাসীর জেলভীতি আরো কমে গেলে এ লাভটুকুর মূল্য আরো কমে যাবে ভয় হয়।

তা হ'লেই হলো—স্টোভ সামাজিক আদর্শের টোটেম, প্রতীক ও কষ্টিপাথর। যিনি মহাত্মাজীর আদর্শ গ্রহণ করেন, যিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার, অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে সহজ সম্বন্ধ-স্থাপনের বিপক্ষে, অর্থাৎ যিনি স্ত্রীদের রান্নাঘরের খোলা উনুনের কাছে বসিয়ে রাখতে চান, তিনিই স্টোভের শত্রু। বিপরীত দিক থেকে বলা যায়, যিনি যন্ত্র-সভ্যতা তথা কম্যুনিজমে বিশ্বাসী তিনিই স্টোভের স্বপক্ষে। খোলা উনুনের কয়লার ধোঁয়ায় মৃত্যু এবং স্টোভ ফেটে মৃত্যু মেয়েদের পক্ষে উভয় সভ্যতাতেই সম্ভব। পার্থক্য শুধু এই, একপ্রকার মৃত্যু ধীরে ধীরে, স্বাস্থ্য হারিয়ে, অনেকটা অন্তরীণ-বাসীদের মৃত্যুর মতোন; অন্যপ্রকার মৃত্যু আকস্মিক, স্বাস্থ্য বজায় রেখে, অনেকটা জালানওয়ালাতে গুলির আঘাতে মৃত্যুর মতোন। একটি দেওয়ানী, অন্যটি ফৌজদারী। অতএব স্টোভ সুস্থ সভ্যতার চিহ্ন হ'লেও মরণের কারণ হ'তে তার বাধে না। শুধু তাই নয়, যিনি নিয়তিকে বিশ্বাস করেন, যেমন হিন্দু ও অহিন্দু মার্কসিষ্ট, হাসিমুখে যিনি বলতে পারেন accidents will happen in best regulated families, কিংবা গম্ভীর মুখে বলতে পারেন the proletariat shall win, তিনিই স্টোভের মিত্র। গীতার কর্মবাদের সঙ্গে এবং হেগেলীয়ান মতবাদের সঙ্গে এইখানেই স্টোভতত্ত্বের সংযোগ। বাঙালী 'নয়া-হিন্দু' পাঠকের কাছে স্টোভের স্বপক্ষে এর বেশি বলবার আর কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

'উত্তরা'। আষাঢ় ১৩৪০ ॥

খিচুড়ি

জ্যোতির্ময় ঘোষ

বাংলা ভাষায় গণিত ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তক রচনার যে চেষ্টা ও উদ্যোগ হইতেছে তৎসম্বন্ধে জনৈক বন্ধুর সহিত আলোচনাকালে তিনি বলেন, "দেখুন, হয় ইংরাজী রাখুন, না হয় বাংলা করুন, একটা খিচুড়ি করিবেন না"। গণিত ও বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পরিভাষা সংকলন ও পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে যে সকল প্রশ্ন, সমস্যা ও মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য নহে।' শুধু উপরোক্ত বন্ধুবরের উক্তি সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলিব।

ডাল ও ভাত রান্না আমরা আগে শিখিয়াছি, পরে খিচুড়ি রাঁধিতে শিখিয়াছি, ইহা বোধহয় ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং খিচুড়ি ডাল ও ভাতের উন্নত সংস্করণ হওয়াই সম্ভব। তা ছাড়া ব্যঞ্জনাদির অভাবে অগত্যাই যে আমরা খিচুড়ির ব্যবস্থা করি তাহা নহে, যখন কোনো কারণে শরীর ও মন উৎফুল্ল ও পুলকিত হয়, তখন আমরা মেসের ঠাকুরকে বা বাড়ির গৃহিণীকে খিচুড়ির অর্ডার দিয়া থাকি। সুতরাং খিচুড়ি যে ডাল ও ভাত হইতে অপকৃষ্ট পদার্থ, তাহা মনে করিবার হেতু নাই। বরং এই খিচুড়ির যে সকল বিভিন্ন রন্ধনরীতি উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং ইহাকে অধিকতর উপভোগ্য করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, ডাল ও ভাতের বেলায় তাহা হয় নাই। অতএব আমাদের রন্ধনশালায় খিচুড়ির স্থান ডাল ও ভাত অপেক্ষা উচ্চেই থাকিবে।

আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেও ক্রমাগত আমরা খিচুড়ির দিকেই চলিয়াছি, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। আমরা যে পোষাক পরি, তাহা বাঙালী, পারশী, পাঞ্জাবী, ভারতীয় ও অভারতীয় পোষাকের খিচুড়ি। আমরা সকালে উঠিয়া গুড় দিয়া বিস্কুট এবং জ্যাম দিয়া আটার রুটি খাইয়া থাকি। ঝাল চচ্চড়ি ও অম্বলে আমাদের যেরূপ তৃপ্তি হয়, চপ

কাটলেট ও কোর্মা কোপ্তাতে তাহা অপেক্ষা কম হয় না। আমাদের আহারের তালিকা দেশীয় ও বৈদেশিক রীতির সংমিশ্রণে ক্রমশঃ কিরূপ খিচুড়ি পাকাইতেছে, তাহার বেশী দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক এবং এই সংমিশ্রণে যে শুধু অপকারই হইতেছে তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। অপকারই হউক আর উপকারই হউক, সংমিশ্রণ যে অনিবার্য তৎসম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নাই।

পরিবারের মধ্যে বিধবা মাসিমা নিরামিষাশিনী এবং উপবাস-পূজা-পার্বনাদিনিরতা; বৃদ্ধ জ্যেঠামহাশয় আফিমের নেশায় ভরপূর; ছোটোমামা ডাম্বেল ও মুগুর ভাঁজেন; পিসেমসাই ইজি-চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে নারাজ; খুকী পেঁয়াজের গন্ধে বমি করে; খোকা পেঁয়াজের ফুলুরি পাইলে ডবল ভাত খায়; কর্তা মুরগি ভালবাসেন, গৃহিণী মুরগি স্পর্শ করেন না; ইত্যাদি নানাপ্রকার রুচির এবং অভ্যাসের খিচুড়ি এক বাড়িতেই দেখিতে পাই। ইহা অনিবার্য।

একই পরিবারের মধ্যে কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ পৌত্তলিক, কেহ নিরাকারবাদী, কেহ কোনো বাদীই নহে, এরূপ দৃষ্টান্ত সর্বত্র। এইরূপ মতবাদের খিচুড়ি হইবেই। শুধু তাহাই নহে, একই ব্যক্তির জীবনে একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদের খিচুড়ি বিরল নহে। মাছ খান, মাংস খান না; কালী পূজা করেন, বলিদান করেন না; পৈতা আছে, টিকি নাই; টিকি আছে, পৈতা নাই; সন্ধ্যা আহ্নিক করেন, জুয়াচুরিও করেন; সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না, জুয়াচুরিও করেন না; ইত্যাদি নানাপ্রকারের মনোভাবের খিচুড়ি সর্বত্র।

আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে কি দেখিতে পাই? তাহাদের জীবনও আমাদেরই মতো খিচুড়ি নয় কি? বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কার্য, বিভিন্ন ব্যবসায় বিভিন্ন আচার ব্যবহার অনুসরণ তো করিতেছেই। একই ব্যক্তির জীবনও নানা আপোত-বিরোধী কার্য ও ভাবসমূহের বোঝা নিত্য বহিতেছে। একই ব্যক্তি বাস-কণ্ডাক্টর, ঘটক, বাড়ি ও জমির দালাল এবং জ্যোতিষী; এক ব্যক্তি সকালে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার,

দুপুরে কেরানী এবং বৈকালে ইন্‌সিওরেন্স এজেন্ট ; প্রবীণ অধ্যাপকেরাও হয়তো বিচক্ষণ শেয়ার ব্যবসায়ী ; ঠাকুর মহাশয় রন্ধনাদি করেন, সুযোগ পাইলে পূজার্চনাও করেন ; এইরূপ বিভিন্ন মত ও কার্যের সমন্বয় বা খিচুড়ি অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে সমাজের যে অপকারই হইতেছে, ইহা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

আমাদের আসবাব দেশী ও বিলাতীর খিচুড়ি। ফরাস ও তাকিয়ার পাশে অনেক স্থলেই আজকাল সোফা ও চেয়ার শোভা পায়। তক্তাপোশের পাশে ড্রেসিং টেব্‌ল অনেক বাড়িতেই পাওয়া যাইবে। সাবান দিয়া হাতে মাটি এবং টুথপেষ্ট দিয়া দাঁতের মাজন আমরা অনেকেই করি। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত আমাদের জীবনের আশে-পাশে যে খিচুড়িরই স্তূপ বিরাজমান, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন ?

আমরা যাহাকে উন্নতি বলিয়া থাকি, তাহা কি খিচুড়িরই নামান্তর নয় ? নৌকা ও ষ্টিম এঞ্জিনের খিচুড়িকেই আমরা ষ্টিমার বলিয়া থাকি। মোটরকার এবং নৌকার খিচুড়িকে মোটরলঞ্চ বলে। আবার মোটরলঞ্চ এবং এরোপ্লেনের খিচুড়ি হাইড্রোপ্লেন। ফটোগ্রাফ এবং গ্রামোফোনের খিচুড়ি টকি-সিনেমা। ফটোগ্রাফী আবার রসায়ন, পদার্থবিদ্যা এবং গণিতের খিচুড়ি ম্যাগনেট ও চুম্বক ও বিদ্যুতের খিচুড়ি। এক কথায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি মাত্রই এক একটি বিরাট খিচুড়ি।

বহিঃপ্রকৃতিটাই কি খিচুড়ি নয় ? শুভ্র সূর্যরশ্মিটি সাতটি বিভিন্ন রং-এর খিচুড়ি নয় কি ? একটি ফুলের বাগানের দিকে চাহিলে কি অগণিত রং-এর ও রূপের খিচুড়িই চোখে পড়ে না ? ময়ূরপুচ্ছ বহু-বর্ণের খিচুড়ি বলিয়াই এত রমণীয়। ভূপৃষ্ঠটি নদী, পর্বত, অরণ্য, প্রান্তর প্রভৃতির একটি বিশাল খিচুড়ি বলিয়াই এত উপভোগ্য। নির্মল, স্বচ্ছ, স্বাদহীন, গন্ধহীন, বর্ণহীন জলকণাটিও হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের খিচুড়ি।

মানুষের ভিতরে-বাহিরে আশে-পাশে সর্বত্রই যখন খিচুড়িরই রাজত্ব তখন শুধু তাহার ভাষা সম্বন্ধে একটা অনির্দেশ্য পবিত্রতার প্রতি এত

মোহ কেন? মানুষের ভাষা খিচুড়ি হইতে বাধ্য—অতীতে হইয়াছে, বর্তমানে হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এ স্রোত রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। টেবিল, চেয়ার, স্ক্রু, মোটরকার, রেডিও, টেলিগ্রাম, পোষ্টঅফিস প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ বাংলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে এবং ক্রমাগত যাইতেছে। সেদিন একটি মিস্ত্রী বাসায় কাজ করিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল সে আলমারি প্রস্তুত করিতে পারে কি না। সে উত্তর দিল, "আজ্ঞে ওসব ফাইন কাজ আমরা করি না।" সেদিন একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, "Smooth মানে কি?" আমি বলিলাম, "Smooth মানে—মানে—মসৃণ—মানে সমান, যাতে উঁচু নীচু নেই।" ছেলেটি বলিয়া উঠিল, "ও বুঝেছি, প্লে—ন।" এরূপ হইবেই। ইহার উপায় নাই। এজন্য কোনোরূপ দুঃখ করিলে চলিবে না। পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে 'জল মোটর' ও 'ডাঙা মোটর' জলেস্থলে এবং লোকমুখে নিয়মিত চলিতেছে। ইহার জন্য কোন পরিভাষা সমিতির আবশ্যক হয় নাই। 'মাস্টার' শব্দটি ইংরাজী হইলেও 'মাস্টারনী'কে ত্যাগ করা সহজ হইবে না। এরূপ খিচুড়িতে বিরক্ত হইলে জীবন দুর্বহ হইবে। বাংলা পরিভাষার অভাব সত্ত্বেও সেমিজ, ব্লাউজ, পেটিকোট, বডিস, ব্রেস্‌লেট, সেপটি-পিন প্রভৃতি বাঙালী তরুণীর রমণীয়তা বৃদ্ধিই করিতেছে। 'গ্রামোফোন' কথাটা বিদেশী হইলেও উহার গান আমাদের ভালোই লাগে। সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ 'রেডিও'ই বা মন্দ কি? 'টেলিফোন' সকলের বাড়িতে না থাকিলেও 'টেলিগ্রাম' সব বাড়িতেই আসে। অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত অ্যাসিডিটি পূর্ণ ও অজীর্ণান্তক পাউডারে যদি অসুখ সারে, তাহা হইলে ঔষধের নামে কি আসে যায়? দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। ঘরে বাহিরে সর্বত্রই খিচুড়ি ভাষা চলিতেছে।

যদি কেহ বলে, "এলগিন রোডের মোড়ে ট্রামে উঠিয়া কণ্ডাক্টরের নিকট টিকেট লইয়া সামনের সীটে গিয়া বসিতেই ট্রামখানি লোয়ার সারকুলার রোডের জংশনে আসিয়া পড়িল এবং পূর্ব দিক হইতে আগত

একখানি ট্যাক্সির সঙ্গে ভীষণ কলিশন হইল। একটি তরুণীকে আহত অবস্থায় ট্রাম লাইনের উপর ছিট্‌কাইয়া পড়িতে দেখিয়াই আমি ট্রাম হইতে নামিয়া একখানি ট্যাক্সি করিয়া তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে লইয়া গেলাম এবং অনেক কষ্টে ওখানকার সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ইনডোর পেসেণ্ট ভাবে অ্যাডমিট করাইলাম। হোস্টেলে ফিরিয়া দেখি সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট রোল কলের সময়ে আমাকে অ্যাবসেণ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। পরদিন হইতে ভিজিটিং আওয়ার্সে নিয়মিত তরুণীটিকে দেখিতে যাইতাম। অসুখ সারিয়া আসিলে তিনি তাঁহার বাসার ঠিকানা দিয়া আমাকে চা খাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে ক্রমশঃ তরুণীটির সহিত ইত্যাদি," তাহা হইলে তাহাকে চালিয়াৎ বা মিথ্যাবাদী বলিতে পারেন, কিন্তু তাহার ভাষা যে অস্বাভাবিক তাহা বলা চলে না, বিশুদ্ধ বাংলায় উক্ত কথাগুলি বলা যে একেবারে অসম্ভব তাহা বলিতেছি না, কিন্তু তাহা করিলে বড়বাজার হইতে হাওড়া স্টেশনে যাইবার সময়ে বিদেশীয় ইঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্রপাতি দ্বারা নির্মিত হাওড়ার পুলের উপর দিয়া না গিয়া স্বদেশীয়গণ কর্তৃক বাহিত ডিঙিতে অথবা পবিত্র গঙ্গাজলে সাঁতার কাটিয়া নদীপার হইবার মতোই হইবে।

সাহিত্যে উক্তরূপ খিচুড়ি ভাষার সমর্থন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্যের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা আবশ্যক এবং তাহার ভার কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক এবং অন্যান্য সাহিত্যিকগণ লইবেন।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কার্য ও ভাবের খিচুড়ি হইলেই যে তাহা শুভ ও শ্রেয় হইবে, ইহাও আমার বক্তব্য নহে। মাংসের সহিত পরমান্নের খিচুড়ি সুস্বাদু হইতে পারে না। ইউরোপীয় জাতির সহিত ভারতীয় জাতির মিশ্রণে যে ওয়েলেসলি সমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহা শুভ হইয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করেন না, তবে খিচুড়ি হইলেই যে তাহা অপকৃষ্ট হইবে তাহা ঠিক নহে, ইহাই আমার বক্তব্য।

সাহিত্যিকগণ যতই চেষ্টা করুন, বিদেশী শব্দ ক্রমাগত বাংলার সহিত মিশিতে থাকিবে। তৎসত্ত্বেও যথাসম্ভব ভাষার পবিত্রতা রক্ষা

করা তাঁহাদের একান্ত কর্তব্য। নতুবা বাঙালীর দেশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার হানি হইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের পক্ষে খিচুড়িই প্রশস্ত। যাহাতে সেই খিচুড়ি সুপক্ক ও সুস্বাদু হয় এবং তলায় ধরিয়া গিয়া দুর্গন্ধ না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

লেখা। ১৯৪০॥

বিজ্ঞাপন

পরিমল গোস্বামী

খবরের কাগজে খবর থাকে, বিজ্ঞাপনও থাকে। কিন্তু এমন লোকের কথা শোনা যায়, যিনি খবর পড়েন না শুধু বিজ্ঞাপন পড়েন। তাঁর কৈফিয়ৎ হচ্ছে খবর রোজ একই থাকে। ঘটনা যা ঘটে, প্রতিদিন সব একই ঘটে, শুধু যাদের নিয়ে ঘটে, তাদের নাম থাকে আলাদা। পঁচিশ বছর আগে ভজহরি ট্রেনে কাটা পড়েছিলো। আজও সেই ট্রেনে কাটার খবর, নামটা শুধু ভজহরি নয়, কেষ্টহরি। প্রত্যেক দিন নাম বদলে বদলে ঐ একই খবর তাঁর পড়তে ভালো লাগে না। তাই তিনি বিজ্ঞাপন পড়েন। তা ছাড়া খবরের একটা চেহারা প্রায় ঠিক হ'য়ে গেছে। তা থেকে দেশকে ঠিক চেনা যায় না। দেশের নাড়ির খবর তাতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় বিজ্ঞাপনে।

সাহিত্য যদি জীবনের প্রতিবিম্ব হয়, তা হলে একমাত্র বিজ্ঞাপনই সেই সাহিত্য যাতে সমাজ-জীবনের সম্পূর্ণ ছবিখানি দেখা যায়। অনেকেরই এই মত। একজন বলেন—ধরো না কেন, এই সোনার বাজারের বিজ্ঞাপন দেখে আমি ছুনিয়া কোন পথে চলেছে তা বুঝতে পারি। যখন দেখি সোনার দর চ'ড়ে যাচ্ছে তখন বুঝি যুদ্ধ এগিয়ে আসছে। সোনার দর কমলেই বুঝি যুদ্ধের ভয় আপাততঃ কমে গেল।

কিন্তু এ-তো গেল ছুনিয়ার মতিগতি। দেশকেও জানতে পারি বিজ্ঞাপন প'ড়ে। পঁচিশ বছর আগের একটি বিজ্ঞাপন আজও আমি ভুলতে পারিনি। তাতে ছিলো একজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক চাই—যিনি ইংরেজী, বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস এবং ভুগোল এই পাঁচটি বিষয়ে স্ট্রং। বেতন পঁচিশ টাকা। পাঁচটি বিষয়ে স্ট্রং বা শক্তিমান হবেন, বি-এ পাশ করবেন এবং পাবেন পঁচিশ টাকা। সমাজের মর্মান্তিক একটি দিকের চেহারা। একটি যুবক পাঁচটি বিষয়ে স্ট্রং হ'য়ে বি-এ পাশ করেছে। কত আশা-আকাঙ্ক্ষা তার ছিলো। স্কুলে পড়বার সময় তার

জীবনের লক্ষ্য কি তা নিয়ে নিশ্চয় সে রচনা লিখেছে, সে বড়ো একটা কিছু হবে। জজ ম্যাজিস্ট্রেট বা ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হবে বা ঐ রকম চাকরি বা ব্যবসা অবলম্বন করবে। সে-জন্য এতগুলো বিষয়ে সে স্ট্রং হয়েছে। তারপর কি হলো? তার স্বপ্ন ভেঙে গেল। এখন সে কর্মখালির বিজ্ঞাপন প'ড়ে প'ড়ে আবেদন পত্র পাঠাচ্ছে।

তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পঁচিশ টাকা মাসে? মন্দ কি? কিন্তু সে-চাকরিও কি সে পাবে? হয়তো পাবে না। হয়তো যে পাবে সে ছ বিষয়ে স্ট্রং। ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে দেহ। শক্ত পেশী তার সর্বাঙ্গে। সে ছেলেদের শরীর চর্চা করাবে অতিরিক্ত, তাই সে পাবে। তার জানা আছে এ রকম বিজ্ঞাপনে অন্ততঃ পাঁচ-শ আবেদনপত্র আসে। এই নির্দিষ্ট পদটির জন্যও ঐ রকমই হয়েছিলো। তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন। শুধু দরখাস্ত নয়, আবেদনকারীরা সবাই নির্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হয়েছিলো এবং হাতাহাতি পর্যন্ত করেছিলো নিজেদের মধ্যে। হয়তো চাকরিটি জুটেছিলো ছ বিষয়ে স্ট্রং ব্যক্তির ভাগ্যেই।

পঁচিশ বছর আগে শিক্ষকদের বিজ্ঞাপন অনেক বেশি থাকতো। বি-এ পাশের দর পনেরো টাকা পর্যন্ত নেমেছিলো। এখন শিক্ষকদের বিজ্ঞাপন আগের মতো নেই। বেতনও আগের চেয়ে বেশি।

বিয়ের বিজ্ঞাপনও এখন বদলে যাচ্ছে। আগে ঘটকের বিজ্ঞাপন থাকতো বেশি। এখন বিবাহার্থী নিজেই বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বেশি। আগে মোটামুটি একটা পণের অঙ্ক লেখা থাকতো। চাকরির বাজারে যার দাম পঁচিশ টাকা, বিয়ের বাজারে তার দাম পাঁচ হাজার টাকা প্রায় বাঁধা ছিলো। এখন পণের প্রস্তাব অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট থাকে। তার মানে মেয়েদের প্রতি আগে যে একটা কৃপার ভাব ছিলো, সেটা এখন অনেকখানি কেটে গেছে, এখন একটু যেন চক্ষুলজ্জা এসেছে। মেয়েরা শিক্ষিত হওয়াতে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিষয়ে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়াতে বিজ্ঞাপনে এই রকম অপমানকর ভাষা এখন ক্রমেই

কমে আসছে। মেয়েদের দিক থেকেও অনেকখানি উন্নতি দেখা যায়। পঁচিশ বছর আগেও যদি কোনো দেবতা এসে কোনো মেয়েকে বলতেন, মা লক্ষ্মী, আমি বর দিতে এসেছি, কি বর চাও?— তা হলে বিনা দ্বিধায় মা-লক্ষ্মী বলতো: আই-সি-এস বর চাই।

মেয়েদের দৃষ্টিতে এখন বাইরের আকর্ষণ, এমন কি টাকার আকর্ষণও যেন কমে আসছে। এখন মানুষে মানুষে মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। এই পরিচয়ই হয়তো এখন বেশি দামী।

পরিবর্তনশীল সমাজের খাঁটি চেহারা এইভাবে ফুটে ওঠে বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। সমাজের আর একটি স্তরের পরিচয়ও বেশ পাওয়া যায়, এই স্তরে আছে চোরদের দল। চোরদের বিজ্ঞাপনও কাগজে দেখা যাবে নিয়মিত। যেমন, কোনো তেলের সঙ্গে দশ বিশ রকম উপহারের বিজ্ঞাপন। এই উপহারের তালিকায় টয় রিস্ট-ওয়াচ নামক একটি লোভনীয় হাতঘড়ির উল্লেখ থাকে। টয় রিস্ট-ওয়াচ। ইংরেজী অনভিজ্ঞ মনে করে 'টয়' বোধহয় প্রস্তুতকারকের নাম। টয় কথাটি অনেক দিন চলেছিলো বাংলাদেশেই। তারপর যখন সাধারণ লোকেরা বার বার প্রতারিত হ'য়ে 'টয়' মানে খেলনা বুঝতে পারলো, তখন টয়ের বদলে চললো ডামি রিস্ট-ওয়াচ। ডামি মানেও তাই, অর্থাৎ অকেজো, নকল। বেশ কিছুকাল চললো ডামি কথাটা। তারপর প্রতারিতরা ডামি কথাটিরও অর্থ বুঝে ফেললো। তখন ডামি কথাটি অচল হলো এবং তার বদলে এলো মিউট রিস্ট-ওয়াচ। মিউট মানে মূক, নির্বাক। মিউট ঘড়ি মানে যে ঘড়িতে কোনো শব্দ হয় না। টয়ের যুগ গেল, ডামির যুগ গেল, এখন মিউটের যুগ চলছে। চোরের কৃপায় সাধারণ লোকের মধ্যে এই ভাবে ইংরেজী ভাষার প্রসার হচ্ছে অবশ্যই।

এই বিজ্ঞাপন থেকে আরও একটি বিষয় জানা যায়। সেটি হচ্ছে এই যে বাংলার চোর ও ডামি পর্যন্ত এগিয়ে ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। তারপর থেকে অর্থাৎ মিউট শব্দ থেকে এ ব্যবসা গেছে অন্য প্রদেশের

হাতে। এখন মিউট ঘড়ির যত বিজ্ঞাপন দেখা যায় তা সবই বাইরের। এটাই এখন একমাত্র সান্ত্বনা যে, বাঙালী এ ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। আগে কলকাতার চোরেরা মফস্বলের লোকদের ঠকাতো, এখন মফস্বলের চোরেরা কলকাতার লোককে ঠকাচ্ছে।

ভাগ্য-গণনা বা মাতুলির বিজ্ঞাপন থেকেও দেশের চেহারা খুব চমৎকার জানা যায়। যখন দেখা যায় এই জাতীয় বিজ্ঞাপন খুব বেড়ে গেছে, তখন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে লোকের দুর্দশা চরমে উঠেছে। যখন বুদ্ধিতে আর কিছু সে করতে পারে না, দিশেহারা হ'য়ে পড়ে, তখনই তো তার দৈব নির্ভরতা। চিন্তাশক্তি যখন প্রায় লুপ্ত তখন ভাগ্যগণনা ও মাতুলি ভিন্ন গতি নেই।

বিজ্ঞাপনের সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য এত। যত দিন যাবে ততই সমাজ-বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকেরা পুরাতন বিজ্ঞাপন ঘাঁটবেন সমাজ ইতিহাসের মাল-মশলা সংগ্রহ করতে। বিজ্ঞাপন এ বিষয়ে সচেতন, তাই তার সংখ্যাও দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। তাই খবরের কাগজে খবরের চেয়েও বিজ্ঞাপন বেশি হবার দিকে ঝুঁকেছে। শুধু কাগজে নয়, পথে, ঘাটে, গাড়িতে, বাড়িতে, দেয়ালে, গাছে, ল্যাম্প-পোস্টে, সর্বত্র বিজ্ঞাপন। চোখ চাইলেই চোখে পড়বে ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, উপরে, নীচে সব জায়গায় বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন কাগজবাহিত হ'য়ে ঘরে ঢুকছে, দেশলাইয়ের বাক্সবাহিত হ'য়ে পকেটে ঢুকছে। ঘরে বাইরে গোপনতম এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে সে যায়নি এবং প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীর সকল দেশ থেকে বিজ্ঞাপন এদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করছে। এই বিজ্ঞাপন না থাকলে অন্ততঃ শহরের চেহারা বদলে যেতো, খবরের কাগজ কেউ কিনতো কিনা সন্দেহ। শহরের পথে পথে এমন বিচিত্র বিজ্ঞাপন চোখে না প'ড়ে উপায় নেই এবং এই বিজ্ঞাপনের জন্যই পথের দৈর্ঘ্য বেড়ে গেছে একথা বৈজ্ঞানিকরা হিসেব ক'রে বার করেছেন। আগে বিজ্ঞাপনহীন পথের এক মাইল যেতে যত সময় লাগতো, এখন বিজ্ঞাপনশোভিত পথের এক মাইল যেতে

তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে। কেন লাগে তা যে কেউ একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন।

সব বিজ্ঞাপনই আবার নীরব নয়। সন্ধ্যাবেলা দেখা যাবে অনেক ওষুধ বিক্রেতার মুখে বিজ্ঞাপন শব্দায়িত হ'য়ে উঠেছে। রেলগাড়িতে তো সর্বক্ষণ সশব্দ বিজ্ঞাপন রেলযাত্রীর জীবনে বৈচিত্র্য আনছে। ভাগ্যিস শহরের সকল বিজ্ঞাপন শব্দায়িত নয়। কিন্তু যদি হতো, দৈবাৎ সকল বিজ্ঞাপন একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠার ক্ষমতা লাভ করতো, তা হলে সেই দিনই শহর ধ্বংস হয়ে যেতো কিনা কে জানে।

ম্যাজিক লণ্ঠন। শ্রাবণ ১৩৬২ ॥

রেলগাড়ি

নবেন্দু বসু

আমার পরিচিত অনেকেই দেখেছি রেলভ্রমণকে ভয় আর বিরক্তির চোখে দেখেন। তাঁরা যেন সেটা এড়াতে পারলেই বাঁচেন। বোধ হয় রেলে যাওয়ার আনুসঙ্গিক তথাকথিত অসুবিধাগুলোই তাঁদের মনে ভীতি সঞ্চার করে। তল্পিতল্পা, পয়সার থলি, নিজের দেহকে সামলানো, ব'সে ব'সে যাবার বাধ্যতা-মূলক নিষ্ক্রিয়তা, এতগুলি মানবসন্তান বা স্বজাতীয়ের সঙ্গে অতক্ষণ সদ্ভাব রাখা—এতগুলি প্রয়াস একসঙ্গে ধৈর্যের পক্ষে বেশি হয়ে পড়ে। দৈনিক অভ্যাসের ব্যতিক্রম অনেকের পক্ষেই যন্ত্রণাদায়ক হয়। রেলে কেউ নিজস্ব সময়ে জল পান না, কেউ পান পান না, তাতে অসুবিধা বোধ করেন; যদিও এঁদের অনেকেই জীবনের অনেক বৃহত্তর বাধাবিপত্তিকে বেশ ভ্রূক্ষেপ না ক'রেই চলতে পারেন।

দৈনিক নিয়মের ব্যতিক্রম থেকেই কিন্তু আমার কাছে কাজেই হোক আর অকাজেই হোক রেলভ্রমণের মোহ সুরু হয়। সে ব্যতিক্রম আমাকে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করে এমন এক জগতে যা প্রত্যহের দুনিয়ার চেয়ে কতকটা পরিমাণে নতুন। ঐ যে পায়ে-চলা রাস্তার চেয়ে একটু উঁচু দিয়ে গাড়ি যায়। আর তার চেয়ে একটু উঁচুতে গাড়ির আসনে বসে থাকি, তাতে মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন না হ'লেও, কেমন অসংলগ্ন বা আল্‌গা বোধ করি। সেই শিথিল জগতে থেকে যতক্ষণ রেলে চলি, কেবল মাটির সঙ্গে মায়ার বন্ধন সৃষ্টি করতে করতে আর কাটাতে কাটাতে চলি। অনেকক্ষণ নির্জন মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চ'লে কোলাহলময় কোনো ষ্টেশনে এসে থামলো, মাটির ছোঁয়া আবার পেলুম। যাত্রীদল আর বিক্রেতাদের কণ্ঠস্বরে, কাজে, ভঙ্গিতে, রোজের স্থিতির জগতের আস্বাদ আবার ভালো লাগলো। ফল-বিক্রেতা যখন বলে এ সহরে এখন মড়ক হচ্ছে, খাদ্যসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য

আর অগ্নিমূল্য, তখন তাকে প্রতিবেশী বন্ধু ব'লে মনে হয়, যাঁর সঙ্গে সকালে বাজার করতে গিয়ে প্রতিদিন ঐ কথাই হয়। আবার শিশু-কন্যাকে কাঁদতে দেখে একটা কুলি একটু হেসে যদি বলে, 'খুকী কেঁদো না', তাকে মনে হয় নিকট আত্মীয়। আবার গাড়ি উধাও হ'য়ে ফাঁকা মাঠে শূন্যতার মধ্যে বার হ'য়ে যায়। দশ মাইলের মধ্যে ঐ সকল বন্ধুদের মুখ গাড়ির গতিতে গতিতে ঝাপসা হ'য়ে মন থেকে অপসারিত হয়; স্মৃতির ভার নামিয়ে মন আবার ফাঁকা; অন্য ছবি ধরতে আবার উন্মুখ।

গাড়ি তার নির্মমতায় টেনে নিয়ে চলবেই, আর তার মধ্যে তাই কোনো কিছু পাকা অভ্যাস হ'য়ে মনে গেঁথে বসতে পায় না ব'লেই, রেলে যেতে সব কিছু নতুন চোখেই দেখি। বেশির ভাগ মামুলী সাধারণ দৃশ্যই সব দেখি, কিন্তু তাতেই থাকে নতুন অভিজ্ঞতার আভাস, বিস্ময় আর উৎসাহ।

জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে দেখতে যখন গাড়ির ভিতরেই দৃষ্টি ফেরাই, তখনও বাইরের বিক্ষিপ্ত প্রশস্তির মধ্যে থেকে সহসা সংকীর্ণ পরিসরে বদ্ধ হ'য়ে যাওয়ায়, ভাসা ভাসা ব্যাপ্তির চেয়ে সে দৃষ্টির যেন গূঢ় গভীর অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতাই জন্মায়। গাড়ির মধ্যেকার লোকের, জিনিসের, খুঁটিনাটিও তাই যেন স্পষ্টতর, পূর্ণতররূপে দেখি। দেহে গতিরোধ আর চিন্তারাজ্যে সে সময়ে জড়তা না থাকলেও কেমন অখণ্ড অবসরের অলস মন্থরতা। এই বিরোধী গতিবেগের চেতনা-সংঘাতে কল্পনা বুঝি পরতে পরতে দল মেলতে থাকে।

গাড়ির ভিতরেই কি, আর বাইরেই কি, ক্ষণিকের জন্যে দেখি ব'লে আশু বিচ্ছেদের শঙ্কিত আগ্রহে দেখি। তীব্র অনুরাগের ব্যগ্র দৃষ্টিতে দেখি। এমনই স্পর্শলোভী মনে চলন্ত গাড়ির মধ্যে থেকে দেখেছি রাজপুতনার সীমান্তে গ্রীষ্মের রূঢ় আলোয় জ্বলন্ত দুপুরে বাবলাগাছের সারিতে বাবুই পাখির বাসা; তৃণ-বিরল ধূসর মাঠে ছাগলের পাল; অলস রোমন্থনরত এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত গরু মহিষ। শীতকালে

যুক্তপ্রদেশে খালের জলে সেচন করা হল্‌দে ফুলে ভরা সর্ষেক্ষেতের মধ্যে দেহের অর্ধেক ডুবিয়ে গাড়ির শব্দে ত্রস্ত চাউনিতে তাকিয়ে থাকে সারস পাখি। ঝিরঝিরে বর্ষায়, পাতলা মেঘে ঢাকা চাপা আলোর দিনে কোমরে কাপড় এঁটে মাঠে নারী জলে পা ডুবিয়ে ধানের চারা বসায়—বাংলা থেকে দূরে কোথাও—গোণ্ডিয়া বা ডোঙরগড়ে—নীচু নীচু পাহাড়ের কাঁকুরে দেশে। মানভূমের লাল মাটির প্রান্তরের ওপারে রক্তরাঙা সূর্যাস্ত হয় কোডারমায়। নানা রঙের পাগড়ি মাথায় টালি আর অভ্রব্যবসায়ী মাড়ওয়াড়ীরা গাড়ি থেকে নেমে খালাসীদের কাছে বালতি থেকে জল নেয়। ঝিঁঝি-ডাকা সন্ধ্যায় তাঞ্জোরের পথে ছায়াঘন কলাবাগানের পাশ দিয়ে আহিরিণী চ'লে যায় দুধের পাত্র মাথায় নিয়ে লীলাঞ্চিত গতিতে। অন্ধকার ঘন কালো রাত হয় সাসারামের কাছে। ওদিকের ঝাঁকুনিতে হালকা ঘুম সহজে ভাঙে। গাড়ির চাকার ঘর্ঘর থেমে যাওয়ার নীরবতা আর গভীর রাতের জমাট আঁধার ভেদ ক'রে খালাসীর কণ্ঠ ষ্টেশনের নাম হেঁকে যায়—'জাখিম'। হিমরাতের ঘনতা যেন শাণিত তলোয়ার দিয়ে কাটে। মোটা কম্বলে ঢাকা লোকটা চাপা খট্‌খট পায়ের শব্দে কাচ-আটা গাড়ির জানলার পাশ দিয়ে চ'লে যায়। সে জানতে পারে না যে আমি বাইরের দিকে চেয়ে আছি। তার মিটমিটে লণ্ঠনের আলো ক্রমশঃ দূরে চ'লে যায়। পয়েন্টসম্যানকে ডাক দিয়ে নাইট-ডিউটীর বাবু কি যেন বলেন। ঐটুকু শব্দ, ঐটুকু হাঁকডাক, পরিপূর্ণ নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে কেমন যেন অপার্থিব, অস্বাভাবিক, চকিত চঞ্চলতা। আবার যখন গাড়ি মাঠে বেরিয়ে নির্জন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে, তখনই যেন আবার সবরকমে সংগতি আসে। আবারও হালকা ঘুমের দোলায় চেতনা বিলুপ্ত হয়। সুদূর ভিল্লুপুরম জংশনে শেষ রাত্রি; জনতায়, কলরবে, আলোকমালায় প্রথম রাতের মতোন; প্রায় দিনদুপুরের মতোন কারবার। আর ঘুমের সময় নয়। এ মাহেন্দ্রক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে ষ্টলে দাঁড়িয়ে গরম একপেয়ালা উপাদেয় কফি খেতে হয়। সঙ্গে রুটি বিস্কুট নয়।

শুধু ঘোরালো এক পেয়ালা কফি—জিভের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে, আঘ্রাণের মীড়ে মীড়ে, যা গলা দিয়ে নামে। পেয়ালায় চুমুক দিই আর মানুষের আনাগোনা, বেশভূষা, কাজকর্ম আর জিনিসপত্র দেখি। বর্ধমানের পর গাংপুর—ভোরের আলোয় গাড়ি পার হয়। মাঠের আলপথ ধরে হালকা গায়ের কাপড়ে কান মাথা পর্যন্ত জড়িয়ে দীর্ঘাকৃতি শীর্ণকায় পল্লিবৃদ্ধ রেলপথের নীচে নীচে চলে। শীতল হাওয়া, প্রশান্ত প্রকৃতি, শান্তগতি বৃদ্ধ; গাড়ির মধ্যেকার ভিড়ের অসুবিধায়, সারারাত্রি জাগরণের পর উত্তপ্ত চোখ মাথায় অবস্থায় দেখতে বড়ো প্রীতিপ্রদ বোধ হয়। শ্যাওলা-ঢাকা পুকুরধারে কাঁসা পিতলের বাসনের মধ্যে কালো বাহুগুলিতে শাদা শাঁখাগুলি রৌদ্র থেকে ছায়া-করা সবুজ কলাবনের পটে উজ্জ্বল দেখায়। শ্রীরামপুরের খেলার মাঠের বাঁদিক দিয়ে ঐ বাঁকা বড়ো রাস্তাটার উপর দিয়ে আনাজপাতির বাজরা নিয়ে সাদা কাপড়-পরা ঐ যে দীর্ঘাঙ্গীটি চলে যায়, স্বাস্থ্যের লাবণ্য ওর দেহে।

গাড়ি থেকে নেমে যাবার সময় আসে। তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিতে সারারাত্রির সঙ্গী যাত্রীদলের কথা একবার মনে হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্থানদখলের জন্যে দলাদলিতে যারা কথায়, কণ্ঠস্বরে, ব্যবহারে, অবস্থিতিতে, পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানই সৃষ্টি করেছিলো, গভীর রাত্রে তাদের দেখেছিলুম সুপ্তির মধ্যে একাকার; গাড়ির দোলায় গলাগলি; এ ওর গায়ে ঢলাঢলি। দিনে যে একজন অন্যের গলা কাটতো, রাতে সে তার কাঁধে মাথা দিয়ে শুয়ে রইলো। কার ঘাড়ে কার মাথা—কে কার গলা কাটে। দিনে দেখেছিলুম সকলের মুখ একভাবের—বুদ্ধির, স্বার্থের, প্রতিযোগিতার একাকার জগৎ-জোড়া রূপ। রাত্রে, সুপ্তির মধ্যে, মুখোস খ'সে যায়; প্রত্যেককে দেখি তার ব্যক্তিগত রূপে। কাউকে দেখি বকের মতোন, কাউকে হাঁসের মতোন; কেউ বাঘ, কেউ ভেড়া। একটি বউ রাত্রে ঘুমোয় না; জানালায় মুখ দিয়ে বাইরের অন্ধকারের পানে চেয়ে ব'সে থাকে—বলে রেলে অল্পই

চড়েছে,; জেগে কখনও রাত কাটায় নি; ঘুমোবে না। ভোর ক'রে দেয়।

আর ভারতবর্ষে রেলভ্রমণ—কত প্রাদেশিক রকমারী। যুক্তপ্রদেশে গাড়ি ঢোকে। গুরুগম্ভীর পাঞ্জাবী 'গোস্ত রোটী' হাঁক ঈষৎ কাংস্য কণ্ঠে 'পুরী তরকারী'তে পরিণত হয়। লোকজনের ওঠানামার গোলমালের মধ্যে কোনো ষ্টেশনে শুনি ফল-বিক্রেতা কলার দাম বলছে 'তিন আনা দরজন; না তোল, না মোল'। 'এক দাম' এই কথাটাই তো বেশ সরস ক'রে বললে। পশ্চিমকে কেন লোকে কাটখোট্টার দেশ বলে? গ্রীষ্মের দুপুরে একটা ছোটো ষ্টেশনে গাড়ি থেমেছিলো অনেকক্ষণ। তৃতীয় শ্রেণীর এক প্রৌঢ় নাগরা পাগড়ি-ধারী কাঁধে ঝোলানো চকচকে পিতলের 'লোটা' আর 'ডোর' নিয়ে নেমে গিয়ে ষ্টেশনের বাইরেই এক ইঁদারা থেকে ঠাণ্ডা জল তুলে খেয়ে এসে তৃপ্তির সঙ্গে বললে—'প্রেমদার পানি!' ঠাণ্ডা কুয়ার জলে গ্রীষ্মের তৃষ্ণা নিবারণে প্রেমের শীতলতা, তৃপ্তির গাঢ়তা—এ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী খোট্টার ভাষা, না সর্বদেশের সর্বকালের কবির ভাষা? ঘনিয়ে-আসা সন্ধ্যার মুখে দিলদারনগরের 'ইয়ার্ডের' diamond points গুলো ভীমবেগে গাড়ি পার হয়। বাতাসের দাপটে প্ল্যাটফর্মে সান্ধ্যবায়ুসেবনরত বঙ্গমহিলাদের মাথার কাপড় বিস্রস্ত হয়। চুলের সঙ্গে ব্রুচ দিয়ে মাথার কাপড় এঁটে রাখবার প্রথা উঠে গেছে। গাড়ি-চলার ধম্‌ধম শব্দের সঙ্গে একটা খস্‌খস আওয়াজের ছোঁয়াচ লাগে। ঘণ্টায় ষাট মাইলের কাছাকাছি চলেছে। নব্বই পাউণ্ডের বেশি ওজনের রেলগুলো বুঝি। এঞ্জিন কি heavy passenger super heater; কটা fly wheel? স্থূলবপু বেঁটে গলা, বৃষস্কন্ধ—কাঁটাপুকুরের ডকের ধারে বিবেকানন্দের সম্ভ্রম দাবি করেছিলো।

বিহার চলেছে। যুক্তপ্রদেশের 'পুরী তরকারী' একটু ছন্দের মধ্যে শুনি—'পুরী লো, মিঠাই লো, পুরী গরম।' শুধু বিজ্ঞাপন নেই, তার সঙ্গে একটু ছন্দ আর সুরের প্রলোভনও যুক্ত হলো। এখন

যে বাংলার পানে চলেছি—বিস্তারের, elaboration-এর দেশ মোকামা পার হয়—বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত মোকামা। কি সব ছেলেই ছিলো ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী। কি নেতৃত্বের হাতে কি যুবশক্তির অপব্যয়ই ঘটলো। হিসাব খতাবার দিন চলে গেছে। এই যা ভালো। রাজমহলের কাছ দিয়ে গাড়ি যায়—ঘেড়িয়া উধুয়ানালার যুদ্ধ। মীরকাশিম কি সে দিনের শেষ দেশ-হিতৈষী। সাঁওতাল পরগণা দিয়ে চলি—সুন্দর নামের সব 'ব্লক হাট্' কেউ খেয়াল করে না—নূরগঙ্গু, লাহাবোণ। জশিডি না কোথায় কিছু বাঙ্গালী যুবক মেয়েদের গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল। দু একজন যুবকের চোখেমুখে কেমন যেন আর্দ্রতা—বাংলা নাকি প্লাবনের দেশ। মধুপুর এলো—বাঙালীর স্বাস্থ্যনিবাস। এরা বিকেলে রেল ষ্টেশনে বেড়ায়; প্ল্যাটফর্ম-টিকিট চাইলে বলে "we are changer"—changers-ও নয়। বিহারের ভূমিকম্পের পর থেকে নাকি মধুপুরের জলে অভ্র (mica) বেশি আসছে; ডিস্‌পেপসিয়ার পক্ষে আর তত ভাল নেই; যুদ্ধের পূর্বে নাকি ও-অঞ্চলে বাড়ি আর জমির দর পড়ে যাচ্ছিলো। তবু এখনও মধুপুর বাঙালীর পক্ষে মধুময়! ওরা দেওঘরের বাজারে শীতকালে কলকাতার ভেটকী মাছ গুরুপাক ক'রে রান্না ক'রে খেয়ে আর মিষ্টান্নের দোকান থেকে বড়ো আকারের কালো জাম, ছানার জিলিপি খেয়ে, কলকাতায় ফেরবার আগে রেলের গাড়িতে ব'সে হিসাব কষে যে 'এবারে দশদিনের বেশি টানের হাওয়া পেলুম না।' ভাবনা কোনো নেই। অজীর্ণের ওষুধ পেঁপে ওখানে ফলে প্রচুর। মধুপুরের মাটি, মহেশমুণ্ডার জল—বাঙালীর সার্সাপ্যারিলা—ধন্য হউক, ধন্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।

বাংলার বর্ধমান আসতে পুরী কচুরির গলা সীতাভোগ মিহিদানার মিষ্ট গলায় মিহি হয়ে ডাকে 'খাবার'। কতকগুলি ছোটো ছোটো viaduct-এর ওপর দিয়ে কলকাতার দিকে গাড়ি চ'লে যায়। মধুপুরে সেই মাধুর্যের বিদায়দৃষ্টির আলোয় ইন্‌টারক্লাশে-ওঠা মেয়ের দল

হাওড়ায় নামে। বাস্তবিক বাঙালী মধ্যবিত্তের পক্ষে রেলভ্রমণের রস যেন ইণ্টারক্লাশেই জমে ভাল। যুবনাশ্বের "ইণ্টের ক্লাশ" থেকে যাঁরা আধুনিক কবিতা পড়েন না তাঁদের জন্যে একটু তুলে দিই ঃ—

ছাড়লো গাড়ি জশিডি ষ্টেশন থেকে।
বাক্স, বোঁচকা, প্রসাদ ও পেঁড়ার পুটুলী,
ও 'পাসে'র যাত্রী সপরিবার মালবাবু, তারবাবু,
ও টালিবাবুর বেপরোয়া গার্হস্থ্য-বিস্তার অতিক্রম ক'রে
কোনোমতে ঠাঁই নিলেন দুজনে,
ইণ্টের ক্লাশের অপরিসর অভ্যন্তরে।
লাল কস্তাপাড়ের হাফ-ঘোমটা সরিয়ে
মাল-বৌদি উত্যক্ত বিরক্তিতে গুঁজলেন গালে
দোক্তা-পানের খিলি।
টালি-বৌঠান,
ঝালরদার বালিশের তৈলাক্ত আলিঙ্গন-লিপ্ত
নবম ও কনিষ্ঠ সন্তানের নগ্ন গাত্রে
দিলেন টেনে কাঁথার কোণা।
তারবাবু হঠাৎ উঠে প্রাণান্ত কাসির বেগ রোধ ক'রে
ঠুকলেন দেশালাই আধপোড়া বিড়ির প্রান্তে।
মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে
তুমি বসলে বেঞ্চির একধারে
আমি মেঝেয়।
সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে যায়।
সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে যায়।
মহুয়া বনের পার দিয়ে,
ফুটন্ত পলাশরাগে আগুন-লাগা দিগন্ত বেয়ে।
জানালা দিয়ে চোখ পড়ে
চষা, রুক্ষ ক্ষেতের গোলকধাঁধা,

আর পলায়মান পাহাড়ের সার,—
আসন্ন অন্ধকারের আবির্ভাবে ভীত।

অচঞ্চল আকাশের নরম নীল
গাঢ়তর হ'য়ে ওঠে রাত্রির অঞ্চল-সঞ্চালনে।
হাজারো তারার মিছিল চলে সার বেঁধে মাথার ওপর।
ভেতরে চলে রেলবাবুদের অব্যাহত শান্তিপর্ব,
ঘূর্ণ্যমান ভূলোক চলে সাথে সাথে
সগর্জনে ছুটে চলে রেলগাড়ি।
ধীরে তোমার মাথা ঢ'লে পড়ে জানালার কাচে ;
ঘুমের কুহক আনত বিষণ্ণ মুখে আনে স্বপ্নের সম্মোহ।

* * * *

আর জাগে
নিদ্রিত তারবাবুর স্ফটিকনির্মিত নকল চোখটি
বীভৎস কপট কৌতূহলে।

ইংরাজী আমলের বাংলা কবিতায় বেশ গোড়ার দিকেই রেলগাড়ি চালিয়েছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। এর পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রেল-গাড়ির উপর কবিতা লেখেন।

দুজনের কবিতাতেই পশ্চিমের বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর কাছে ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের লজ্জা, অপমান, ব্যথা আর যন্ত্রণাবোধ প্রকাশ পেয়েছে, তবে সরকারী চাকুরে দীনবন্ধু স্বল্পভাষী ; বর্তমানের ক্ষোভ আর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশাটুকু প্রকাশ ক'রেই ক্ষান্ত ; স্বাধীনব্যবসায়ী আইনজীবী হেম প্রথমে স্তব……ধন্যবাদে তুষ্ট ক'রে, তারপরে ইংরাজের অবিচার বর্ণনা ক'রে, তারপরে আবারও তাদের শক্তির গুণ-গান ক'রে, আবেদন-নিবেদনের মধ্যে বিচার প্রার্থনা করেন—যাকে বলে advocacy।

দীর্ঘদিনের আবেদন-নিবেদনেও কিছু হলো না দেখে যুবনাশ্ব আজ ইংরাজের কথাই তুললেন না। নিজেদের ঘরের জীবনের বর্ণনাই তাঁর কবিতার বিষয় হলো। তাঁর রেল থেকে দেখা প্রকৃতি বর্ণনা হেমচন্দ্রের 'নিশ্বাস ছাড়ি', নিরুদ্বেগে, গাড়ির মধ্যে আরামে ব'সে 'হরিৎ বরণ মাঠ, ধান্য, নীল ইক্ষু, পাট,' আর 'তাল, বট, আম বেল' দেখা নয়। এখনকার কবি বলেন যে 'বেল পাকলে কাকের কি'। তাঁর চোখ পড়ে হতাশ্বাস আর তিক্ততার দৃষ্টিতে 'চষা রুক্ষ ক্ষেতের গোলকধাঁধা, আর পলায়মান পাহাড়ের সার,—আসন্ন অন্ধকারের আবির্ভাবে ভীত'। তাঁর অস্তরাগে সোনার অক্ষরে কোনো অঙ্গীকার লেখা নেই। সাফল্যের 'মহুয়াবনের পার দিয়ে' তাঁর 'সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে যায়', 'ফুটন্ত পলাশরাগে', মনের প্রাণের 'আগুন-লাগা দিগন্ত বেয়ে'।

যা হোক, কবিরা যাই বলুন আমার মধ্যবিত্ত বাঙালী ধাতে ঐ রেলগাড়ির ইন্টার ক্লাশে বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে ভ্রমণের মধ্যবিত্ত এড-ভেঞ্চার বেশ সয়। এরোপ্লেনে উড়লে বাঙালী-ভয়ে আমার নাড়ি ছাড়তো; গরুর গাড়িতে বাঙালীসুলভ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেতো। রেলভ্রমণের মাঝামাঝি দুঃসাহসিকতায় আছে নিরাপদ রোমাঞ্চ—Auden-এর "selfish journey between the needless risk and the endless safety" বা "expansive moments of constricted lives ("the Dog Beneath the Skin"—প্রথম chorus)।

সব রকমে রেলের ইণ্টার ক্লাশ মধ্যবিত্ত। যাত্রীদলের সামাজিক আর আর্থিক অবস্থার দিক থেকে তো বটেই, অন্যান্য দিক থেকেও। ওর আসন অতিমাত্রায় নরম গদিমোড়াও নয়, আবার কাষ্ঠাসনও নয়। আরো-নরম-হতে-পারতো গোছের ওর চামড়ার গদি। ওর বেঞ্চি এত চওড়া নয় যে বাড়ির আরামে ঘুমোতে পারি; এত সরুও নয় যে গাড়ির ঝাকুনিতে স্থানচ্যুত হই। ওতে ব'সে বিলাতী হোটেলের

খানা খেতে হয় না, আবার প্ল্যাটফর্মের জালে-ঢাকা লুচি মিষ্টিতেও আবদ্ধ থাকতে হয় না। দু জায়গা থেকে কিছু কিছু নিয়ে a la carte menu ক'রে খাওয়া চলে। ওতে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে অভিজাত রাজভোগ রসগোল্লাও নয় আর ইতর ময়দার গজাও নয়। ওতে চলে টানাপাকের সন্দেশ। ওতে ফলের রাজা আম খাওয়া চলে না, গ্রাম্য ফুটি শশাও না। ওর ফল মাঝামাঝি লিচু জামরুল। শীতকালে বেদানা আঙুর না, শাঁকালুও না—আপেল কমলালেবু। শুকনো মেওয়ার মধ্যে ঝুনো নারকোলের কুচোও নয়, পেস্তাবাদামও নয়—চীনাবাদাম। ইণ্টার ক্লাশে সুখেও চলি না, দুঃখেও চলি না। ওতে অল্পস্বল্প উত্তেজনাতেও থাকি ; কম বেশি নিরুদ্বিগ্নও হই ; যেমন মধ্যবিত্তের আপিস যাওয়ার কালে আর ফেরার সময়ে বাঙালীর রেল ই-আই-আরের ইণ্টার ক্লাশের গাড়ির ভেতরে দেওয়ালে লেখা থাকে Muzzles—যার বাঁধন আপিসে ; অন্যদিকে Butts—যার আঘাত বাড়িতে।

'লেখন'। আশ্বিন ১৩৫৩ ॥

অটোগ্রাফ

প্রমথনাথ বিশী

আর কিছুই নহে, একখণ্ড কাগজে একটি স্বাক্ষর মাত্র—ইহারি জন্যে কত লোক পাগল। অটোগ্রাফ আদায় করিবার নূতন এক ধরণের পাগলামি বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। কোনো লোক কোনো প্রকার বিশিষ্টতা অর্জন করিলেই তাহার স্বাক্ষর আদায় করিবার জন্য ছুটাছুটি পড়িয়া যায়। গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের মতো মহাপুরুষদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম—যে ব্যক্তি ভালো ফুটবল খেলিতে পারে, যে ব্যক্তি একদৌড়ে আর সকলকে হারাইতে সক্ষম—তাহাদের স্বাক্ষরের জন্যেও না কত আগ্রহ। যে কোনোপ্রকারে একবার বিশিষ্টতা অর্জন করিতে পারিলে আর তাহার রক্ষা নাই, সে বিশিষ্টতা যেমনি হোক, জলে-ভাসা সন্তরণ-বীরই হোক, কিংবা সাবান-গেলা সাবান-শহীদই হোক, আর গাছে চড়ায় পূর্ববর্তীদের রেকর্ড-ভঙ্গকারীই হোক। অমনি ছোটো বড়ো, স্ত্রী-পুরুষ পকেট হইতে, আঁচল হইতে ছোট্ট খাতাখানি খুলিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে—একটি স্বাক্ষর চাই। কোনো কারণে যাহার খাতা জোটে নাই, সে এক টুকরা কাগজ আনিয়া ধরিবে—একটি স্বাক্ষর চাই। সংগ্রহকারীদের মধ্যে আবার যাহারা বেশি উৎসাহী, তাহারা শুধু স্বাক্ষরে সন্তুষ্ট নয়—দুই ছত্র বাণীও তাহাদের চাই। সে বাণী যেমনি হোক আর যাহারি হোক—ফুটবল খেলোয়াড়ও যদি পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করে—তাহাতেও তাহাদের যেমন আগ্রহ—গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের বাণীতেও ঠিক তেমনি। অটো-গ্রাফের খাতা মহত্ত্বের কুরুক্ষেত্র—সেখানে রথী, মহারথী, পদাতিক ও অশ্বারোহী এক ভূমিশয্যায় শায়িত। মহৎকে সম্মান প্রদর্শনের উপলক্ষ্যে মহত্ত্বের এমন অপমান আর কোথাও দেখা দিয়াছে কি?

আসল্ কথা, প্রাকৃতজনের কাছে মহত্ত্বের বিশেষ মূল্য নাই, বিশিষ্টতা মাত্রেই তাহাদের কাছে সমমূল্য। সংসারে কোনোরকমে

খানিকটা কোলাহল সৃষ্টি করিতে পারিলেই সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই কোলাহলের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ সব সময়ে সম্ভবপর নয়—স্বকালের মধ্যে তো নয়-ই, কাজেই সেদিক দিয়া চেষ্টাই হয় না—নির্বিচারে সকলের স্বাক্ষর খাতায় গাঁথিয়া রাখা হয়—তারপরে সম্পূর্ণ নির্বেদ। মহাকালের উপরে যে ভার অর্পিত—মহাকাল কিছু-দিনের মধ্যেই খাতাখানি লুপ্ত করিয়া তাহার সমাধান করিয়া দেন।

অনেক সময়ে ভাবিয়াছি অটোগ্রাফ আদায়ের মূল রহস্যটা কি? বীরপূজার ভাব? বিশিষ্টতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন? না আর কিছু! আমরা যে আগের চেয়ে এখন বেশি বীরপূজক হইয়া উঠিয়াছি বা বিশিষ্টতার প্রতি আসক্তি যে বাড়িয়াছে এমন মনে করিবার কারণ নাই। অনেক ক্ষেত্রেই ইহা ইউরোপীয় প্রথার অনুকরণ মাত্র, অনেক ক্ষেত্রেই ইহা অর্থহীন হুজুগ ছাড়া আর কিছু নহে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অটো-গ্রাফের একটা বিশেষ দ্যোতনা আছে বলিয়াই মনে হয়। মানুষ মহত্ত্বকে, বিশিষ্টতাকে সম্মান করে, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করে। মহত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা বা শক্তি সাধারণ মানুষের নাই। মহত্ত্বের সহিত ভীতির কণ্টক যদি সংযুক্ত না থাকিত, তবে হয়তো মানুষ মহত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইলেও হইত। কিন্তু বর্তমানে তাহা সম্ভব নয়। এখন ভীতিকে বাদ দিয়া মহত্ত্বকে গ্রহণের যে সহজতম পন্থা মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার নাম অটোগ্রাফ। মরা বাঘের মুণ্ড বা নিহত মহিষের শিং মানুষ যেমন নিশ্চিন্তভাবে বৈঠকখানায় ঝুলাইয়া রাখে—মহাপুরুষের অটোগ্রাফও ঠিক সেই মনোভাব হইতে সংগৃহীত ও রক্ষিত। অর্থাৎ ইহাতে মহত্ত্বের চিহ্ন আছে কিন্তু মহত্ত্বের কঠোরতা নাই, মহত্ত্বের প্রতি ক্লীবের সম্মানের ভাব আছে কিন্তু বীরের ভীতির সম্মুখীন হইবার পরীক্ষা নাই—ইহা যেন একপ্রকার মহত্ত্বের আমসত্ত্ব, মহত্ত্বের নির্যাস রৌদ্রে শুকাইয়া বাক্সে ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে—প্রয়োজনমতো বাহির করিয়া চাখিলেই হইল—গন্ধে ও স্বাদে আমের আভাস দেয় বটে।

যে কোনো কারণেই হোক, যাহার মাথা একবার সহস্রের ভিড়ের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে, তাহার আর রক্ষা নাই। একবার কোনোরকমে তাহাকে চিনিতে পারিলে অটোগ্রাফ-আমসত্ত্বের সংগ্রাহকের দল তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। স্থান, কাল, পাত্রের বিচার নাই। রেলের স্টেশনই হোক, আর রেস্তোঁরাই হোক, স্বদেশ হোক কিংবা বিদেশ হোক—সময় হোক, সময় না-ই হোক, তোমার প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া ছাড়িবে। তুমি যদি অস্বীকার করো, তাড়া দাও, কটু কথা বলো, তবে তাহাদের উৎসাহ আরো বাড়িয়া যাইবে। পাঠক, জীবনে যদি সুখী হইতে চাও, তবে সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে তোমার মাথা যেন আর দশজনের মাথাকে কখনও ছাড়াইয়া না ওঠে।

মনে করো কলিকাতার কাজের কৃপণ মুষ্টি হইতে একটা দিনের ছুটি ছিনাইয়া লইয়া দুইশত মাইল দূরবর্তী এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছ। সেখানে দু'চার ঘণ্টার বেশি থাকিতে পারিবে না, সেই রাত্রেই ফিরিতে হইবে। বিকালবেলা যখন সেই দূরবর্তী স্থানে পৌঁছিলে আকাশে তখন কালবৈশাখীর অতর্কিত মেঘ উঁকিঝুঁকি মারিতে সুরু করিয়াছে। বন্ধুর বাসায় পৌঁছিয়া হাতমুখ ধুইয়া চা-পান করিয়া দুইজনে যখন মুখোমুখি বসিলে—কালবৈশাখীর ঝড় লাল ধূলির প্রলয় গোধূলি সৃষ্টি করিয়া ছুটিয়া আসিল। গল্পটি দিব্য জমিবে মনে করিয়া যখন মনে মনে আগাম আনন্দ অনুভব করিতেছ—তখন, সেই উদ্যত ঝড়ের আক্রমণ অগ্রাহ্য করিয়া একদল— হাঁ, পাঠক, তুমি ঠিকই ধরিয়াছ—একদল অটোগ্রাফ-সংগ্রাহক আসিয়া প্রবেশ করিল, কোথা হইতে তাহারা শুনিয়াছে যে, একজন বিশিষ্টের আবির্ভাব হইয়াছে, আর কি তাহারা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে? তাহারা আসিয়া সলজ্জ বিনয়ে তোমার অটোগ্রাফ যাচ্ঞা করিল, স্তম্ভিত বিস্ময়ে তোমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল এবং অন্ধকারের প্রাদুর্ভাব বলিয়া লণ্ঠনের আলো উস্কাইয়া দিয়া আরো একবার দেখিয়া লইল। ধরো, তুমি যদি সাহিত্যিক হও, তবে তোমার রচনার সঙ্গে মূর্তিটা 'কপি

ধরিয়া' মিলাইয়া লইল। তোমার মনের পুষ্পিত গল্পগুলার তৎক্ষণে নির্বাণ লাভ ঘটিয়াছে। সময় অল্প। অটোগ্রাফ-শিকারীর দল যাইবার আগেই নির্দিষ্ট সময়টুকু চলিয়া গেল, কাজেই মনের গল্প মনে লইয়াই তোমাকে বিদায় লইতে হইল। ফিরতি ট্রেণে যখন চড়িলে, তখন কাহাকে অভিশাপ দিতেছ? অটোগ্রাফ-শিকারীদের না নিজের অদৃষ্টকে? যাহাকেই দাও—তোমার জীবন হইতে এমন একটা অমূল্য মুহূর্ত স্খলিত হইয়া পড়িল—আর যাহার ফিরিবার সম্ভাবনা মাত্র নাই। পাঠক, আমার কথা শোনো—জীবনে সুখ যদি পাইতে চাও, তবে অটোগ্রাফ-সংগ্রাহকদের কবল এড়াইয়া চলিও—তাহার একমাত্র উপায় তোমার মাথা যেন কিছুতেই জনতার ঊর্ধ্বে উঠিতে না পায়। হিমালয় উন্নত, কিন্তু অসুখী; অবনতশির বিন্ধ্যই সংসারে একমাত্র সুখী—হিমালয়ে অভিযাত্রীর অভাব নাই—বিন্ধ্যের অটোগ্রাফ কেহ কখনও দাবি করে নাই।

বিচিত্র উপল। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সাদা কাগজের সন্ধান করছিলুম। সম্পাদকেরা লেখার তাগিদের সঙ্গে লেখবার কাগজ না দিয়ে ভুল করেন। দিলে, লেখকই যে শুধু অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে রক্ষা পায় তাই নয়, তাঁরাও লেখার গুরুত্ব যাই থাক, তার পরিমাণ বা পরিসর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। তাই এ-লেখা যদি প্রস্থসীমা অতিক্রম ক'রেও যায়, তবু কাগজের অপচয় বন্ধ করবার খাতিরেই এ-লেখা পত্রস্থ করতে হবে। আমার লেখা আমাকে ফেরত পাঠিয়ে আর কাউকে দিয়ে স্থানপূরণ করতে যাওয়ার অর্থ হবে এক কাজে একাধিকবার কাগজ লাগানো। অপ্রশ্রিত এ অপচেষ্টা। প্রেমপত্র লিখতে ব'সে পর্যন্ত বারে-বারে বয়ান বদলানো বারণ।

খুঁজছিলুম বায়স্কোপের হ্যাণ্ডবিল পাই কিনা। সদ্ব্যবহারের যেটুকু বাকি ছিলো সেটুকু সমাপন করতুম। আদালতে হাজিরার ও-পিঠে সাক্ষীর জবানবন্দি লেখা হচ্ছে, বস্তাপচা নথির কাগজে দরকারী চিঠিপত্র। ডেমি কাগজের দেমাক এসেছে ফ্যাকাশে হ'য়ে। ঠোঙার কাগজ ছিঁড়ে উপরওয়ালার কাছে 'ভিজিটিং-কার্ড' পাঠালে আগে তলব আসে। পোষ্ট-কার্ডের 'রাইটিং স্পেস' মানে উল্টো পিঠের ফাঁকা জায়গা সংগ্রহ ক'রে তাতে দরখাস্ত করার জন্যে আমাদেরই পাড়ার একটি ছেলে চাকরি পেয়েছে দেখলুম। লেফাফা জিনিসটা যে ফাঁপা এ এতদিনে আমাদের বুঝলে হয়।

এরি মধ্যে এটুকু শুধু লাভের যে খবরের কাগজে আকারসংক্ষেপ হয়েছে। আরো কতগুলি প্রসহ্যহরণ, উত্তেজক ভেষজভাষ্য বিবাহসভায় সমাহূত নামের তালিকা আর মৃত্যু-অন্তে মৃতের অবধারিত গুণকীর্তন থেকে আমরা রেহাই পেয়েছি। শুধু কাগজ বাঁচেনি, সময়ও বেঁচেছে। এই খবরের কাগজের উপর জীবনভোর আমাদের কত সময় অপব্যয় হয় তার আনর্থক্য হিসেব করলে ব'সে পড়তে হবে। যা ঘটে গেছে

তাতে আর স্বাদ নেই, যা ঘটতে পারে বা ঘটাতে পারি তাতেই বেশি রোমাঞ্চ। ম্রিয়মাণের চেয়ে নির্মীয়মাণ বড়ো জিনিস। পর্যুসিতের পর্যালোচনা না ক'রে নতুনতর রন্ধনের সন্ধানে গেলে বরং কাজ দেবে। তাই হ্রস্বীভূত এই খবরের কাগজ একটা দৈবানুগ্রহ।

তেমনি হয়তো বিয়েতে পদ্য, বদলিতে মানপত্র ও বিক্রিতে ক্যাশমেমো গেছে উঠে। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটির সত্যিই অবসান হচ্ছে, স্বয়ং নিমন্ত্রক এসে দ্বারে দাঁড়িয়ে হৃদয়ের দ্বারমোচন করছেন।

কিন্তু আমাকে তো লিখতে হবে। আমি কাগজ পাই কোথা ?

পুরোনো দিনের ধুলো ঘাঁটতে বসলুম। অনেক প্রয়োজনীয় আবর্জনা থেকে আবিষ্কার করলুম একখানি মোটা বাঁধানো খাতা, এবং বর্ষার অপগমে অকলঙ্ক আকাশের মতো, আশ্চর্য, তার অনেকগুলি পৃষ্ঠাই সাদা। প্লাবনের পর পাওয়া গেল যেন দাঁড়াবার জায়গা। দিগভ্রষ্ট নাবিক যেন দেখলো তরণতীর।

প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলিতে অনেক হিজিবিজি আঁকা, অসমাপ্ত কবিতা, অসংলগ্ন ভাবের কতগুলি চকিতদ্যুতি, কখনো বা কোনো প্রিয়নামের জপপ্রলাপ, কখনো বা অস্পষ্ট কোনো অপটু রেখাঙ্কন—বাকি পৃষ্ঠাগুলি অলিখিত, অমসীনিষেবিত। কী ভীষণ আশ্চর্য ও অসম্পৃক্ত মনে হলো। দেখতে পেলুম একটি অপ্রতিবন্ধ মুক্তরশ্মি বেগের উজ্জ্বলতা। শুধু প্রাণবহনের ব্যাকুলি। উদধিমেখলা পৃথিবী তখন হস্তামলক। দিগন্ত নাগালের মধ্যে, জীবন শুধু আগামী দিনের উদ্ঘাটন। লগ্নে তখন ভগ্নাশা, তবু দুরাকাঙ্ক্ষ। দেখতে পেলুম সেই বেগব্যক্ত বয়সের চেহারা। শুধু প্রাণধারণের দিনকৃতিতেই যেখানে কৃতকীর্তি ছিলুম। কী পাই বা না পাই হিসেবের খাতা ছিলো না, শূন্য পকেটের বাইরে ছিলো না কোনো কোষাগার। ব্যর্থতাটা যখন মধুমান মনে হতো, বাধা মনে হতো ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি। শুধু অকারণে অবারণ আনন্দ। কখনো বদ্ধপরিকর, কখনো বা শিথিলমুষ্টি। কিন্তু সব সময়ে নিরবসাদ, নিরর্গল। যদি কেউ বলতো, সামনে যা দেখছ,

ভুল দেখছ, ও শুধু মরীচিকা; তখন বলতে পারতুম সাহস ক'রে, সামনে যা দেখছ, ভুল দেখছ, ও আমার মানসস্বপ্ন। প্রেমের মাঝে দেখিনি তখনো পিপাসা, মন্দাকিনীতে দেখিনি তখনো ভোগবতী। বন্ধুর চোখে দেখিনি তখনো ঈর্ষা, শত্রুর চরিত্রে চিত্তদৈন্য। জনপ্রবাহের ত্বরান্বিততায় দেখিনি তখনো প্রতিযোগিতার কদর্যতা। কষ্টে তখনো গ্লানি ছিলো না অপমানের, বঞ্চনায় দেখিনি তখনো আত্মবঞ্চনা। শুধু কুড়িয়েছি, উড়িয়েছি, পুড়িয়েছি। অপ্রাপনীয়ই ছিলো লোভনীয়, উদ্‌ভ্রান্ত অন্বেষণই অভ্রান্ত লক্ষ্য। একটা কিছু রচনা করবো এই নির্ম্মিৎসাই ছিলো তখন সকল স্বপ্নের পিছনে। আর সেই নির্ম্মিৎসার পরিচয় হচ্ছে অচিহ্নিত শুভ্রতার প্রগলভ অমিতব্যয়।

একবার মনে হলো বুঝি হঠাৎ, ফের যদি সুরু করতে পারতুম গোড়া থেকে। তা হ'লে হয়তো করতুম না কতগুলি ভুল, ছাড়তুম না কতগুলি সুযোগ, মরতুম না কতগুলি অকালমরণ। এই অভিজ্ঞতার আলো নিয়ে দেখতে পেতুম যদি অন্ধকার রাস্তার চৌমাথা। ভাগ্যিস পাইনি দেখতে। তাই ঠিক পথ ধ'রে চ'লে এসেছি নিয়তিনির্ণীত হ'য়ে। পথতীর্থঙ্কর হ'য়ে। উচিতচারী হইনি হয়তো, হয়েছি একান্তচারী। কে দিয়েছে এই অভিজ্ঞতার আলো, পশ্চাত্তাপের দীপ্তি। সেদিনের সেই ক'টা তুচ্ছ ভুল, মূর্খ শৈথিল্য, বিমোহন অকালমৃত্যু। কী হবে আবার ফিরে গিয়ে। যা ঘ'টে গেছে তার চেয়ে যা ঘটতে পারে যা ঘটাতে পারি তাতে বেশি রোমাঞ্চ। এই অভিজ্ঞতার আলো থাকার দরুণ পাবো না সেই অন্ধকারের মোহ, ভয়ের ভাবালুতা, থাকবে না সেই ভুলের গৌরব, অপভ্রষ্ট সুযোগের অতৃপ্তি, ঘটবে না সেই অঘটনঘটনা। ইদানীন্তনকে দিয়ে চিরন্তনকে হারাবো। যযাতির যৌবন ব্যর্থ হবে।

তার চেয়ে এই ভালো যা আছি বা হয়েছি। কিম্বা যা হইনি, হবার সাধ্য ছিলো না। বারে-বারে শুভ্র আরম্ভের চেয়ে একটি একায়ন সমাপ্তিতে অনেক সম্পূর্ণতা। তখন ভাগ্যের কার্পণ্য দেখে মনে

হতো, জীবন এর পরে আসবে ; এখন আয়ুর কার্পণ্য দেখে মনে হয়, জীবনকে ফে'লে এসেছি পিছনে। যা প্রার্থনার তা সম্ভাবনার নয়। তখন মনে হতো, এবার সুযোগ এলে মুষ্টিকে ভ্রষ্ট হ'তে দেব না ; মুষ্টি দৃঢ় ক'রে দেখতে পাই লগ্ন কখন ভ্রষ্ট হ'য়ে গেছে। মফস্বলে থাকতে ভাবতুম, কলকলিত কোলকাতা, এখন কোলকাতায় এসে চাইছি নিবৃ'তিময় নিভৃতি। মনোমালা যাকে দিই সে মনোভবা নয়। অলকাতেও সে পলাতকা। তাই আগে যদি বা ছিলো অন্বেষণ, এখন না-হয় অন্বীক্ষণ। আগে যদি বা উজ্জ্বল দুঃসাহস, এখন ইয়ত্তা-পরিচ্ছেদ। অনেক কিছু বৈরাগ্য নিয়ে আমি হ'লেও অনেক কিছু বৈচিত্র্য নিয়েও আমি। ততগুলি আমি লোক, যতগুলি আমার বন্ধু ; তত বড়ো আমার বাসা যত বড়ো আমার বৃত্ত। জীবন আমার এইখানে, এই বর্তমানবিন্দুতে, যখন যেখানে আমি থাকি, যাতেই আমি পরিবেষ্টিত ও প্রতিফলিত হই। বন্ধুর ঈর্ষায়, শত্রুর দীনতায়, প্রেমের পতনে, বিশ্বাসের অন্যথাচরণে। তখন যেটা ছিলো প্রাণের, এখন সেটা না-হয় স্নায়ুর। তখন যেটা ছিলো স্বাদের, এখন সেটা না-হয় ক্ষুধার। তবু এও তো জীবন, আমারই জীবন। একই রক্তের লালিমা দিয়ে লালিত। তাই, তা-ই সত্য যা অত্রত্য। সেদিন যদি বা ছিলো আগ্নেয় প্রতীক্ষা, এখন শুধু নিরুত্তেজ আশা।

সোজা কথা বুঝলুম, বয়েস বেড়েছে। বাড়ুক, ভয় করিনে। প্রত্যেক সূর্যাস্তে জীবনের একটি দিনের বর্ণাঢ্য তিরোধানই দেখি শুধু, সূর্যোদয়ে অনুরূপ বর্ণবিস্তার বা আয়ুবৃদ্ধির আভাস দেখি না। তা হোক, তবু এই বয়সের অভিজ্ঞতায়ই জীবনের মর্যাদাকে আরো বেশি মূল্যবান ক'রে তুলবো। এখন যতই বুঝতে পারছি জীবন অবসীদমান, আনন্দ ততই আরো ক্ষুরধার হ'তে উৎসুক। সুযোগ ক্রমেই কমে আসবে ব'লে নবতন অভিজ্ঞতার খোঁজে জীবন আবার ধাবমান। রোদ থাকতে-থাকতে শস্য কাটতে হবে, স্পৃহা থাকতে-থাকতে মেনে নিতে হবে ইহকালের ইয়ত্তা। লক্ষ্য আবার অলব্ধ থাকবে জানি,

সুযোগ আবার হবে হস্তচ্যুত, তবু শরযোজনা করতে হবে জীবনের শরব্যের সন্ধানে।

তাই থাকতে দেয়া হবে না এই শূন্যশুভ্রতার ভার। চিহ্নিত করতে হবে জীবনের সমস্ত পৃষ্ঠা-পরিচ্ছেদ, প্রকাশ ও প্রকাশের উদ্যমে। যা কিছু অপ্রকাশিত, তাই মৃত অজন্মিত। অস্তিত্ব শুধু ব্যক্তরূপে। উন্মোচনে। স্তব্ধতার চেয়ে ব্যর্থতা অনেক ভালো, অনারম্ভের চেয়ে উদ্যোগের অসমাপ্তি। সুখে হোক দুঃখে হোক, রুদ্রে বা শ্যামলে, উত্থানে-পতনে, জীবনকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে, রূঢ় আর মূঢ়, রক্তাক্ত আর বিক্লিন্ন। তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলবে না, ফেলে রাখা হবে না তাকে অব্যবহারে, গ্যারাজে কিংবা ড্রয়িংরুমে। তাকে থাকতে দেওয়া হবে না অনাবিদ্ধ, অখণ্ডিত। সমস্ত জিনিসটাই অত্যন্ত সোজা, জীবনকে গ্রহণ করতে হবে, ফুল যেমন গ্রহণ করে আকাশের রৌদ্র, মূল যেমন গ্রহণ করে মাটির আর্দ্রতা। যা আসে তাই নিতে হবে অপ্রতিবাদে, অপ্রত্যাখ্যেয় ব'লে। দুর্জয় সাহসীর মতো। কষ্টকে অকষ্টকল্পনার মতো। বৈফল্যকে ঈপ্সিত ফললাভের মতো। জানলা দিয়ে রাস্তা দেখলে চলবে না, নেমে আসতে হবে রাস্তায়, জনগণের সমাজে, দুর্গম নির্গমে। আর, যা সম্যকরূপে আজ, তাই সমাজ। জীবনকে দেখতে হবে তাই পৃষ্ঠদৃষ্টি দিয়ে নয়, পূর্ণদৃষ্টি দিয়ে, সামনাসামনি।

আর তাকে প্রকাশ করতে হবে, কাব্যে কি কর্মে, কোনো ব্যক্তি-অতিরিক্ত অভিব্যক্তিতে। শুধু টিঁকে থাকা দিয়ে জীবনের দাম নয়। ঘড়ি টিকটিক করছে অহোরাত্র, কিন্তু ধরুন, তার কাঁটা নেই, কী হবে ঐ টিঁকে থাকায়? তাই কাঁটা চালিয়ে দেখাতে হবে প্রাণস্পন্দের ছন্দ। আমাদের পরিচয় শ্রমে নয়, বিশ্রামে। মানে, জীবিকার প্রয়োজনে বাধ্য হ'য়ে যে শ্রম করি তাতে নয়, কাজের শেষে কী ভাবে বিশ্রাম করি বা উদ্বৃত্ত সময় ব্যয় করি, তাতে। তা-ই শুধু অস্তিমান যা প্রকাশমান।

খাতার সাদা পৃষ্ঠা নিয়ে ভাবতে পারতুম যে এই নীরবতাই জীবনের চরম ঘোষণা, সর্বচেষ্টার অন্তিম পরিণতি। অনেক অক্ষমতার সাক্ষ্য থেকে সে নিজেকে রক্ষা করেছে। চিত্তের অপ্রকাশনীয়কে ধ'রে রেখেছে সে অচিহ্নমলিন নৈঃশব্দ্যে। যা বলা যায় না তাই গভীর ক'রে, সংক্ষেপ ক'রে বলেছে সে এই নির্বাক শুভ্রতায়। ভাবতে পারতুম বটে। কিন্তু দৃষ্টির কোণ গিয়েছে বদ্‌লে। বৈমুখ্য থেকে এখন দাঁড়িয়েছি এসে আভিমুখ্যে। ক্ষমা করতে পারি না আর জীবনের ক্ষয়, অব্যবহারে আর অপচয়ে, অচেষ্টায় আর অপরাঙ্মুখতায়। ঐ সাদা কাগজ হচ্ছে বিরতির প্রতীক, অকৃতিত্বের রূপান্তর, পলায়নের পরোয়ানা। অকুতোভয় জীবনের অনুভবে সহ্য হবে না এই অকর্মকের অপধর্ম।

তাই সাদা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে এই প্রথম লিখলুম প্রবন্ধ।

'অলকা'। বৈশাখ ১৩৫০ ॥

শয়ন বিলাস

ইন্দ্রজিৎ

আমি অত্যন্ত কুড়ে মানুষ, সে কথা আমার বন্ধুমহলে সুবিদিত। বলা বাহুল্য আমার বন্ধুরাও অধিকাংশই কুড়ে মানুষ। কেননা তাঁরা সবাই যদি করিৎকর্মা লোক হতেন তবে তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হতে পারতো না। আমাদের মজলিশে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে ভাবে আড্ডা দিয়ে থাকি, তা দেখলে যে কোন ব্যক্তি মনে করবেন, এদের খেয়ে দেয়ে আর কোনো কাজ নেই। এমন কি leisured class এর লোক মনে ক'রে সর্বহারাদের patron-রা মনে মনে আমাদের গাল দিতে পারেন। কিন্তু মজার কথা এই যে, আমাদের এহেন বন্ধুরাও বলেন আমার মতো কুড়ে মানুষ নাকি তাঁরা কখনও দেখেন নি। তাঁরা যখন আমাকে কুড়ের বাদশা ব'লে ডাকেন, তখন কিন্তু আমি রাগ করি না, এমন কি ওটাকে একটা অপবাদ ব'লেও মনে করি না।

কিছুদিন আগে একটি ছোটো প্রবন্ধে আমি কুড়েমির গুণকীর্তন করেছিলাম। তাতে বহু যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, কুড়েমির অভ্যাসটা দোষাবহ তো নয়ই বরং মানুষের একটি অতি মহৎ গুণ। জানি না আমার পাঠকরা সে সব যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন কি না। বাস্তবিক পক্ষে আমার মতে নিষ্কাম ব্যক্তি এবং নিষ্কর্মা ব্যক্তিতে কোনো তফাৎ নেই। উভয়েই উচ্চস্তরের জীব। বহু কামনা বাসনা ত্যাগ করলে তবেই মানুষ নিষ্কর্মা হ'তে পারে।

আপনারা অনেকেই হয়তো স্বীকার করতে চাইবেন না, কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি বাঙালীকে কুড়েমি জিনিসটাতে যেমন মানায় এমন আর কিছুতে নয়। Dying in harness ইংরেজের অতি গর্বের কথা। কিন্তু বাঙালী কখনো জোয়াল কাঁধে নিয়ে অমন undignified ভাবে মরতে রাজি নয়। জোয়ালটি কাঁধ থেকে নাবিয়ে বিছানায়

শোবে, ধীরে ধীরে পিলের আকার বৃদ্ধি হবে, ডাক্তার বদ্যি আসবে, ওষুধ পথ্যিতে ঘর ভরবে, তারপর ধীরে-সুস্থে রয়ে-সয়ে শান্তিতে মরবে এবং খাটিয়ায় চ'ড়ে শ্মশানে যাবে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে —এই প্রবাদবাক্যের মধ্যেই বাঙালী, মানুষের আজীবন কর্মব্যস্ততার প্রতি যথাযোগ্য অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রে রেখেছে।

বাঙালীর সম্বন্ধে অপবাদ আছে যে, তারা বসতে জানলে উঠতে জানে না। আমি তারও বাড়া—আমি শুতে জানলে বসতে জানিনে। সত্যি বলতে কি, দিনের অধিকাংশ সময় আমি শুয়েই থাকি। তাকিয়া বালিস ঠেসান দিয়ে পূর্ণ কিংবা অর্ধশয়ান হতে না পারলে আমি ঠিক স্বস্তি পাইনে। আজকাল আমাদের আড্ডাস্থলে ফরাস এবং তাকিয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সভ্যরা এসেই একেকটি তাকিয়া আশ্রয় ক'রে শুয়ে পড়েন। নতুন কেউ প্রবেশ করলেই সমস্বরে অভ্যর্থনা করেন, এই যে আসুন, আসুন, শুয়ে পড়ুন। আমাদের এ রকম ব্যবস্থা দেখে এক ভদ্রলোক ঠাট্টা করে এর নাম দিয়েছেন—শয্যাশায়ী ক্লাব। আমি তার জবাবে বলেছি, তা' ধরাশায়ী হওয়ার চাইতে শয্যাশায়ী হওয়া ভালো। দণ্ডায়মান থাকাটা যে একটা দণ্ড সে কথা বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া দণ্ডায়মান ব্যক্তির পতন হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি শুয়ে আছে তার অধঃপতনের আশঙ্কা কম। যাই হোক, আমাদের শয্যাশায়ী বললে কিন্তু ঠিক বলা হয় না। বলা উচিত শয্যাশ্রয়ী, কিংবা সত্যাগ্রহীর মতো আমাদের শয্যাগ্রহীও বলা যেতে পারে। কারণ শয্যার প্রতিই আমাদের আগ্রহ।

আমার কাজকর্ম যথাসম্ভব আমি শুয়ে শুয়েই সমাপন করি। টেবিলে চেয়ারে ব'সে পড়াশুনার কাজ আমার দ্বারা হয় না। লিখতে হ'লে বুকের তলায় একটা বালিশ দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়েই লিখি। সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসে আমাকে যদি দশটা পাঁচটা আপিসের কাজ করতে হতো তাহলে আমার দ্বারা একদিনও চাকুরি করা চলতো না। আমাদের কংগ্রেসী নেতারা তবু কিঞ্চিৎ তাকিয়া-minded. স্বাধীন

ভারতের শাসনবিধি চালু হ'লে যদি আপিসে আদালতে তাকিয়া-টাকিয়ার ব্যবস্থা হয় তবে অবশ্যই আমি চাকরির দরখাস্ত করবো। এ সম্পর্কে একটি কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। ভারত সমস্যা যে আজ পর্যন্ত সমাধান হয় নি তার কারণ গান্ধী-জিন্না আলোচনা প্রতি বারেই জিন্না সাহেবের গৃহে হয়েছে এবং চেয়ারে ব'সে নেতৃদ্বয় আলাপ আলোচনা করেছেন। আমার নিশ্চিত ধারণা এঁরা দুজনে যদি তাকিয়া ঠেসান দিয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় আলোচনা করতেন তাহলে সমাধান অনেক সহজ হয়ে যেতো। কারণ ব'সে দেখায় আর শুয়ে দেখায় angle of vision অনেকখানি বদলে যায়। চেয়ারে ব'সে চোখের সুমুখে আমরা যে terrafirma দেখতে পাই সেটাকে অবশ্যই হিন্দুস্থান পাকিস্থানে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু চিত হ'য়ে শুয়ে আমরা যে firmament দেখতে পাই সেখানে হিন্দুস্থান পাকিস্থান নেই। একই আকাশ উভয়ের মাথার উপর। বিধাতা পুরুষ হিন্দু মুসলমান সকলকে under the same roof বাস করবার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন।

যাকগে, তত্ত্বকথা রেখে দিয়ে সোজা কথাই বলি। আমি সারাক্ষণ শুয়ে থাকি বলে আপনারা মনে করবেন না যে আমি সারাক্ষণ পড়ে পড়ে ঘুমোই। রাতজাগার দিক থেকে আমি পৃথিবীর স্বনামখ্যাতদের দলে। নেতাজী রাত্রিতে মাত্র দু তিন ঘণ্টা ঘুমোতেন, হিটলার চার্চিলেরও চোখে ঘুম ছিলো না—রাত্রি জেগে ক্যাবিনেট মিটিং করতেন। এসব খবর একাধিকবার খবরের কাগজে বেরিয়েছে। আমার ওসব বালাই নেই। আমি কাজের কথাও ভাবি না, ঘুমের কথাও না। আমার ঐ শুয়ে থাকাতেই আনন্দ। পাশের জানালাটি খোলা, তারই ভেতর দিয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখি। না হয়তো পাশ ফিরে চোখটি বুজে শুয়ে থাকি। চোখ বুজলেই সব চেয়ে বেশি দেখা যায়, চোখ মেলে সামান্যই দেখি। তা ছাড়া চলমান জগতকে ভালো করে দেখতে হ'লে নিজেকে নিশ্চল হ'য়ে থাকতে হয়।

না ঘুমিয়ে মিছিমিছি শুয়ে থাকাটা অনেকে নিতান্ত বিরক্তিকর

ব্যাপার মনে করেন। তাঁরা বলেন শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গোণা ছাড়া অন্য কাজ থাকে না। সেটাও একটা কাজ, কড়িকাঠ গুণতে গুণতে অনেক বড়ো বড়ো ভাবনা মাথায় এসে যায়। দুঃখের বিষয়—আজকাল আপনারা যে সব ঘরে বাস করেন তাতে কড়িকাঠ থাকে না। ফলে বাঙালীর চিন্তাশক্তি ক্রমে হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। চেষ্টারটন বড় মজার কথা বলেছেন—

Lying in bed would be an altogether perfect and supreme experience if only one had a coloured pencil long enough to draw on the ceiling.

চেষ্টারটনের যা বিশাল বপু, তাতে তাঁর পক্ষে এপাশ ওপাশ করা কঠিন ছিলো। বোধকরি তিনি চিত হ'য়েই সাধারণতঃ শুয়ে থাকতেন, কাজেই তিনি সিলিংএ ছবি আঁকার কথা ভেবেছেন। যাঁরা আমার মতো পাশ ফিরে শোন (এই জন্যই বোধহয় আমার মতামত একটু একপেশে) তাঁরা স্বভাবতঃই চোখ বুজে মনশ্চক্ষে ছবি দেখেন।

শুয়ে থাকাকে যাঁরা বৃথা কালক্ষেপ মনে করেন আমি তাঁদের দলে নই। আমার যে-জগতে বিচরণ শয্যা আশ্রয় না করলে সেখানে প্রবেশ নিষেধ। দিবাস্বপ্ন অবশ্য বসে বসেও দেখা যায়, কিন্তু শুয়ে শুয়ে দেখা আরো বেশি আরামের। লোকে কথায় বলে গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না। আমি যে নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে থাকি তার ফলে আমার ভাগ্যে কিঞ্চিৎ শ্যাওলা জুটেছে। ঐ শ্যাওলাই আমার চিত্তভূমিকে সরস ক'রে রেখেছে। শুয়ে থাকার সেইটেই সবচেয়ে বড়ো লাভ। অতএব উপসংহারে আপনাদের সকলকে আমাদের ক্লাবের স্লোগানটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন, সবাই শুয়ে পড়ুন।

ইন্দ্রজিতের খাতা। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ॥

কানাই ও বলাই

অন্নদাশঙ্কর রায়

সাহিত্যিকদের মোটামুটি দু ভাগ করা যায়। একভাগে হিতকারী, অপরভাগে মনোহারী। এক দলের নাম দেওয়া যাক বলাই, আরেক দলের নাম কানাই।

কানাইদের বিরুদ্ধে বলাইদের নালিশ এ যুগের নয়। হলধরেরা বংশীধরদের বিরুদ্ধে যুগে যুগে এই কথাই বলে আসছেন যে, ওরা কাজ করে না, খেলা করে। শেখায় না, ভোলায়। রোম যখন পোড়ে তখনো ওরা বাঁশি বাজায়। ওদের কাছে আগুন নেবানো তুচ্ছ, ফাগুন পোহানোই আসল।

বলরামের হলখানির ওজনটি তো কম নয়। ওখানি ঘাড়ে ক'রে বেড়ালে ঘাম যাবেই। কর্মের লক্ষণ হলো ঘর্ম। বলাইদের মতো কাজের লোক কানাইদের মতো বাজে লোকদের সহ্য করতে পারেন না। বাঁশির আর কতো ওজন। এ তো ছেলেখেলা।

কিন্তু রাগটা কানুর উপরে না ক'রে বেণুর উপরেই করা উচিত। ওজন হিসাবে হলের ওজন বেণুর চেয়ে বেশি। সুতরাং মূল্য হিসাবে হলের মূল্য বেণুর চেয়ে বেশি। অথচ বেণুর ধ্বনি যোজনভেদী হৃদয়ভেদী।

একদল লেখকের হাতে লেখনী যেন লাঙল। তাঁরা যে লাঙলের গুণগান করেন সেটা স্বাভাবিক। আরেক দলের হাতে সেই জিনিসই যেন বাঁশরি। তাঁরা যে তাই নিয়ে বিভোর থাকবেন এটাও স্বাভাবিক। লেখনী দেখতে একই রকম, সেইজন্যে সকলেই লেখক। কিন্তু লেখা যখন বেরোয় তখন দেখা যায় কোনোটা হলকর্ষণ, কোনোটা চিত্তাকর্ষণ। বলরামরা নিজেদের কীর্তি দেখে ফূর্তিবোধ করতে পারেন না, পরের ছিদ্র ধরেন। বাঁশির ছিদ্র আছে, তাই ছিদ্র ধরাও সোজা।

* * * * *

বলভদ্রদের বল চিরকাল বেশি। সে বল সমাজের বল। তাঁরা বিশ্বাস করেন ও করাতে চান। সবার উপরে সমাজ সত্য, তাহার উপরে নাই। তাঁরা বলেন, সমাজের ভালোমন্দই সাহিত্যের ভালোমন্দ। সাহিত্যের নিজস্ব ভালোমন্দ নেই, সাহিত্য সমাজের সামিল।

বলাইরা তাঁদের মত নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকুন, কানাইদের তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু কালের সঙ্গে বল-পরীক্ষায় হলধরদের হার হয়, তাতে তাঁদের মেজাজটা যায় বিগড়ে। সেইজন্যে তাঁরা বংশীধরদের বংশ ধ্বংস করতে পারলে ঠাণ্ডা হন। ওদের প্রধান অপরাধ ওরা পলাতক। ওরা খাটে না, খায়। ওরা ফরমাস মানে না, নিরঙ্কুশ। ওরা সমাজের সঙ্গে বেখাপ।

কিন্তু কালের সঙ্গে ওদের চমৎকার খাপ খায়। কালের স্রোত কালিন্দীর স্রোতের মতো উজান বেয়ে শ্রোতা হয় কানুদের বেণুর। অসামাজিক, তবু সমাজের সুপ্রিয়।

জীয়নকাটি। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ ॥

কুড়েমি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আত্মপ্রচারের অহমিকা থেকে নয় অত্যন্ত অপরাধীর মতো সংকোচভরে আমি স্বীকার করছি আমি অত্যন্ত কুড়ে। আমার কুড়েমির খ্যাতি বন্ধু-বান্ধব থেকে সুরু করে বাইরের লোকের মধ্যেও কিছু কিছু ছড়িয়ে পড়েছে। কেজো লোকেরা আমার নামে মুখ বিকৃত করে, বন্ধু-বান্ধবেরা হতাশার নিশ্বাস ফেলে, অনুরাগী যে দুচার-জন আছে তারা বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে। যারা অভিজ্ঞ তারা আমার সঙ্গে কোনো দেখাশোনার সময় ঠিক করতে এদিকে ওদিকে ঘণ্টা দু-এক-এর উদ্বৃত্ত আগে থাকতে ধ'রে রাখে, আমায় কোনো বরাত দেওয়ার বেলা প্রথম থেকেই ব্যাপারটা বাতিল করবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে থাকে। সম্পাদকেরা আমার কাছে সময়মতো লেখা পায় না, বন্ধু-বান্ধবেরা পায় না চিঠির জবাব। সদিচ্ছার আমার অভাব নেই—চিঠি পেলেই তার জবাব আমি দেবার জন্য উৎসুক হই, কিন্তু লেখাটা বেশিরভাগ সময়ে মনে মনেই হয়, কলমের মুখে কাগজ পর্যন্ত পৌঁছোয় না। সম্পাদকের তাগাদায় অনেক গল্প আমার কল্পনায় জন্ম নিয়ে সেইখানেই একদিন বিলীন হ'য়ে গিয়েছে, কম্পোজিটররা তার পাঠোদ্ধার ক'রে ছাপার হরফে সাজাবার দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেয়েছে।

আমার এই কুড়েমি নিয়ে আমার মনে কোনো গ্লানি নেই এমন নয়। কুড়েমির দোষ যে কত আমি মর্মে মর্মে বুঝি। দরকারী কাগজ পত্র যথাসময়ে যথাস্থানে রাখবার আলস্যের দরুণ ঘণ্টা দুই খুঁজে হয়রান ও হতাশ হ'য়ে মেজাজ আমার অহরহঃ বিগড়ে যায়,—ধার না ক'রেও শুধু লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি না রাখতে পেরে কাগজওয়ালাদের তাগিদে, পাওনাদারদের ভয়ে খাতকের মতো আমায় চোর হ'য়ে থাকতে হয়। সকাল বেলা বেশ নিশ্চিন্ত মনে অর্ধশায়িত অবস্থায় এনসাই-

ক্লোপিডিয়ার পাতায় পাতায় যথেচ্ছ বিহার করতে করতে (পাণ্ডিত্য অর্জনের উৎসাহে নয়, নেহাৎ অবসাদ বিনোদনের বাতিকে) চড়ুই পাখিদের পারিবারিক কলহ উপভোগ করছি, এমন সময় বাইরে থেকে কার ডাক শোনা যায়। তৎক্ষণাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। মনে পড়ে এই সাদা মেঘের পাল তুলে ভেসে-যাওয়া সুনীল দিনটার বিদঘুটে ব্যবহারিক নাম হলো বৃহস্পতিবার এবং এই দিনে সকাল ন-টার সময় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুনীল ধরের কাছে লেখা দেবার জন্যে আমি অঙ্গীকার-বদ্ধ। ডাকটা শুনে বেমালুম বিলুপ্ত হ'য়ে যাবার বাসনা একটা ক্ষণিক প্রবল হয়, ইচ্ছা হয় কাউকে দিয়ে বাড়ি নেই ব'লে খবর পাঠাই। কিন্তু বন্ধুবর সুনীল ধরের হাত থেকে অত সহজে রেহাই পাওয়া যায় না। একেবারে বাড়ির ভেতর তিনি চড়াও হ'য়ে এসে পাকড়াও করেন। সুতরাং সত্য মিথ্যা বাস্তব ও কল্পনায় মেশানো নানা কাহিনী তৈরি ক'রে লেখাটা যথাসময়ে না লিখতে উঠতে পারার কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করি। সম্পাদক ধৈর্য ধ'রে সব কথাই শোনেন, কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা যায় আমার কোনো কথাই তিনি বিশ্বাস করেন না। কারণ তিনি আমায় আজ পনেরো বছর ধ'রে চেনেন। লেখবার মেয়াদ আর কয়দিন বাড়িয়ে দিয়ে আবার বিশেষ একটা তারিখ আমার ক্যালেণ্ডারে দাগ দিয়ে রেখে তিনি গম্ভীরমুখে আসামীর বিচার মুলতুবি রাখা বিচারকের মতো বিদায় নেন। ধরা-পড়া অপরাধীর মতো অপ্রস্তুত হয়ে বিরস মুখে আমি ব'সে থাকি।

না, কুড়েমির দুঃখ ও শাস্তি যে অনেক সে কথা অস্বীকার করবার সাধ্য আমার নেই। তবু কুড়েমি ত্যাগ করা আমার দ্বারা হ'য়ে উঠবে না, কারণ ত্যাগ করতে আমি চাইও না। আমার নিজের কুড়েমি হয়তো মাত্রাছাড়া কিন্তু তাবলে কুড়েমির ওকালতি করবারও যথেষ্ট আছে। কুড়েমিই যদি না করলাম তাহলে মানুষ হবার দুর্লভ গৌরব কিসে? কাজ তো সবাই করে, সূর্য, চন্দ্র, তারা; জড় থেকে চেতন সমস্ত সৃষ্টি কাজের অমোঘ শৃঙ্খলে বাঁধা। কুড়েমি করবার

ঐশ্বরিক অধিকার একমাত্র মানুষের। তার মনুষ্যত্বের চরম প্রকাশ এই কুঁড়েমি করবার স্বাধীনতায়।

অন্য প্রাণী বিশ্রাম করে মাত্র, মানুষই শুধু ইচ্ছে করলে কাজে ফাঁকি দিয়ে কুড়েমি করতে পারে। ঘরে ব'সে যখন তার সারাদিনের হিসেব লেখা দরকার, ছাদে শুয়ে তখন তারা গুণতে পারে, ওপারের হাটে যখন বেচাকেনা করতে না গেলে নয়, তখন আনমনে নদীর স্রোতে ভেসে যেতে পারে চেনা ঘাট ছাড়িয়ে নিরুদ্দেশে।

কাজের গণ্ডি-দেওয়া জীবন থেকে কুড়েমির অলস স্রোতে ভেসেই মানুষ একদিন শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতের রহস্যলোকের সন্ধান পেয়েছে, মাটি থেকে অকারণে ওপরে চোখ তুলে দেখতে পেয়েছে আকাশ।

কাজের টানাপোড়েনে জীবন যত খাপি ক'রেই বোনা হোক না কেন, কাজে কুড়েমির ফাঁক না রাখলে, বেঁচে থাকার আসল মানেটাই যায় হারিয়ে। সভ্যতার সুরু থেকে কাজের সুসার আর সময় সংক্ষেপ করবার আপ্রাণ চেষ্টা তো ক'রে আসছি। সভ্যতাটা আসলে সেই সাধনারই ইতিহাস, তুহাতে দশহাতের কাজ সারবার আগ্রহে এখন আমরা এক আঙুলের টিপুনিতে, দশ, বিশ, লক্ষ তুরঙ্গ-বিক্রম ইচ্ছা-মতো পরিচালনা করার ক্ষমতা লাভ করেছি, তু বছরের পথ তু দিনের জায়গায় তু দণ্ডে পার হ'য়ে যাচ্ছি। কিন্তু এত সুসার এত সংক্ষেপ সে কি শুধু আরো কাজ বাড়াবার জন্য! শুধু কাজ আর কাজ, জীবনে কি তার বাইরে আর কিছু নেই। কাজ করবার নেশায় কাজের উদ্দেশ্যই যাবো ছাড়িয়ে? এঞ্জিন চালাবার উৎসাহে স্টেশনের কথা আর খেয়াল থাকবে না?

তুনিয়ার মানুষকে কাজের ভূতে আজ এমন পেয়ে বসেছে যে, কাজ না থাকলে অকাজের খই ভাজতেও তার আপত্তি নেই। দরকারের বেশি কাজের নেশাতেই এত মারামারি, কাটাকাটি, আখছা আখছি। এর চেয়ে পৃথিবীর মানুষ যদি আর একটু বেশি কুড়ে হতো, নির্বিরোধ কুড়েমির উদার দীক্ষা যদি তারা পেতো তাহলে তুনিয়ার অনেক সমস্যার

সমাধানের ভাবনা থাকতো না, কারণ সমস্যা সৃষ্টির সুযোগই থাকতো অল্প।

কুড়ে হলে আজকের দিনের ব্যস্তবাগীশ জাতগুলো কাজের ধান্দায় পথে বিপথে ছুটোছুটি ধাক্কাধাক্কি না ক'রে হয়তো দু দণ্ড নিজেদের চৌকাঠে বসে পাড়াপড়শির সঙ্গে আলাপ করতো, চিনতো, বুঝতো, ভালোবাসতো পরস্পরকে। কুড়ে লোক ফাঁকা মাঠ দেখলে দাঁড়ায়, খানিক বাদে শুয়ে পড়ে, কিন্তু কাজের লোক মাঠ দেখলে আগেই যায় মাপতে, তারপর দখল করবার জন্যে লাঠালাঠি বা মামলা না বাধিয়ে তার সোয়াস্তি নেই। ফাঁকা মাঠ দেখে শুয়ে পড়বার লোক যদি পৃথিবীতে বেশি থাকতো, তাহলে মাঠ খুঁড়ে পরিখা কাটার প্রয়োজন অন্ততঃ হতো না।

কাজ নিয়ে এই খেপামি রোগের বীজ ঠাণ্ডা দেশগুলো থেকেই আমদানী। আমাদের গরম হাওয়ায় ও-রোগ আপনা থেকে গজায় না, আমদানী হ'লেও তেমন চেপে ধ'রে ছড়াতে পারে না। ঠাণ্ডা দেশের অভাগা মানুষকে রক্ত গরম রাখবার তাগিদেই লাফালাফি দাপা-দাপিটা বেশি করতে হয়। তাদের নকল ক'রে সাধ ক'রে ও রোগের বীজ রক্তে ঢুকিয়ে খেপে ওঠার মতো আহাম্মুক আমরা হ'তে যাই কেন? ঠাণ্ডা দেশেরও এখন এ রোগ সারাবার সময় হয়েছে, কাজের নেশা অকাজের সর্বনাশে পৌঁছোতে নইলে আর দেরি হবে না।

সভ্য হওয়া অবধি কাজ তো অনেক করলাম, এবার মানুষ জাতটার একটু কুড়েমি করবার ফুরসত কি হয়নি—ফাঁকা মাঠে গিয়ে একটু বসবার, দিগন্তের একটি তারা কি ঘাসের ডগার শিশিরকণাটিকে দেখবার? কুড়েমি মানে তো মনের শূন্যতা নয়, অসীম রহস্যে ডগমগ মনের নিথর নিটোল পূর্ণতা।

বৃষ্টি এলো। অগ্রহায়ণ ১৩৬১ ॥

‘আমার ভাণ্ডার আছে ভরে’

সৈয়দ মুজতবা আলী

শব্দ প্রাচুর্যের উপর ভাষার শক্তি নির্ভর করে। ইংরেজী এবং বাংলা এই উভয় ভাষা নিয়ে যাঁদের একটুখানি ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়, তারাই জানেন বাংলার শব্দ-সম্পদ কত সীমাবদ্ধ। ডাক্তারী কিংবা ইঞ্জিনীয়ারিং টেকনিকেল শব্দের কথা তুলছিনে—সে সব শব্দ তৈরী হতে ঢের দেরি—উপস্থিত সে শব্দের কথাই তুলছি যে-গুলো সাহিত্য ক্ষেত্রেই সর্বদা দরকার হয়।

ইংরেজীর উদাহরণই নিন। ইংরেজী যে নানা দিক দিয়ে ইয়োরোপীয় সর্ব ভাষার অগ্রগণ্য তার অন্যতম প্রধান কারণ ইংরেজীর শব্দ-সম্পদ। এবং ইংরেজী সে সম্পদ আহরণ করেছে অত্যন্ত নির্লজ্জের মতো পূর্ব-পশ্চিম সর্বদেশ মহাদেশ থেকে। গ্রীক, লাতিনের মতো দুটো জোরালো ভাষা থেকে তার শব্দ নেবার হক তো সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েইছে তার উপর ফরাসীর উপরও ওয়ারিশান বলে তার ষোল আনা অধিকার। তৎসত্ত্বেও—সুকুমার রায়ের ভাষায় বলি—

এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা
খাও তবে কচু-পোড়া খাও তবে ঘণ্টা !!

ইংরেজ উত্তরে বেশরমের মতো বলে,—“ঠিক বলেছ, আমার মন ওঠেনি, আমি কচু-পোড়া এবং ঘণ্টা খেতেও রাজি আছি!” তাই দেখুন ইংরেজ, আরবী, ফার্সী, তামিল, হিন্দী, মালয়—কত বলবো ?—দুনিয়ার তাবৎ ভাষা থেকে কচু-পোড়া ঘণ্টা সব কিছু নিয়েছে, খেয়েছে, এবং হজমও করে ফেলেছে। ‘এডমিরাল’ নিয়েছে আরবী ‘আমীর-উল্-বহর’ থেকে, ‘চেক’ (কিস্তিমাতের) নিয়েছে ফার্সী ‘শাহ’ থেকে, ‘চুরুট’ নিয়েছে তামিল ‘শুরুট্টু’ থেকে, ‘চৌকি’ নিয়েছে হিন্দী থেকে, ‘এমাক’ নিয়েছে মালয় থেকে।

কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজের এই বিদ্‌ঘুটে গরুড়ের ক্ষুধা শুধু শব্দ বাবদেই; আহারাদির ব্যাপারে ইংরেজ নকিষ্যি কুলীনের মতো উন্নাসিক, কট্টর স্বপাকে খায়, এ-দেশে এত কাল কাটানোর পরও ইংরেজ মাস্টার্ড (অর্থাৎ সর্ষেবাটা বা কাসুন্দি) এবং মাছে মিলিয়ে খেতে শেখেনি, অথচ কে না জানে সর্ষেবাটায় ইলিশ মাছ খাদ্য-জগতে অন্যতম কুতুব-মিনার? ইংরেজ এখনো বিস্বাদ ফ্রাইড ফিশ খায়, মাছ ভাজতে শিখলো না; আমরা তাকে খুশি করার জন্য পান্তুয়ার নাম দিলুম লেডিকিনি (লেডি ক্যানিং) তবু সে তাকে জাতে তুললো না, ছানার কদর বুঝলোনা। তাই ইংরেজের রান্না এতই রসকষবর্জিত, বিস্বাদ এবং একঘেয়ে যে তারই ভয়ে কন্টিনেণ্টাল মাত্রই বিলেত যাবার নামে আঁৎকে ওঠে—যদি নিতান্তই লণ্ডন যায় তবে খুঁজে খুঁজে সোহো মহল্লায় গিয়ে ফরাসী রেস্তোরাঁয় ঢুকে আপন প্রাণ বাঁচায়। আমার কথা বাদ দিন, আমার পেটে এটম বোম মারলেও আমি ইংরিজি খানা দিয়ে পেট ভরতে রাজি হবো না।

শব্দের জন্য ইংরেজ দুনিয়ার সর্বত্র ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায় সে না হয় বুঝলুম; কিন্তু ইংরেজের মতো দম্ভী জাত যে দুশমনের কাছ থেকেও শব্দ ধার নেয় সেইটেই বড়ো তাজ্জবকী বাৎ। এই লড়াইয়ের ডামাডোলে সবাই যখন আপন আপন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত তখনো ইংরেজ গোটা কয়েক শব্দ দুশ্‌মনের কাছ থেকে ধার নিয়ে দাঁত দেখিয়ে হেসেছে। লুফ্‌ট-ভাফ্‌ফের মার খেয়ে খেয়ে ইংরেজ যখন মর-মর তখনো সে মনে মনে জপছে, 'লুফ্‌ট-ভাফ্‌ফে, লুফ্‌ট-ভাফ্‌ফে, শব্দটা ভুললে চলবে না,' ব্লিৎস্‌ক্রীগের ঠেলায় ইংরেজ যখন ডানকার্কে ডুবু-ডুবু তখনো ইষ্টনাম না জপে সে জপেছে, 'ব্লিৎস-ক্রীগ, ব্লিৎস-ক্রীগ।'

আর বেতামিজীটা দেখুন। গালাগাল দেবার বেলা যখন আপন শব্দে কুলোয় না—মা লক্ষ্মী জানেন সে ভাণ্ডারেও ইংরেজের ছয়লাব—তখনো সে চক্ষুলজ্জার ধার ধারে না। এই তো সেদিন শুনলুম কাকে

যেন 'স্বাধিকার প্রমত্ত' বলতে গিয়ে কোনো এক ইংরেজ বড়ো কর্তা শত্রুপক্ষকে শাসিয়েছেন, "আমাদের উপর ফ্যুরার-গিরার ফপর-দালালি করো না।"

পাছে এত সব শব্দের গন্ধমাদন ইংরেজকে জগন্নাথের জগদ্দল পাথরে চেপে মারে তাই তার ব্যবস্থাও সে করে রেখেছে। 'জগন্নাথ' কথাটা ব্যবহার করেই সে বলেছে, "ভেবে চিন্তে শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করবে—পাগলের মতো ডোণ্ট থো ইয়োরসেলভস আণ্ডার দি হুইল অব Juggernaut (জগন্নাথ)।"

ব্যাটারা আমাদের জগন্নাথকে পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রা করিয়ে দেশে নিয়ে ছেড়েছে। পারলে তাজমহল আর হিমালয়ও আগেভাগেই নিয়ে বসে থাকতো—কেন পারেনি তার কারণ বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

ফরাসী জাতটা ঠিক তার উল্টো। শব্দ গ্রহণ বাবদে সে যে কত মারাত্মক ছুঁৎবাইগ্রস্ত তা বোঝা যায় তার অভিধান থেকে। পাতার পর পাতা প'ড়ে যান, বিদেশী শব্দের সন্ধান পাবেন না। মনে পড়ছে, আমার তরুণ বয়সে শান্তিনিকেতনের ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া সায়েবের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। রোমা রলাঁর পঞ্চাশ না ষাট বছর পূর্ণ হওয়াতে পৃথিবীর বড়ো বড়ো রলাঁ-ভক্তেরা তখন তাঁকে একখানা রলাঁ-প্রশস্তি উপহার দেন। এ-দেশ থেকে গাঁধী, জগদীশ বসু, এঁরা সব লিখেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কিনা ঠিক মনে পড়ছে না। বেনওয়া সায়েবও সে-কেতাবে একখানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন—বিষয়বস্তু 'শান্তিনিকেতনের আশ্রম।' আশ্রম শব্দে এসে বেনওয়া সায়েবের ফরাসী নৌকা বানচাল হ'য়ে গেল। 'আশ্রম' শব্দটা ফরাসীতে লিখবেন কি প্রকারে, অথচ ফরাসী ভাষায় 'আশ্রম' জাতীয় কোনো শব্দ নেই। আমি বললুম, "প্যারিস শহর আর ব্রহ্মচর্যাশ্রম যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই প্রান্তে অবস্থিত—অন্ততঃ ভাবলোকে—সে কথা সবাই জানে, তবু—ইত্যাদি।" বেনওয়া সায়েব ফরাসী কায়দায় শোলডার শ্রাগ ক'রে

বললেন, "উঁহুঁ, বদহজম হবে!" সায়েব শেষটায় কি ক'রে জাত-রক্ষা আর পেট ভরানোর দ্বন্দ্ব সমাধান করেছিলেন, সে-কথাটা এতদিন বাদে আজ আমার আর মনে নেই।

অর্থাভাববশতঃ একদা আমাকে কিছুদিনের জন্য এক ইংরেজ ব্যবসায়ীর ফ্রান্সাগত ফরাসী চিঠিপত্রের অনুবাদ ক'রে দিতে হয়েছিলো। মনে পড়ছে, কারবারে ফরাসী পক্ষ হামেশাই ইংরেজ পক্ষকে দোষারোপ করতো যে ইংরেজ অনেক সময় আপন অভিসন্ধি সাফ সাফ বলে না। ইংরেজী ভাষায় শব্দ-সম্পদ প্রচুর ব'লে ইচ্ছে করলেই আপন বক্তব্য ঘোলাটে, আবছা-আবছা ক'রে লেখা যায়। ফরাসীতে সেটি হবার জো নেই। যা বলার সেটা পরিষ্কার হ'য়ে বেরোবেই বেরোবে (লক্ষ্য ক'রে থাকবেন কাচ্চা-বাচ্চার শব্দ-সম্পদ সীমাবদ্ধ ব'লে তাদের কথায় সব জিনিসই হয় কালো নয় ধলা, সব কিছুই পরিষ্কার, কোনো প্রকারের হাফটোন নেই)। তাই ফরাসী এই চিঠিপত্র লেনদেনের ব্যাপারে পড়লো বিপদে।

কিন্তু ফরাসীরাও গম যব দিয়ে লেখাপড়া শেখে না। তাই শেষটায় ফরাসী কারবারি হুমকি দিলো, সে ইংরেজ রেখে চিঠিপত্র ইংরেজীতে লেখাবে। ইংরেজ হন্তদন্ত হয়ে চিঠি লিখলো "সে কি কথা, আপনাদের বহুৎ তকলিফ হবে, বড্ড বেশি বাজে খর্চা হবে, এমন কম্ম করতে নেই।"

তখন একটা সমঝাওতা হলো।

* * *

Gepaeckaufbewahrungstelle!

শব্দটা শুনে মূর্ছা যাই আর কি?

প্রথমবার বার্লিন যাচ্ছি, জর্মন ভাষার জানি শুধু ব্যাকরণ, আর কণ্ঠস্থ আছে হাইনরিশ হাইনের গুটিকয়েক মোলায়েম প্রেমের কবিতা। সে-রেস্ত দিয়ে তো বার্লিন সহরে বেসাতি করা যায় না। তাই একজন ফরাসী সহযাত্রীকে ট্রেন বার্লিন পৌঁছবার কিছু আগে জিজ্ঞেস

করলুম, 'ক্লোক-রুম' বা 'লেফট-লগেজ-আফিসের' জর্মন প্রতিশব্দ কি? বললেন,

Gepaeckaufbewahrungstelle!

প্রথম ধাক্কায়ই এ-রকম আড়াইগজী শব্দ মুখস্থ করতে পারবো, সে দুরাশা আমি করিনি। মঁসিয়োও আঁচতে পারলেন বেদনাটা—একখানা কাগজে টুকে দিলেন শব্দটা। তাই দেখালুম বার্লিন ষ্টেশনের এক পোর্টারকে। মাল সেখানে রেখে একটা হোটেল খুঁজে নিলুম। ভাগ্যিস 'হোটেল' কথাটা আন্তর্জাতিক—না হলে ক্লোক রুমের তুলনায় হোটেলের সাইজ যখন পঞ্চাশগুণ বড়ো তখন শব্দটা পঞ্চাশগুণ লম্বা হতো বই কি!

জর্মন ভাষার এই হলো বৈশিষ্ট্য। জর্মন ইংরিজির মতো দিল-দরিয়া হয়ে যত্রতত্র শব্দ কুড়োতে পারে না। আবার ফরাসীর মতো শব্দ-তাত্ত্বিক বাত ব্যামোও তার এমন ভয়ংকর মারাত্মক নয় যে উবু হ'য়ে দু একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় শব্দ কুড়োতে না পারে। শব্দ সঞ্চয় বাবদে জর্মন ইংরিজী ও ফরাসীর মাঝখানে। তার সম্প্রসারণক্ষমতা বেশ খানিকটা আছে; কিন্তু ইংরিজী রবারের মতো তাকে যত খুশি টেনে লম্বা করা যায় না।

জর্মন ভাষার আমল জোর তার সমাস বানাবার কৌশলে আর সেখানে জর্মনের মতো উদার ভাষা উপস্থিত পৃথিবীতে কমই আছে।

এই যে উপরের শব্দটা শুনে বিদগ্ধ পাঠক পর্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েছিলেন সেইটেই নিন। Gepaeck অর্থ যা প্যাক করা যায়, অর্থাৎ লাগেজ, aufbewahrung অর্থ তদারকি করা (ইংরেজী beware কথা থেকে bewahrung); আর stelle কথার অর্থ জায়গা। একুনে হলো 'লাগেজ তদারকির জায়গা।' জর্মন সব কটা শব্দকে আলাদা আলাদা রূপে বিলক্ষণ চেনে ব'লেই সমাসটার দৈর্ঘ্য তাকে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত করে না।

তুলনা দিয়ে বক্তব্যটা খোলসা করি।

"কিংকর্তব্যবিমূঢ়" কথাটার সামনে আমরা মোটেই কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইনে। তার কারণ, কর্তব্য আর বিমূঢ় আমরাই হামেশাই ব্যবহার করি আর কিং কথাটার সঙ্গেও আমাদের ঈষৎ মুখচেনাচেনি আছে। কাজেই সমাসটা ব্যবহার করার জন্য আমাদের বড্ড বেশি "প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের" প্রয়োজন হয় না। যারা সামান্যতম বাংলা জানে না তাদের কথা হচ্ছে না, তারা "নিত্যসা ফতেনা দিয়েমা" করে এবং ঘৃত তৈল লবণ তণ্ডুল বস্ত্র ইন্ধনের সামনে ঘরপোড়া গোরুর মতো সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়।

বড্ড বেশি লম্বা সমাস অবিশ্যি কাজের সুবিধে ক'রে দেয় না। তাই যারা সমাস বানাবার জন্যই সমাস বানায় তাদের কচকচানি নিয়ে আমরা ঠাট্টা মস্করা করি। জর্মনরাও করে। রাজনৈতিক বিসমার্ক পর্যন্ত সমাস বানাবার বাই নিয়ে ঠাট্টা করতে কসুর করেননি। 'ড্রগিষ্ট' শব্দটা জর্মনে চলে, কিন্তু তার একটা উৎকট জর্মন সমাস স্বয়ং বিসমার্ক বানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

Gesundheitswiederherstellungsmittelzusammen-mischungverhaeltnisskundiger.

টুকরো টুকরো করলে অর্থ হয়; 'স্বাস্থ্য' 'পুনরায় দান', 'সর্বভৈষজ', 'একসঙ্গে মেশানোর তত্ত্বজ্ঞান'। একুনে হবে 'স্বাস্থ্য-পুনরদাসর্বভৈষজসংমিশ্রণশাস্ত্রজ্ঞ"।

(সমাসটায় কোনো ভুল থেকে গেলে বিদগ্ধ পাঠক বিরক্ত হবেন না—আমার সংস্কৃতজ্ঞান 'নিত্যসা ফতেনা' জাতীয়)।

সংস্কৃত ভাষা সমাস বানানোতে সুপটু, সে-কথা আমরা সবাই জানি এবং প্রয়োজনমতো আমরা সংস্কৃত থেকে সমাস নিই, কিন্তু নূতন সমাস যদি বা আমরা বানাই, তবু কেমন যেন আধুনিক বাঙলায় চালু হ'তে চায় না। 'আলোকচিত্র', 'যাদুকর', 'হাওয়া-গাড়ি' কিছুতেই চললো না—ইংরেজী কথাগুলোই শেষ পর্যন্ত ঠেলা ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে আসন জাঁকিয়ে বসলো। দ্বিজেন্দ্রনাথ নির্মিত automobile কথার

'স্বতশ্চলশকট' সমাসটা চালানোর ভরসা আমরা অবশ্য কোনো কালেই করিনি।

বিশেষ ক'রে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এ-প্রস্তাবটি আমি উত্থাপন করেছি—এবং এতক্ষণ ধ'রে তারই পটভূমিকা নির্মাণ করলুম।

ভাষাকে জোরালো করার জন্য যে অকাতরে বিদেশী শব্দ গ্রহণ করতে হয়, সে-কথা অনেকেই মেনে নেন, কিন্তু আপন ভাষারই দুটো কিংবা তারও বেশি শব্দ একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে যে তৃতীয় শব্দ নির্মাণ ক'রে ভাষার শব্দভাণ্ডার বাড়ানো যায়, সে দিকে সচরাচর কারো খেয়াল যায় না।

এই সমাস বানানোর প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা কোনো কোনো ভাষার নেই। ইংরেজী ফরাসী কেঁদে-কুকিয়ে দৈবাৎ দু একটা সমাস বানাতে পারে—যথা 'হাই-ব্রাও', 'রাঁদেভু'। এ-প্রবৃত্তি যে ভাষার নেই, তার ঘাড়ে এটা জোর ক'রে চাপানো যায় না।

বাংলার আছে, কিন্তু মরমর। এখানে শুদ্ধ সংস্কৃত সমাসের কথা হচ্ছে না—সে তো আমরা নিইই—আমি খাঁটি বাংলা সমাসের কথা ভাবছি। হুতোমের আমলেই অশিক্ষিত বাঙালী খাঁটি বাংলা শব্দ দিয়ে খাসা সমাস বানাতো। মেছুনি ডাকছে, "ও-'গামছা-কাঁধে', দাঁড়া, ঐ হোথায় 'খ্যাংরা গোঁপো' তোর সঙ্গে কথা কইতে চায়।"

একেই বলে সমাস! চট ক'রে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু আজকালকার লেখকেরা এরকম সমাসের দিকে নজর দেন না, নতুন সমাস গড়বার তকলিফ বরদাস্ত করতে তো তাঁরা বিলকুল নারাজ বটেনই। সমাস বানাবার প্রবৃত্তিটা অনাদরে ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে, কারণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকেরা যদি দেশী সমাসকে আপন লেখনে স্থান না দেন, তবে ক্রমে ক্রমে গোটা প্রবৃত্তিটা বেমালুম লোপ পায়—যে-রকম বাউল-ভাটিয়ালী সাহিত্যিকদের কাছে সম্মান পাচ্ছে

না ব'লে ক্রমেই উপে যাচ্ছে—পরে যখন হুঁশ হয় ততদিনে ভাষার লড়াইয়ের একখানা উম্‌দা-সে-উম্‌দা হাতিয়ার অবহেলায় মর্চে ধ'রে শেষ হ'য়ে গেছে। তখন শুধু মাথা-চাপড়ানো আর কান্নাকাটি।

রবীন্দ্রনাথ এ তত্ত্বটা শেষ বয়সে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই শেষ রাতেই ওস্তাদের মার দেখিয়ে গেছেন :

'ডাকছে থাকি থাকি
ঘুমহারা কোন নাম-না-জানা পাখি'

'দক্ষিণের দোলা-লাগা, পাখি-জাগা
বসন্ত প্রভাতে'

তাই বলি বাংলা ভাষা 'লক্ষ্মীছাড়া', 'হতভাগা' নয়। শুধু হাতির মতো আমরা নিজেদের তাগদ জানিনে।

পঞ্চতন্ত্র। আষাঢ় ১৩৫৯॥

কোনো কাজ নেই

প্রবোধকুমার সান্যাল

পলায়ন আমার এক বন্ধুর বইএর নাম।

চারিটি বিভিন্ন অক্ষর, কিন্তু একত্র সম্মিলিত হ'য়ে ওর যে বিশ্বব্যাপী অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে, হৃদয়কে ছোটো ক'রলে তাকে অনুভব করা কঠিন। পলাতক হ'লে ব্যক্তির সংজ্ঞা আসতে পারতো, কিন্তু তা হয়নি—পলায়ন হলো বিস্তৃত জীবনের পটভূমি; সব কাজের শেষে পলায়ন, সকল পরিণামের সর্বশেষ ব্যাখ্যা হলো পলায়ন। পলায়নের পাশেই আছে নির্লেপ, সেই কারণে পলায়ন স্বাস্থ্যকর—সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য ক'রে অস্বীকার ক'রে পালানো। দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়ানো, সত্যের চেহারাকে নির্ভুল বিশ্লেষণ করা। যে জীবন দাঁড়িয়ে উঠেছে সংশয় আর নৈরাশ্যে, যার ভিত্তিতে দুঃখবাদ, যার পরিচালনায় দুর্ভোগ,—সেই জীবনকে নির্দয় নির্লিপ্ততায় বিচার ক'রে চলা,—তাকেই পলায়ন বলতে পারি। বইখানা খুলে দেখি ওর মধ্যে আর যাই থাক, ঘর ছেড়ে পালানো কিংবা কলেজ ভেঙে পালানো নেই। দেখে খুশি হলুম।

পালাবার সাধ কারো কম নয়। কেরানীর বউ যেমন সব কাজের শেষে পালায় ছাদে, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীও পালান উইক-এণ্ডে। যে সব স্বামীজিরা আমাদের কর্মজীবন সম্বন্ধে উপদেশ দেন তাঁরা এক একটি উঁচুদরের পলাতক। কারণ, ভগবানকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়া একটা পলায়ন। এর কারণ অস্পষ্ট নয়। আমার চারিদিকে যা আছে তাই নিয়ে আমি খুশি নই, সুখী নই। এদের ফাঁস কাটিয়ে আরো কিছুর জন্যে আমি বেরিয়ে পড়ি। নরওয়ের সাহিত্যে একটা গল্প আছে,—নায়ক বহুধা বিভক্ত হ'তে চাইছে। একই মানুষ বহুরূপে প্রকাশ করছে নিজেকে। কখনো ভবঘুরে, কখনো ভিনদেশী, কখনো দর্জি, কখনো ছদ্মবেশী সমাজসেবক। তার সুখ নেই, স্বস্তি নেই।

যেটা গ্রহণীয় সেটাতেই তার বিরক্তি। অর্থাৎ হাতে যা আসছে, তাই সে নেড়ে-চেড়ে ফেলে দেয়। আবদার ধ'রে বসে, এটা নেবো না, ওটা নেবো। কত খেলনা আছে সংসারে কিন্তু তার মন ভোলানো গেল না। সে একটার থেকে আর একটায় টপকে যেতে চায়, পালাতে চায় জানা থেকে অজানায়। পলায়ন তার মজ্জাগত। সে এক, কিন্তু সে বহু।

আমি তো দেখি বিপুল পলায়নের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি কেবল স্থির, ধ্রুব। পৃথিবী বারে বারে পালাচ্ছে সূর্যকে ছেড়ে, চন্দ্র বারে বারে পালায় পৃথিবীকে ছেড়ে। জল পালিয়ে যায় মেঘলোকে, মানুষ পালায় দেহ অতিক্রম ক'রে। আর পশুপক্ষী? ওরা তো চিরন্তন ছুটছে,—কোথাও থেমে নেই। বীজের ভিতর প্রাণকোষ অস্থির, গর্ভের ভিতরকার শিশু মুক্তি পাওয়ার জন্য ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল। চোখ চেয়ে দেখি বিশ্বপ্রকৃতির চোখে পলক পড়ে না, পর্দা উলটিয়ে দেখি, পালাবার জন্য তার অস্থির ব্যস্ততা। পাহাড়কে দেখছি—স্থাণু চির-কাল, কিন্তু দুরন্ত প্রাণধারায় সে উদ্দাম।

প্রাণ এবং পলায়ন—এই দুইয়ের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। আশ্বিনের নতুন চক্‌চকে আকাশ বেতারযোগে প্রাণকে খবর পাঠালো, পালাও। অমনি কনসেসন টিকিটে ছুটলো চাকুরের দল, ছুটলো ট্রেন, ছুটলো মন। গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, আগ্রা, দিল্লী। শৃঙ্খল ছিঁড়ে পাখির দল পালালো অজানায়। শরীর সারাতে নয়, মন সারাতে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে চললো একটা থেকে আর একটায়; যেখানেই যায় সেখান থেকেই পালায়। অবিরাম, অশ্রান্ত ঔৎসুক্য। এর নাম পলায়ন।

ঠিক মনে নেই, বোধহয় হর্দৈ স্টেশন। পৌষের গভীর রাত। ওয়েটিং রুমে ঘুমোচ্ছিলাম। যুক্তপ্রদেশের উত্তর ভাগের শীতে আড়ষ্ট শরীর। একখানা ট্রেন এসে থামতেই সহসা নারীকণ্ঠের কান্নার শব্দ এলো। প্লাটফরমে বেরিয়ে এলাম। রাত্রির জনবিরল স্টেশন।

দেখি, তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায় একটি বর্ষীয়সী স্থূলকায়া স্ত্রীলোক ওলোট পালট খেয়ে গগনবিদারী চীৎকার তুলেছে, আর একটি স্ত্রীলোক নীরবে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তুজনেই দক্ষিণী, হরিদ্বারের ফেরত। খবর নিয়ে জানা গেল, আগের কোন এক স্টেশনে তার ছেলেটি গাড়ি থেকে নেমেছিলো কৌতূহলে, কিন্তু আর ওঠেনি। বিস্ময়ের কথা এই, যে চীৎকার করছে, ছেলেটি তার সন্তান নয়; যে সান্ত্বনা দিচ্ছে সেই স্ত্রীলোকটিই পলাতকের জননী। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ছেলেটি গেল কোথায়? সে নেমেছিলো গাড়ি ছেড়ে, আর ওঠেনি। অজানা দেশের অন্ধকারে কোন ঔৎসুক্য তাকে আকর্ষণ করেছে? শীত গ্রাহ্য করেনি, শৃঙ্খল মানেনি, ট্রেনের নিয়মতন্ত্রকে সে অস্বীকার করেছে—তার মন ছুটে গেছে পলায়নে। পলায়ন শব্দটা পুরুষের রক্তপ্রবাহে ভেসে বেড়ায়।

অসামাজিক মনোবৃত্তি তোমার আমার ওদের তাদের সকলের মজ্জাগত। অনেক কাল লোকসমাজে বাস ক'রে ক'রে তুমি ক্লান্ত, তুমি চাইলে স্বস্তি, তুমি চাইলে তোমার সর্বাঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে কিছুকালের মুক্তি নিয়ে পালাতে। তুমি গেলে কোনো নির্জন পাহাড়ে অধিত্যকায়, কোনো খরবাহিনী নির্ঝরিণী তীরে, আমি গেলুম বেণুবনচ্ছায়াময় নিভৃত পল্লীর ধারে। মজ্জাগত অসামাজিক আমাদের মন। লোকনিন্দার শাসনে আর লোকচক্ষুর লজ্জায় আমরা নিয়ম-শৃঙ্খলাকে মানি, কিন্তু সুযোগ পেলেই প্রকাশ করি সেই আদিম স্বাধীন বৃত্তিকে।

* * * *

কিন্তু পলায়ন কাকে বলবো?

কলেজ পালিয়ে ছাত্ররা যায় বনভোজনে, কেরানী অপিস পালায়, তরুণী ঘর ছেড়ে পালায় যুবকের কোঁচার খুঁট ধ'রে। রাষ্ট্রবিপ্লবে জনসাধারণ পালায় রাজধানী ছেড়ে, দরিদ্র আত্মহত্যা ক'রে দারিদ্র্য থেকে পালায়, কয়েদী পালায় জেল থেকে, বাপের শাসন থেকে ছেলে

পালায়, স্ত্রীর উৎপীড়ন থেকে মুক্তি নিয়ে পালায় নির্বোধ স্বামী। কিন্তু পলায়ন কোনটা ?

মুসৌরী পাহাড় পেরিয়ে কেম্‌টি জলপ্রপাতের পথে নিজের মনে চলেছি। হেমন্তকালের মধ্যাহ্নরৌদ্রে আকাশ আর মেঘ ঝলমল করছে। দূরে 'ক্যামেল্‌স ব্যাক্‌' ধীরে ধীরে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। উত্তর দিকে দিগন্ত-সীমানার সীমানায় চিরতুষার-শুভ্র হিমালয়-কিরীট। এদিকে ম্যালের পথ কেম্‌টির বাঁকে এসে নীচের দিকে নামতে লাগলো।

অন্তর্নিহিত মুক্তির আর স্বাধীনতার পিপাসা না থাকলে ভ্রমণ সিদ্ধ নয় ; নিজের দুই পায়ে চলার পথটুকু অতি সংকীর্ণ সবাই জানে, কিন্তু আমার সেই পদচিহ্ন পৃথিবীর সকল পথের সঙ্গে কুটুম্বিতা না করলে পর্যটন সার্থক নয়। তাই ভ্রমণের অপর নাম দিলুম পলায়ন। যা কোনোকালে জানতে পারিনি, আমার বোধের মধ্যে তার চেতনা নেই, চিরকাল ধ'রে দুজ্ঞেয় আর—তার পিছু পিছু ছুটে চলাকে কি বলবো ? ঈশ্বরকে খুঁজতে যারা পথে বিপথে বেরিয়ে পড়ে, যে সিদ্ধার্থ পালায় নিদ্রিতা প্রিয়তমার শয্যা ছেড়ে অন্ধকার রাত্রে, জনজীবনের কল্যাণে যে-টলস্টয় পথে বেরিয়ে পড়ে সর্বস্বান্ত হবার আনন্দে, যে-দুঃসাহসী অভিযান করে দক্ষিণ মেরুপথে, শ্রাবণের দুর্যোগে যে চিররাধিকা চিরধনশ্যামের উদ্দেশে অভিসার যাত্রা করে, তাকে কি বলবো ?

অসন্তোষ আর জিজ্ঞাসা, পলায়নের মূলমন্ত্র। অল্পে সুখ নেই, বহু বিদ্যায় তৃপ্তি নেই—এমন মানুষ যখন বেরিয়ে পড়ে বড়ো কিছুর জন্যে, মহৎ কিছুর আশায়, তখন বুঝতে পারি মানুষের মানে। অসাধারণ তার প্রতিভা যে পালাতে জানে ; অসামান্য তার শক্তি, যে হারাতে জানে।

মুসৌরী পেরিয়ে কেম্‌টির পথে যেতে যেতে এই কথাই ভাবছিলুম।

মনে মনে। শ্রাবণ ১৩৪৮ ॥

স্বাক্ষর-শিকার

শিবরাম চক্রবর্তী

বাসায় ফিরে একটি খাতা টেবিলের ওপরে পেলাম। কে নাকি আমার জন্যে রেখে গেছেন! কে তিনি আবিষ্কার করা খুব কঠিন হলো না— খাতার প্রথম পাতাতেই লেখা: "তীর্থরেণু: সংগ্রাহক, Aditya Kumar Mukherjee alias Badal" এবং তারপরে, দক্ষিণ ব্যাঁটরার একটা ঠিকানা।

এই 'ওরফে বাদলকে' আমি চিনিনে. কিন্তু না চিনলেও, ছেলে-পিলেদের কেউ যে, তা বোঝা খুব কঠিন নয়। কেননা, খাতাখানি অটোগ্রাফের!

বেশ মোটা-সোটা এক্সারসাইজের খাতা। গোড়ার দিকের এক সার, সই আর টিপ্পনিতে টইটম্বুর দেখা গেল—কিন্তু বেশিরভাগ পাতাই সাদা। আঁচড় পড়েনি এখনো। এই বাজারে এতগুলি সাদা পাতা একত্র দেখলে লোভ হয়।

আমার উদ্দেশ্যে কেন যে এটিকে রেখে যাওয়া হয়েছে বুঝলাম না ঠিক। খাতার মালিক নিশ্চয়ই এটা আমাকে উৎসর্গ ক'রে যাননি। আকস্মিক বৈরাগ্যে, বইয়ের প্রতি রাগে, যদিবা সেই-দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, দয়া ক'রে দাতব্য ক'রে গিয়ে থাকেন আমায়, তাহলে এর সাদা পাতা-গুলোয় চমৎকার চিঠি লেখা চলবে, আর—, আর লেখাগুলোর পাতায় বেশ দাড়ি কামানো যায়। অনেকে স্বাক্ষরের উপরে বেশ বড়ো বড়ো কথা লিখেছেন দেখলাম। বড়ো বড়ো কথা আর ভালো ভালো কথা। বড়ো ভালোকথা। এই সব উদাত্ত বাণী চোখের সামনে রেখে, যুদ্ধ-ঘটিত এই দুঃসময়ে দাড়ি কামাতে বসলে ভোঁতা ব্লেডেও অনেকখানি প্রেরণা পাওয়া যাবে আমি আশা করি।

সংগ্রাহকের প্রথম সংগ্রহই শ্রীগীতা থেকে:

"কর্মই জীবন, কর্মই পুরস্কার, নিষ্কর্মা জীবন মৃত্যুর নামান্তর মাত্র—
(গীতা)।"

এবং সংগ্রহ হচ্ছে কর্মের প্রকারান্তর। এবং কিছুটা গ্রহও বই কি! গ্রহণকর্ম আর কর্মভোগ একাধারে!

অন্যান্য বাক্যও, কারু চেয়ে কেউ বড়ো কম যায় না। যথা: সজনীকান্ত দাস লিখেছেন—

"প্রশস্ত ললাটে মোর নিজ হস্তে রচি জয়টীকা,
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাহত তরণীর আমি কর্ণধার;
অধোমুখী কভু নহে তিমিরে প্রদীপ্ত দীপশিখা,
নিজেরে যে করে নতি সে লভে সবার নমস্কার।"

এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়:

"সৃষ্টি হ'তে এত হিংসা এত দ্বন্দ্ব এত হানাহানি
মানুষ করেনি ধ্বংস—মানুষের জয় হবে জানি।"

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা:

"এত ঝড় জল মেঘ যায়,
আকাশ কি কিছু মনে রাখে?

এবং ঠিক তার তলাতেই আনুষঙ্গিক আরেকজন কার কথামৃত:

"আমাদের এঁদো রাস্তায়
শুধু হায় কাদা জমে থাকে।"

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের চাঞ্চল্য:

"যেই সূর্য—সেই আলো, সেই সূর্য—তার আলো—" (আর তারপরেই ডট্-ডট্-ডট্… !) নিছক ডট্‌কার!

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি:

"সমগ্র জীবনের পাতে যদি নাম লেখা না থাকে, তবে শুধু অটোগ্রাফে লাভ কি, একথা আমি বুঝি না।"

আমি বুঝবার চেষ্টা করি, কিন্তু এই আনন্দদায়ক বিবেকবাণী ভালো ক'রে আত্মসাৎ না করতেই দেখি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন:

"মানুষ একবারই জীবন-যাপনের সুবিধা পাইয়া থাকে, কাজেই এই জীবনের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত। অতীতের জন্য বিলাপ বা অনুতাপ না করিয়া বাকি জীবনটুকু ব্যক্তিগত উৎকর্ষ-সাধন ও সামাজিক কল্যাণে নিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

কিন্তু বিলাপ না করলেও শেষ পর্যন্ত যে বিলোপ অনিবার্য একথা ভাবলে দুঃখ হয়!

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেছেন:

"দুঃখ-দৈন্য-অপমান ও ব্যাধি-বিচ্ছেদ-মৃত্যুর করাল কবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে মানুষ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারিয়াছে—'ভগবান আছেন, তোমার ভয় নাই!'—আজ আমি শুধু নিজেকে সেই মানুষের অন্তর্গত জানিয়া গৌরব অনুভব করিতেছি।"

তাঁর বাড়ির কাছের মাঠটা অচিরে আ-কার বদ্‌লে মঠে রূপান্তরিত হবে আশা করা যায়। আগামী সেই অভূতপূর্ব গোচারণের স্থলে তখন যদি আমাদের মতো অভাজনদের জন্যে নিয়মিত মালপোর ব্যবস্থা থাকে তাঁর গৌরবে আমরাও গৌরব অনুভব করতে পারবো। কিন্তু আমাদের পরিমল গোস্বামী মশাই এসব ব্যক্তিগত তত্ত্বের কুজ্ঝটিকাভেদ ক'রে একেবারে সর্বজনিক সমস্যায় নেমে এসেছেন! তিনিও ভগবানকে টেনেছেন, কিন্তু তাঁর টানাটানিটা অন্যরকমের। তাঁর বক্তব্য:

"নিম্নলিখিত ব্যাপারে ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করি—

চাউল এক মণ ৪০৲ কাপড় ধুতি ১ জোড়া ১০৲

চিনি—পাওয়া গেল না। ময়দা—পাওয়া গেল না।

আটা দুসের—তেরো আনা……পথে ক্ষুধার্ত নর-নারীর ভিড়।"

চাউলের চল্লিশ টাকা মণে ভগবানের সব আগে মনোযোগ দেয়া দরকার ব'লে আমার মনে হলো—অবশ্য, ভগবানের মন ব'লে যদি কোনো বালাই থাকে। তবে তাঁর রাজ্যে উল্লিখিত ওরকম দামী ধুতির জোড়া মেলে না একথা আমি মানবো না, সম্প্রতি তেরো টাকায়

একখানা আমাকেই কিনতে হয়েছে। চিনি, আমার বরাতে, পাওয়া যায় বটে, কিন্তু চেনা যায় না। তবে তেরো আনায় ভুসের আটা কোথায় পাওয়া যাচ্ছে, পরিমলবাবুপ্রসাদাৎ জানতে পেলে, পথের ক্ষুধার্ত নরনারীর ভিড় একযোগে (ভিড়ে আরো ১ যোগ করে) আমিও বাড়াতে প্রস্তুত ছিলাম।

শিল্পী শৈল চক্রবর্তী কিছু লেখেননি, হাতিমার্কা এক ছবি এঁকে ছেড়ে দিয়েছেন। ছবির দ্বারাই এক হাত নিয়েছেন। হাতিটা সই করতে পারার আনন্দে চার পা তুলে নাচছে, না, তার ভয়ে চোঁ চোঁ পালাচ্ছে, নাকি, অটোগ্রাফের খাতায় নিজের কেরামতি দেখিয়ে দেবার জন্যেই শুঁড় বাড়িয়েছে—বোঝা দায়!

ভাবলাম, এতগুলি স্বর্ণাক্ষরের পাশে, আর শ্রীশৈলর এই বিচিত্রনের এক কোণে, অলংকৃত সোনার যেমন বানি লাগে, তেমনি আমারও একটুখানি কোনোখানে লাগিয়ে রাখি। কিন্তু আমার বাণী, শোনার অনুপযুক্ত হয়তো না হ'লেও, চেপে যাওয়াই শ্রেয়ঃ বোধ করলাম। ভূতের বোঝা আরো বাড়িয়ে কী লাভ?

সত্যি বলতে, ছেলেদের স্বাক্ষর কুড়ানোর আমি বিরুদ্ধে। ছেলেরা Hero-Worshipper হবে এটা আমি চাইনে। আমাদের দেশে হিরোওয়ারশিপিং-এর কোথায় যেন গলদ আছে—মনোভাবের থেকে এখানে নতুন হিরোর সৃষ্টি হয় না; Zeroদের সংখ্যাই বেড়ে যায় কেবল। তাছাড়া, হিরোই বা কে? ছেলেদের কাছে হিরো কে আবার? বৃহৎ বটের অপেক্ষা বটের চারা তো ছোটো নয়—বিরাট বটেরই সগোত্র সে—সময়ের আপেক্ষিকতায় উভয়েই সমান। নিজের ভাবনার সহযোগে আর সম্ভাবনার যোগে—প্রত্যেক ছেলেই—অতীতের এবং বর্তমানের সকল বৃহৎ আর মহতের সমকক্ষ। নিজের কক্ষচ্যুত হ'য়ে, কক্ষে কক্ষে ঘুরে, অপরের স্বাক্ষর কুড়ানোর এ দুর্দশা কেন তার?

তবু স্বাক্ষর যদি আত্মসাৎ করতেই হয়, মেয়েরা করবে। মেয়েদেরই এই কাজ। সত্যি নয় একথা মনে মনে জানলেও, কোনো মেয়ের

কাছে আমি যে হিরো, একথা ভাবতে ভালো লাগে। তাছাড়া, কবিদের কত ভালো ভালো বচন, কত না প্রবচন রয়েছে—মেয়েলি অটোগ্রাফের খাতায় পুনরুদ্ধার করবার মতো। যেমন, এই ধরুন না,—

"সমাজ সংসার মিছে সব—
মিছে এ জীবনের কলরব·········"

কী ইঙ্গিতপূর্ণ এই দুই পংক্তি! তেমন তেমন খাতা পেলে তক্ষুনি তক্ষুনিই উৎরে দেয়া যায়। অক্লেশেই! কিন্তু এ কি কোনো ছেলের অটোগ্রাফের খাতায় উপস্থিত করা চলে?

কিংবা মনে করুন, 'আমারে যে ডাক দিবে এ জীবনে তারে বারংবার ফিরেছি ডাকিয়া' ইত্যাদি! এই সব মর্মভেদী হাঁকডাক কি যেখানে সেখানে ছাড়বার মতো? ছড়াবার মতোন?

বড়ো জোর কোনো ছেলের খাতায় এই 'অচিন্ত্যনীয়' বাক্য তুলে দেওয়া যায়ঃ

"কল্পনার শেষ চূড়া
স্পর্শ করা যায়
আছে কি তেমন স্পর্ধা
তব কল্পনায়?
কল্পনার যেই শৃঙ্গে
বাঁধো তুমি ঘর,
তারো উর্ধ্বে আছে জেনো
উত্তুঙ্গ শিখর।"

বড়ো জোর এই। ছেলেপিলেদের ধরেবেঁধে উচ্চাকাঙ্ক্ষার অসীমে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসো। ব্যস্! তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যের চূড়ান্ত করা হলো, এছাড়া আর কী করবার আছে?

কিন্তু মেয়েদের বেলায় ছাড়পত্র অত সহজ নয়—উভয় পক্ষেই। কোন কবি একথা লিখেছিলেন?—

"পা-দুখানি কাছে আনো মনোহারিকে,
চুম্বনে দেব তাতে কবিতা লিখে।"

যিনিই লিখুন এমন কথা খুশি হয়ে আমি লিখতে পারতুম। ভেবে ভেবে দেখলে, সেই অটোগ্রাফের খাতাও যেমন সুন্দর, আর এরূপ সই করবার কায়দাটিও কেমন চমৎকার! দুইই নিখুঁত!

অতএব নিখুঁত ভাবে ভেবে দেখলে, কেবল মেয়েরাই স্বাক্ষরশিকার করবে। অকুতোভয়েই তারা করতে পারে—তাঁদের Zero-য় দাঁড়াবার সম্ভাবনা অতি বিরল, হিরোদের ওয়ারশিপার হওয়া তাদের ধাতে নেই—উক্ত হিরোদের নিজের ওয়ারশিপাররূপে না পেলে অন্ততঃ। তাঁদের বেলা এটা যেমন স্বাক্ষর-শিকার, তেমনি স্বাক্ষরকারীকেও শিকার। দেবতার লীলাও বলতে পারেন, দেবীর ছলনাও বলা যায়।

কিন্তু মেয়েদের বেলায় যেটা কেবল লীলা, নিছক Sport—ছেলেদের বেলা সেই কর্মই মৃত্যুদায়ক। এই শ্রীমান বাদলের উচিত ছিলো সজনী দাস অবধি এগিয়ে, তাঁর বাক্য থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে সেইখানে ক্ষান্ত হ'য়ে নিজেকে সেলাম করতে করতে ফিরে আসা। 'যে করে নিজেরে নতি সে লভে সবার নমস্কার'—মকরধ্বজের মতো সর্বরোগহর ক্লৈব্যঘাতক এমন কাব্য, গীতায় শ্রীভগবানের সেই বিখ্যাত ধনঞ্জয়-প্রহারের পরে আর দেখা যায় নি!

ছেলেদের মধ্যে যারা স্বাক্ষর-বিলাসী তাদের জন্যে সজনী দাসের ঐ স্বীকারোক্তিই মোক্ষম। তারা নিজেরা স্বাক্ষর করুক—অপর কারো অটোগ্রাফের খাতায় নয়—নিজের জীবনে এবং নিজেদের কীর্তিতে। তাদের বাক্য আর ব্যবহারে—মনে আর চিন্তায়—জ্বলজ্বল করুক সেই সাক্ষর লেখা!

তবে মেয়েদের বেলা সজনীবাবুর ওই কথা খাটে না। মেয়েরা নিজেদের নতি করতে চায় না—ওই নামমাত্র কসরতের জন্যে তাদের জন্ম নয়—অত অল্পে তাদের তুষ্টি নেই—তারা অপরকে নত করতে ইচ্ছুক। এবং যদ্দূর জানা গেছে নিজের সগোত্রাদের নয়,

ছেলেদেরকেই। অতএব তাঁরা স্বাক্ষর জড়ো করুন—যতো খুশি—আপত্তি নেই। যে-বেচারীর স্বাক্ষর তাঁরা নেবেন, অগোচরে অদৃশ্য-অক্ষরে নিজের স্বাক্ষরও তার ওপরে সই ক'রে আসবেন তা নিঃসন্দেহ। স্বাক্ষর নেয়া নয়, ও হচ্ছে তাঁদের রাজকর নেয়া। এক ধাক্কায় রাজসূয় এবং অশ্বমেধ—দু-দুটো যজ্ঞ! কেবল তাঁদেরই যোগ্য—একথা অবশ্য-শিকার্য।

আমার লেখা। ভাদ্র ১৩৫৫ ॥

কড়া

জ্যোতির্ময় রায়

পাঠক হয়তো নামটাকে পড়েছেন সে-উচ্চারণে যাতে 'কটু' বা 'শক্ত' অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু আমার বক্তব্য বিশেষণ নিয়ে নয়, বিশেষ্য নিয়ে। লেখায় সেটা স্পষ্ট করবার ব্যবস্থা নেই—অতএব নরম 'ক'-এর উপর একটু চাপ দিয়ে বস্তুটিকে দরজার বক্ষলগ্ন ক'রে নেবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

দরজার কড়ার মধ্যেও বিশেষ ক'রে সদর দরজার কড়া-ই আমার আলোচ্য বিষয়। যে কড়া-যুগল অনির্দিষ্ট মিলনের আশায় অক্লান্ত আলস্যে দরজার গায়ে ঝুলে থাকে না। দরজায় কড়ার অবস্থানের একমাত্র কারণ অবশ্য যুগ্ম প্রচেষ্টায় তালাকে ধ'রে রাখা। কিন্তু সদর দরজার কড়াকে তার অবসর সময়টায় এমন একটা কাজে লাগিয়ে দেওয়া হলো যার তলায় তার জীবনের মুখ্য কর্তব্যটাই পড়লো চাপা। এখন কড়ার সঙ্গে 'নাড়া-র' যোগটাই ঘনিষ্ঠ, তালার আত্মীয়তা সেখানে তলিয়ে গেছে। গৌণের এ গুণ বিরল নয়। 'ফুডিং-লজিং'-ওলা শিক্ষকের দীর্ঘ অবসরকে কাজে লাগানোর ফলে একদিন দেখা যায় ছাত্রের মনের খোরাক জোগানোর চেয়ে পরিবারের পেটের খোরাক কেনাকাটিতেই নির্ভর করছে তার সত্তার সার্থকতা। ফায়ার-ব্রিগেডের অখণ্ড অবসরভোগী ফায়ারম্যানদের দেখলে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের চেয়ে ব্র্যাসো মর্দনে দক্ষতার কথাটাই স্মরণ হয় আগে। বস্তুজগতেও এমন আরো জিনিস আছে যার জন্মের উদ্দেশ্য এক, জীবনের ব্যবহারিক দিক অন্য। যেমন শার্ট বা পাঞ্জাবির বুক-পকেটে ঘড়ির ঘর। ঘড়ি কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে কবে। ক্যাঙারুর বাচ্চার মতো যাকে বুকের থলেয় বয়ে বেড়াতে হতো সে এখন বানর-বাচ্চার মতো আঁকড়ে থাকে হাতের কবজি। জামার জীবন তো দূরের কথা, মালিকের জীবনেও সে আর ঘরে ফিরবে না, তবু বিংশ শতাব্দীর বুকে

বুকে তার জন্যে ঘর তৈরি হচ্ছে এবং সেখানে মহানন্দে বসবাস ক'রে যাচ্ছে নোট আর রসিদ। অতএব দেখা যাচ্ছে কড়ার ব্যাপারে এটা নতুন কিছু নয়— এমন হ'য়ে থাকে।

ঘাসের উপরকার আবছা পায়ের চিহ্ন অবলম্বনে বিনা চেষ্টায় যেমন একটি স্পষ্ট পথ গ'ড়ে ওঠে, তেমনি দুটো কড়ার মধ্যে একটি আপনা থেকেই নির্বাচিত হ'য়ে যায় নাড়ার জন্যে। তার কাজ হচ্ছে কেউ এলে অন্দরে তার আগমন ঘোষণা করা। বিশেষ ক'রে কলকাতায় কোনো বাড়ির সদর দরজায় কড়া না থাকলে মেজাজ রীতিমতো খারাপ হ'য়ে ওঠে। উপস্থিতি ঘোষণা করা একটা সমস্যায় দাঁড়িয়ে যায়। সাহেবী কেতায় টোকা দেওয়া চলতে পারে বেড-রুমের দরজায়। দস্তুরমতো পালোয়ানী আঙুল না হ'লে সদর দরজার আন্দাজ টোকা মারা সম্ভব নয়। দুব্-দুব্ ক'রে থাব্ড়া দিয়েও নিশ্চিত বা তৃপ্ত হওয়া যায় না। মনে হয় চার পা গিয়েই শব্দটা থপ্ ক'রে ব'সে পড়বে। দ্বারভাঙ্গা থাব্ড়া মারতে সংকোচ হয়—ভয়ও হয়, এক বাড়ির লোক ডাকতে গিয়ে পাড়াশুদ্ধ লোক জড়ো করবো। কিন্তু কড়া যত জোরে যত খুশি নাড়ো, আশপাশের লোক ত্যক্ত হ'তে পারে কিন্তু ছুটে আসবে না।

সামান্য একটা কড়ার অভাবে কতটা অসুবিধায় পড়তে হয় দেখুন। মেজরাফ ছাড়া সেতারের মতো দরজাটা হাতের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে— মুখের ডাক হাতে ফুটিয়ে তুলবার উপায় থাকে না। শেকল থাকলে কাজটা একরকম চালানো যায় বটে, কিন্তু আধুনিক দরজার কপাল থেকে এই লৌহ-অলক উঠেই গেছে। থাকলেও ও দিয়ে শুধু মিঠে আওয়াজ করা-ই চলে। তা ছাড়া কড়ার মতো হাতের সহজ নাগালের মধ্যেও থাকে না।

আধুনিক অনেক বাড়িতে বসানো বিজলি-বোতাম। তাঁরা হয়তো আমার এসব কথা প'ড়ে হাসছেন। তা হাসুন। আমি কিন্তু জোর ক'রেই বলবো, কড়ার সঙ্গে ডাক-ঘণ্টার কোনো তুলনাই চলতে পারে

না। কোনো বড়ো বাড়ির বিজলি-বোতাম হয়তো টিপ দিলাম, কোনো শব্দই কানে এলো না। কান পেতে আরো গোটা দুই লম্বা টিপ দেওয়া গেল, কিন্তু বোঝা গেল না ঘন্টি কাজ করছে, না বিগড়েছে। জবাব পেতে একটু দেরি হ'লে নিরাশ হ'য়ে আর একটা টিপ মারা ছাড়া উপায় থাকে না। এদিকে আমি যখন ডাকতে না পারার অস্বস্তিতে উসখুস করছি, ব্যস্ত ভৃত্য তখন হয়তো অতি-ডাকার দরুন অতি-ত্যক্ত হ'য়ে দড়াম ক'রে দড়জা খুলে দাঁড়ালো—ঘন-ঘন্টির বিরক্তি তার চোখে মুখে। কতটা ডাকলাম তার ওজন বুঝতে না পারলে ডেকে সুখ হয় না, এবং ওজন ঠিক থাকে না ব'লে অপর পক্ষও যায় চ'টে। অবশ্য এমন বাড়িও আছে যার বোতাম টিপলে ঘন্টি বেশ স্পষ্টই শুনতে পাওয়া যায়। সেখানে ওরকম অসুবিধায় পড়তে হয় না বটে, তবু কড়ার সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে না। ডাক-ঘন্টির বৈচিত্র্যহীন ডাকে যন্ত্রের প্রাণশূন্যতা—সে শুধু ঘোষণা করে, বলে না কিছুই; কড়ার শব্দে ভাষা নেই, কিন্তু ভাব আছে। সে কেবল ডাকে না, বলেও অনেক। ডাক-ঘন্টিকে যদি বলি সংবাদপত্র, কড়াকে বলবো সাহিত্য।

কথাটা যাদের কাছে প্রমাণ-সাপেক্ষ তাদের নজির টেনে কিছুটা আভাস দেবার চেষ্টা করবো। আমার পাশের বাড়িতেই থাকে মস্ত একটি যৌথ পরিবার। দিনের ভিতর একশো বার তার কড়া খট্‌খট ক'রে ন'ড়ে উঠছে। সে-নড়ার বৈচিত্র্য ও মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করবার মতো। সাড়ে চারটে বাজতেই কড়াটা ছন্দোহীন দুরন্ত বেগে তার আংটার মধ্যে নেচে ওঠে। বাড়ির গিন্নী অমনি হেঁকে ওঠেন, 'অ-ঝি, মণ্টু এসেছে, দরজা খুলে দাও'। নড়ার সেই চপলতা ও দুরন্তপনার মধ্যেই মা পান তাঁর মণ্টুকে। কর্তা এসে কড়া নাড়েন, খট্—খট্ খট্। ভারি মন্থর তার চাল, শব্দের মধ্যে তাঁর কর্তৃত্বের দৃঢ়তা ও আস্থা—শব্দই যেন বলছে, এটুকু কানে গেলে যে যত ব্যস্তই থাক, ছুটে আসবে। কখনো শুনি কড়াটা নড়ছে ভারি কুণ্ঠিত ভাবে। শব্দ

করতে সে যেন সাহস পাচ্ছে না, আবার না করেও উপায় নেই। এই কড়ার শব্দ থেকে লোকটির খোঁজ নিয়েছিলাম—দূর আত্মীয়, এ বাড়িতে থেকে চাকরির চেষ্টায় আছে। আমার জানলা দিয়ে বাড়ির অনেকটাই বেশ দেখা যায়। কড়ার আর একটি নড়ন শুনে লক্ষ্য না করে পারিনি। খুট্-খুট্-খুট্ খট্ বা খট্ খুট্ খুট্—আস্তের উপর বেশ ছন্দ রেখে নড়ে। এমন ভাবে নড়ে যেন এ-শব্দটুকু শোনবার জন্যে কেউ কান পেতে ব'সে আছে। হঠাৎ একদিন নজরে পড়লো ঐ নড়ার সঙ্গে বাড়ির ইস্কুলে-পড়া মেয়েটিও বেশ নড়েচড়ে ওঠে—বাকিটুকু বোঝা কিছু কঠিন কথা নয়। বাড়ির বড়ো ছেলেটির এক একদিন তাস খেলে বা আড্ডা দিয়ে ফিরতে বেশ রাত হয়। সেদিন কড়াটাকে মুঠো ক'রে ধ'রে এমন একটি চাপা খুট-খুট আওয়াজ সে করে যাতে পাড়ার লোক তো দূরের কথা, বাড়ির কর্তারও ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। সে-শব্দ চুপি চুপি পৌঁছোয় শুধু তার বিনিদ্র বধূর কানে।

বিজলি-ঘন্টার ঘোষণায় এ পরিচয়, এ বৈচিত্র্য থাকে না—থাকতে পারে না। আমি বলবো কড়ার খুট্-খুট্ শব্দে যাঁরা ত্যক্ত হন, তাঁরা কান নেই বলেই হন—এবং কড়াকে বাতিল ক'রে সদর দরজায় বসান কলের ঘন্টি।

দৃষ্টিকোণ। ভাদ্র ১৩৪৮ ॥

দাঁত

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দাঁতের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ সেটা শুধু দৈহিক নয়, আন্তরিকও বটে। দাঁতের সঙ্গে মাড়ির, মাড়ির সঙ্গে চোয়ালের, চোয়ালের সঙ্গে চিবুকের গঠন আর তার সঙ্গে চরিত্রের দৃঢ়তা, এইভাবে টেনে নিয়ে গেলে দেখা যাবে যে দন্তমূল ব্যক্তিত্বের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছেছে। সে হিসাবে মানুষের সমস্ত অবয়বের পিছনেই একটা চারিত্রিক বিকাশের অবকাশ ও উদ্দেশ্য আছে, নিছক শরীর সংস্থানের জন্যই হাত পা গুলো নড়ে না। সে নড়ার পিছনে আছে একটা ব্যঞ্জনা কিংবা একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি যেটা মানুষের হাবভাব প্রকাশে সাহায্য করে।

ডিম্বাকৃতি সুডৌল মুখের ছাঁচ, দীর্ঘায়ত চোখ, পেলব আঙুল দেখলে আমরা চট ক'রে আন্দাজ ক'রে নিই— এ-গুলির অধিকারী আর্টিষ্টিক মেজাজের লোক। বেঁটে কালো এবং কোঁকড়া চুল দেখলে তেমনি আবার অকারণ একটা কুটিলতার সন্দেহ জাগে মনে। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র যাঁরা বেঁধেছিলেন অথবা কামসূত্রের প্রাথমিক তথ্যগুলি যে সব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট করেছিলেন, তাঁরা মানুষ আর মানুষের শরীরটাকে ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, এ কথা নিশ্চিত। দ্বাদশ রাশির সাধারণ বর্ণনা অথবা শশ-গজ-হয়-বৃষ এবং পদ্মিনী হস্তিনী প্রভৃতি নর-নারীর লক্ষণ-নিরূপণ এইভাবেই হয়েছিলো।

দাঁত জিনিসটা মোটেই তুচ্ছ নয়। এর যথাযথ রূপ বর্ণনা জানবার যদি আপনার আগ্রহ থাকে, তা হ'লে সংস্কৃত সাহিত্য খুলুন। সেখানে দন্ত-কৌমুদীর অজস্র প্রশংসাসূচক বর্ণনা পাবেন। ব্যাকরণের মধ্যে দাঁত ঢোকানো সাধারণের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু স্ত্রী-প্রত্যয়ের অধ্যায় খুললেই দেখবেন, সেখানেও দাঁত ঢুকছে, যথা— 'গজদন্ত' 'সুদতী'। সংস্কৃত সাহিত্যে অথবা প্রাক-রবীন্দ্র যুগের বাংলা সাহিত্যে দন্তশোভা খানিকটা গতানুগতিক ভাবেই বর্ণিত হয়েছে, দাঁতের

শোভা না দেখালে যেন সমস্ত মুখমণ্ডলের বর্ণনাটাই নিরর্থক হ'য়ে যায়। এর চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে নৈষধের সপ্তম সর্গে। সেখানে মাত্র দশটি শ্লোকে দময়ন্তীর বিম্বাধর ও কুন্দদন্তের সৌন্দর্য চিত্রিত হয়েছে। বাংলার কবিকুল—মাইকেল, বঙ্কিম, হেম, নবীন—কেউই দাঁতকে অবহেলা করেন নি, তা আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অপরূপ, মধুর ভাষায় ব'লে গেছেন, তাকেই নাকি হাসি মানায়—'মাধুরী ঝরে যার হাসিতে।'

কিন্তু দন্তহীনতার শোভা অথবা দাঁতের যন্ত্রণা নিয়ে কি কোনো কাব্য-সাহিত্য রচনা করা হয়েছে? ইংরেজী সাহিত্যে অবশ্য এ দুটোরই নজির আছে। দন্তহীনা বৃদ্ধার স্নিগ্ধ হাসি ও মুখসৌন্দর্যের ওপর কবিতা পড়েছি আর ইংরেজী উপন্যাসে বহু জায়গায় দেখেছি সাধারণ ভদ্রলোক দুটি ব্যক্তিকে যমের মতোন ভয় করে—একটি হলেন শাশুড়ী, অপরটি ডেনটিষ্ট।

সাদা ধবধবে দাঁত যেমন নয়নাভিরাম আর সুগঠিত সৌন্দর্য যেমন শোভন ও মধুর, তেমনি সাদা দাঁতের সঙ্গে একটা পাশবিক উল্লাস কিংবা বর্বরতার ছোঁয়াচও আছে। আদিম মানুষ যখন সিদ্ধ-পক্ক মাংস খেতে শেখেনি, খেতো কাঁচা মাংস, তখন এই দাঁতের সজোর আস্ফালনটাই ছিলো বীরত্বের পরিচয়। এখন আমরা সভ্য হয়েছি এবং দংশনের বদলে চুম্বন করতে শিখেছি। কিন্তু এই প্রীতিকামনার পিছনে একটা সুপ্ত জান্তব বৃত্তি রয়ে গেছে, যেটা জেগে ওঠে বিশেষ অবস্থায় অথবা সংকট-মুহূর্তে। তখন মনে হয় যে, বাগে পেলে এবং সুবিধা-সুযোগ থাকলে মানুষ মানুষকে সত্যিই দাঁত দিয়ে কামড়াতে পারে এবং দরকার হ'লে, তার অস্থি-মজ্জা টুকরো টুকরো ক'রে ফেলতে পারে। অতীতে ও বর্তমানে মানুষকে মানুষের এই ছিঁড়ে খাওয়া ব্যাপারটা যে অসাধ্য নয়, তার বহু সাক্ষ্য আছে ইতিহাসের পাতায় এবং আধুনিককালের জগৎ-জোড়া হিংস্রতায়।

কিন্তু রূপকের কথা যাক। সত্যিই কি আমরা দাঁতালো মানুষকে

ভয় করি না, এড়িয়ে চলি না? এক একজন মানুষ দেখেছি এবং দেখবামাত্রই মনে হয়েছে, এতোদিন বাদে 'মিসিং-লিঙ্ক'-এর সন্ধান পেলুম। মুখের ও চোয়ালের গড়নে, দাঁতের পাটির অশোভন ভঙ্গিতে এবং সূচ্যগ্রতায় মনে হয়েছে যে, এ মানুষ গরিলা-সিম্পাঞ্জীরই নিকট আত্মীয়, অসাবধান মূহূর্তে খ্যাঁক ক'রে কামড় বসাতে পিছপাও হবে না। এই সব মানুষের দাঁতের বহর দেখে পদ সৃষ্টি হয়েছিলো শূকরদন্ত, ব্যাঘ্রদন্ত, গজদন্ত ইত্যাদি। জানোয়ারের সঙ্গে এদের শুধু দাঁতেই সাদৃশ্য নয়, আছে কিছুটা মেজাজে ও স্বভাবে। কোনো কোনো মানুষের কশের দাঁত চওড়া, তারা ভালো চিবুতে পারে, কাঁটাকে চূর্ণ ক'রে ফেলতে পারে। চিংড়ির মাথা ও কাঁকড়ার দাঁড়া এদের দন্ত-পেষণে রসার্দ্র হ'য়ে ওঠে। এরা বাঘ ও বিড়ালের মতোই থাবা ভ'রে আহার করে, রসনার লেহনে এদের চরিত্রের স্থূলতার পরিচয়। কেউ বা একটুকরো মাংসের হাড় নিয়ে সেটাকে বাগিয়ে আয়ত্ত ক'রে নিতে বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করে। তাদের খাবার ভঙ্গি ও ধৈর্য দেখলে কুকুরের কথাই মনে আসা স্বাভাবিক। কেউ বা অনন্যমনে গ্রাসের পর গ্রাস গিলতে থাকে, ভালো ক'রে চিবোয় না। তারপর হাঁপাতে থাকে। খাওয়ার পরেই শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে এবং বিশ্রামের প্রয়োজন জরুরী মনে করে। এদের সঙ্গে রোমন্থনকারী গো-জাতির সাদৃশ্য আছে, এরা কেমন যেন ভীরু, অসহায় ও উদর-সর্বস্ব। কোনো কোনো মানুষের দু পাশের দুটো দাঁত উঁচু। খাবার সময় তারা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে শব্দ করে, খুঁত ধরে, এটা-ওটা সরিয়ে দিয়ে নিজের রুচিমত সামগ্রী দিয়ে প্রচুর পরিমাণেই উদর-পূর্তি ক'রে নেয়। এদের চরিত্রে শূকরের মতো একদিকে নিরীহতা ও মালিন্য, অপর দিকে হিংস্রতা ও একগুঁয়েমি আছে ব'লে সন্দেহ হয়।

যে সব স্ত্রীলোক ভুক্ত বস্তু তারিয়ে তারিয়ে খান, জিহ্বার সঙ্গে সংঘাতে একটা অপূর্ব শব্দের সৃষ্টি করেন আর চোখটা ঘুরিয়ে অথবা বুজিয়ে রসাস্বাদ করেন, তাঁদের দাঁত না দেখতে পেলেও আমার মনে

হয় অনেকটা লঘু-চপল হরিণীর মতো প্রকৃতি এঁদের। যে সব রোগা মহিলা দু চারটি আঙুলের ডগার সাহায্যে মুখের মধ্যে খাবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেন, তাঁদের দাঁত আছে কি না জানা যায় না, তবে মনে হয় তাঁরা কাঠঠোকরা পাখির মতোন ক্ষীণকায় ও লম্বগ্রীব, চঞ্চুতে ক্ষুরধার এবং মেজাজটা একটু অসহিষ্ণু, একই কথার বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি করেন আর সুবুদ্ধির বালাই নেই। কোনো কোনো মেয়েদের সামনে কয়েকটি দাঁতের অদম্য বহির্মুখিতা আছে। তাঁদের অধরের উপরের এই ছোট্ট ছাউনিটুকু কিন্তু গ্রীষ্মকালের স্নিগ্ধ বারান্দা নয়। দেখলে মনে হয় তপ্ত দুপুরের হালকা হাওয়া সেখানে যাতায়াত করে। একটি মহিলার দেখেছিলুম ছোট্ট একটি গজদাঁত আছে, তাকে কিছুতেই চাপা যায় না। আমার মতে, সেটি বেশ একটু ঝলমল বিলাসিনীর চটুল মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। কিছুদিন পরে দেখলুম সেটি সৌন্দর্য-হানির ভয়ে উৎপাটিত হয়েছে, তার বদলে এসেছে একটি প্লেন নকল দাঁত। কিন্তু এতে কি লাভ হলো? যেখানে ছিলো ক্লিওপেট্রার সম্ভাবনা, সেখানে এলো বৈশিষ্ট্যহীন নিতান্তই সাধারণ গৃহিণীর নিশ্চেষ্ট প্রকাশ। মাত্র একটি দাঁতের সূক্ষ্ম উগ্রতায় যে নায়িকার ইতিহাস মানুষের চোখে পড়তে চেয়েছিলো, সে চোখকে ভোঁতা ক'রে দিয়ে তার যে কি পরমার্থ লাভ হলো জানেন তিনি, তাঁর কাণ্ডজ্ঞানহীন পতিদেবতা আর হতভাগ্য ডেন্‌টিস্‌ট। আরেকটি সুদর্শনা চারুহাসিনীকে দেখে-ছিলাম। তাঁর আহারের প্রক্রিয়াটা অদ্ভুত। তিনি খাদ্য পদার্থকে হাতের তেলোয় চাপ দিয়ে দিয়ে একটু ডেলা পাকিয়ে নেন, তারপর হাঁ-মুখটা হয়তো ছোটো বলেই অল্প অল্প ক'রে মুখে পোরেন। চিবোন কিনা টের পাইনি, কেননা শব্দ তো হয়ই না, এমন কি গালের পেশীও নড়ে না। আশ্চর্য হ'য়েছিলাম তাঁর এই অভিনব আহার-পদ্ধতি দেখে। তখন তাঁর সঙ্গে ভালো ক'রে আলাপ হয়নি, কাজেই আমার অর্ধপরিচিত কৌতূহলী ও বিস্মিত দৃষ্টিতে তিনি লজ্জিত হ'য়ে পড়ে-ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, খাবার টেবিলে ব'সে তাঁর স্বভাব

সম্বন্ধে আমার যে ধারণাটা হয়েছিলো, সেটা বদলায়নি, বরঞ্চ আরো বদ্ধমূল হয়েছে। তিনি পাইথনের মতোই দীর্ঘাকৃতি, হৃষ্টপুষ্ট, বিচিত্রবর্ণা, সুন্দরী। কিন্তু ধীর স্থির হঠকারিতায় অপারগ, দেহে ও কথায় ওজন রাখেন যথেষ্ট। তবে—নিষ্প্রাণ, রক্তে উত্তাপ নেই, দেহের ক্ষুধা কম, অল্পে তুষ্ট, মাথা ছোটো ও ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ-শীতল আবহাওয়াতেই তাঁর রুচি। চন্দ্রবোড়া ও শাখামুঠির মতো তীব্র বিষ বা রুক্ষ মেজাজ তাঁর নয়, তবে বারবার ছোবল দেওয়ার চেয়ে সুকুমার মুখের অধীশ্বরী হয়েও তিনি পুরোপুরি গ্রাসটাই পছন্দ করেন।

থাক, এ সব গালগল্প ও পরচর্চা হয়তো আপনাদের কাছে অরুচিকর লাগছে। কিন্তু আমি তো মহিলাদের নিয়ে কুৎসা করতে বসিনি। আমার প্রতিপাদ্য বিষয় তো পূর্বেই বলেছি, দাঁতের সঙ্গে কোথায় যেন ব্যক্তিত্বের একটা যোগাযোগ রয়েছে। তাছাড়া, এযুগে এমন রোমান্টিক মনোভাব থাকাও তো ঠিক নয়। মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে তাঁরা কিছুই খান না, অথবা খাওয়াটা বাড়ির পুরুষের আড়ালে গোপনে সারাই ভালো, চোরের মত সন্তর্পণে। কেউ দেখে ফেললে তাঁদের সাত্ত্বিক সতীত্ব ও পদ্মিনী-স্বপ্ন চুরমার হ'য়ে যায়। তাঁদের দাঁত থাকবে, ছোট্ট, সুগঠিত, ইঁদুরের মতো। বড়ো জোর তাঁরা একটু ঝাল চানা বা ডালমুট কুড়মুড় ক'রে মুখ ফাঁক না ক'রে চিবুতে পারেন, কিন্তু চুড়ির গোছা সামলে জামবাটিতে কব্জি ডুবিয়ে মাংস খাওয়া রীতিমতো অমার্জনীয়। আমার একটি বন্ধুর এমনি একটা সংস্কার ছিল এবং বিয়ের পরে তিনি তাঁর স্ত্রীর মাংসপ্রীতি চাক্ষুষ উপলব্ধি ক'রে ব্যথিত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়েছিলেন। কিন্তু মুখ ও দাঁত যখন রয়েছে, তখন খাওয়া ব্যাপারটা অতখানি স্থূল ব'লে ভাববার কি কোনো কারণ আছে? স্বামীর মাথায় গলদা চিংড়ির চেয়ে বেশী ঘি থাকলে ভয়েরই বা কি কারণ? আমাদের মাসি-পিসি-ঠাকুমা জাতীয় মহিলাদের খাওয়া নিয়ে লজ্জাটা হয়তো সেকালে বেশি ছিলো। কিন্তু সকালে পুকুর-পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁতে কালো গুল

পুরে দিয়ে বিশুদ্ধ ভাষায় অপর পল্লিবাসিনীর ভর্তা ও পুত্রের মাথা তাঁদের কাউকে কাউকে চিবুতে স্বকর্ণে শুনেছি। তাঁরা বেলা তিনটেয় হেঁসেলের পাট চুকিয়ে যে পরিমাণ অন্ন, সজনে ডাঁটা ও মাছের কাঁটার ঝাল চচ্চড়ি ওড়াতেন, সেটা তো নিতান্ত তুচ্ছ নয়। আসল কথা এই, আজকালকার মেয়েরা ঘোমটা দেন না, নথও পরেন না। নইলে ঘোমটার ফাঁকে, নথের আড়ালে অনেকখানি মুখব্যাদান করবার অবসর পেতেন!

আহারের সঙ্গে দাঁতের যোগটা যেমন যান্ত্রিক, হাসির সঙ্গে দাঁতের সম্পর্কটা তেমনি আত্মিক। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দাঁতের কি-ই বা মর্যাদা! কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দাঁত ও হাসির অনেকখানি গুরুত্ব। যে দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়েছে, সে মানুষের শ্লীলতার আবরণ খসেছে। যে মানুষ দেঁতো হাসি হাসে, সে মানুষের ব্যক্তিত্ব অশ্রদ্ধেয়। যার হাসিতে দাঁত ও মাড়ি বেরিয়ে আসে, তাকে আমরা সভ্য আখ্যা দিতে নারাজ। কথায় কথায় যার এক গাল হাসি, তাকে আমরা অন্তঃসারশূন্য উদারতায় ভূষিত করি। মোটা-সোটা গম্ভীর লোক যখন পান্তুয়া-হাসি হাসেন, তখনই আমরা কাছে এগুতে ভরসা পাই আর রুক্ষ, কৃশকায় ব্যক্তির আন্তরিক হাসিকেও আমরা সন্দেহের চক্ষে দেখি! এই সমস্ত হাসি দাঁতের উপর নির্ভর করছে, কেননা দাঁতের গড়নের সঙ্গে হাসির কোণ, খোঁচ ও টান অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যাদের সামনের দাঁত কোদালের মত চৌকো ও বড়ো, তাদের হাসি দরাজ হবেই। মেজাজ তাদের মোটামুটি ভালো এবং উদার, কিন্তু সহজেই উত্তপ্ত হ'য়ে আবার সহজেই তারা শান্ত হয়। এ সব লোক আমার মনে হয়, একটু আত্মম্ভরী, আবেগবান ও উত্তেজনাপ্রবণ হ'য়ে থাকে। ঝপ ক'রে যেমন কামড়ায়, টপ ক'রে চুমুও খায়। কথায় কথায় এরা বাজি ধরে, প্রায়ই হেরে যায়, হেরে গিয়ে বাজির টাকা দেয় না এবং না দিয়েও লজ্জা বোধ করে না। উপরন্তু তর্ক করে, এড়িয়ে যাবার হাসি হেসে গড়িয়ে পড়ে।

যাদের দাঁত সরু ও মিহি, উপরন্তু ঠোঁট পাতলা, আমি সে সব

লোককে এড়িয়ে চলি। কেননা, আমার অহেতুক সন্দেহ জাগে যে এরা একটু ফিচেল জাতের, ধূর্ত প্রকৃতির। স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতা' এদের চরিত্রে বড়োই কম। যাদের 'মোলার' বা কশ দাঁত সোনা-বাঁধানো, তাদের শঠ ও অসমসাহসী হ'তে বাধা নেই; কেননা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে প্রায়ই দেখবেন যে, খুনী আসামী অথবা চতুর প্রতারক অর্থাৎ নায়কের দু একটি দাঁত সোনা-বাঁধানো ব'লে আলোয় ঝকঝক ক'রে ওঠে আর ডিটেক্‌টিভ সেই সেই মূহূর্তে অনায়াসেই তাকে ধ'রে ফেলে পিস্তল তোলে। আর যাদের দাঁতের মধ্যস্থলে পিন-এর ছোট্ট মাথাটি দেখা যাচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা নির্বিকার। আমার মনে হয় তারা পান দোক্তার রসে মশগুল, উড়িষ্যাবাসীরই সমগোত্র।

দাঁতের কথা বলতে গিয়ে পানের কথা এসে গেল। আসতেই হবে, যেহেতু ব্যক্তিগত রুচি ও রসবোধকে অস্বীকার করতে পারি না। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি যে পান খাওয়া খারাপ, ওতে দাঁতের গোড়ায় পাথুরী হয়, দন্তমূল ক্ষয়ে যায়, জিব মোটা হয়, দাঁত তরমুজের বিচি হ'য়ে যায় ইত্যাদি। প্রত্যেকটি কথাই সত্য। ভুক্তভোগীর জীবনে প্রমাণিত তথ্য। কিন্তু পান না খেয়েও দাঁত পড়ে, দাঁতের রোগ হয়। দন্তচিকিৎসার যত ঔষধের বিজ্ঞাপন, সবই ইংরাজী। ইংরেজ পান জর্দা খায় না, খায় মাংস। অথচ তার পায়োরিয়া হয় এবং বিলেতে দন্তচিকিৎসার অবাধ পসার। তাহলে পায়োরিয়া রোগে গড়ে চল্লিশ বছরে দাঁত তুলে ফেলা আর বাঙালীর পঞ্চাশে পান খেয়ে দাঁতগুলোকে ঝামা ক'রে ফেলে দেওয়ার মধ্যে এমন কি আকাশ-পাতাল পার্থক্য? আসলে পান খাওয়াটা স্বাস্থ্যহানি যতখানি না করে, তার চেয়ে বেশি পীড়া দেয় হিতৈষী হিতৈষিণীর চোখকে। পানের নেশা কি বস্তু, মাতালও সে কথা বুঝবে না। আমার এক আত্মীয় রাত জেগে পান খেতেন ও কৌটার পান না ফুরোলে শয্যা নিতেন না। আরেকজনকে দেখেছি, রাত্রে উঠে রাস্তায় গিয়ে ঘুমন্ত

পানওয়ালাকে জাগিয়ে পান সাজিয়ে খেয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। একজন বিশিষ্ট ডাক্তারকে দেখেছি কলেরা-রুগী ঘেঁটে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ হাঁ করলেন আর দোকানী পানটা তাঁর মুখে ফেলে দিলো। ছোঁয়াচ বাঁচলো অথচ নেশাও জমলো। এই ডাক্তারের মুখেই শুনেছি পানের হরেক রকম উপকারিতা, যা কোনো ভেষজ-তত্ত্বে লেখা নেই। অপর একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে দেখেছি সকালে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিজের হাতে প্রায় শখানেক পান-সাজতে। সারাদিনের খোরাক। এ নেশা বড়ো সংক্রামক। যাঁরা দাঁতের ভয়ে পরের নিন্দা করেন, কালক্রমে তাঁদেরও স্খলন হয়, মতিভ্রম ঘটে এবং বেপরোয়া হ'য়ে অবশেষে পান-জরদায় আসক্ত হ'য়ে পড়েন। এঁরা আবার দু নৌকায় পা রাখেন। সামনের দাঁত ক'টি প্রসাধনে বেশ পরিষ্কার ক'রে রাখেন, কিন্তু মুখগহ্বরে ঘন ঘোর অন্ধকার।

এই পান খাওয়ার সূত্রে একটি করুণ কাহিনী মনে পড়লো। এক ভদ্রলোক পান খেতেন বেশি, কিন্তু কোর্টশিপের সময় মহা মুস্কিলে পড়লেন। ভদ্রমহিলা আধুনিক, ছিমছাম, শিক্ষিতা এবং পান খাওয়া দেখতে পারেন না। ভদ্রলোক দুদিনেই ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। তারপর মোড়ের মাথায় মুখ থেকে পান ফেলে দিয়ে আড়ালে দাঁতের একটু ক্ষিপ্র সংস্কার ক'রে নিয়ে প্রণয়-পাত্রীর কাছে নিত্য সন্ধ্যায় হাজিরা দিতেন। ভদ্রমহিলা জানতেও পারতেন না যে তার প্রেমা-কাঙ্ক্ষীর হৃদয়ে প্রেমের স্পন্দনের চেয়ে ধরা পড়ার গুরুগুরুটাই বেশি বাজছে আর তার পকেটে রয়েছে ছোট্ট দুচারটি নিমের দাঁতন। তাঁর এই জোচ্চুরিতে ভীত হ'য়ে আমি কতদিন সন্ত্রস্ত হয়েছি কিন্তু তিনি নির্বিকার চিত্তে অন্য সময়ে পান চালিয়ে যাচ্ছেন। বলেন, একবার ঘরে পুরতে পারলে তখন আর ভয়টা কিসের? কিন্তু বিয়ের পর দেখা গেল, দিন-দিন অবস্থাটা সঙ্গীন হ'য়ে উঠছে। স্ত্রী সামান্য এই পান ছাড়ানোর ব্যাপারে নিজের অকৃতকার্যতায় নিজের জীবনকে ও অদৃষ্টকেই ধিক্কার দেন, মরণ-কামনা করেন, স্বামীকে অস্থির ক'রে

তোলেন। আর স্বামী গো-বেচারীর মত শুনে যান, না রাম, না গঙ্গা। প্রতিবাদ করেন না, একটু আধটু মিথ্যা কথা বলেন আর ছলনা করেন। পকেটে আবার নিমের দাঁতন থাকে, অলক্ষ্যে ভ্যানিটি ব্যাগের ছোট্ট আয়না নিয়ে নিভৃতে দন্ত-সংস্কার চলে। কিন্তু অসাবধান মুহূর্তে যখন হেসে ফেলেন, স্ত্রী বলেন, 'জিব বার করো দেখি'। আবার সুরু হয় তর্জন-গর্জন, অঙ্গীকার-অভিমানের পালা। কিছুতেই কিছু হয় না। শেষকালে মরিয়া হ'য়ে ভদ্রলোক আমার সাহায্য ভিক্ষা করলেন। সুবিধা ও সুযোগ বুঝে আমি মহিলাটিকে একদিন কালিদাসের শ্লোক ব'লে একটি সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা শোনালুম—

বিনা খদিরসারেণ হারেণ হরিণীদৃশঃ।
নাধরে জায়তে রাগো নানুরাগঃ পয়োধরে॥

শ্লোকটির শেষ চরণটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা তেমন করিনি। তবে প্রথম চরণের ব্যাখ্যা খুব কবিত্বময় ক'রে শোনালুম যে পান-খয়েরের লাল রঙটুকু নইলে সুন্দরীর অধর শোভাই জন্মায় না। আশ্চর্য কাজ হয়েছিলো, বলতে হবে। কেননা, এখন তিনি পান-জরদায় ডুবে আছেন। ঠোঁট সমস্তক্ষণই বন্ধ এবং গাল ঈষৎ ফোলা, স্বামীকে গঞ্জনা শিক্ষা দেবার মতো মুখ খোলার অবকাশ নেই।

ব্যাপারটা আরো খোলসা ক'রে দেখা যাক। দাঁতের প্রতি যে মমতা, সেটা নিতান্তই স্বার্থের খাতিরে। 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা' না থাকাই স্বাভাবিক। যেহেতু যে জিনিস প্রিয়, অপরিহার্য ও সর্বক্ষণ ব্যবহারের বস্তু, তাকে সব সময়ে আমরা কদর করি না বা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি না। অমন যে ধর্মপত্নী, যাঁর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হিন্দু শাস্ত্রের পাতায় পাতায়, তাঁরও মর্যাদা আমরা কি রাখি দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মুহূর্তে? সন্তর্পণে, সযত্নে পটের বিবি সেজে তাঁরাও থাকেন না, সংসার সমাজও পছন্দ করেন না। আমরা ভালবাসি যে আমাদের মেজাজ বুঝে তাঁরা সুসজ্জিত হবেন এবং ক্ষণমাহাত্ম্যে সুসংস্কৃত বেশে একটু পুরোনো রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলবেন। ব্যস্—ঐ পর্যন্ত।

নইলে বেশিরভাগ সময়েই তাঁরা ঢিলেঢালা, এমন কি অর্ধমলিন বসন প'রে সংসারের বেগার খাটবেন। পান থেকে চুণ খসলে আমরা তম্বি করবো, মধ্যে মধ্যে এক একখানা শাড়ি-গয়না দেবো। এহেন নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহবস্তুটির দেহান্ত ঘটলে আমরা চোখে সর্ষের ফুল দেখি, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' রচনা করি, আবার শান্ত নিরুদ্বেল চিত্তে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করি। সেই রকম দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা আমরা দিই না। দাঁত-নড়ার যন্ত্রণা সুরু হ'লে আহা-উহু করি, গ্যম্ পেন্ট্ করি। সতৃষ্ণ নয়নে সুস্থ দাঁতের চর্বণ-লীলা দেখি। তারপর দাঁত পড়ে, লালা ঝরে। লোলুপ আগ্রহে নকল দাঁতের সেট্ বসাই। ছোটোদের ডেকে বলি, তোমাদের বয়সে পাথর চিবিয়ে খেয়েছি। দোজবরে বা তেজবরে যেমন নবযৌবনা পত্নী নিয়ে বিব্রত, নতুন দাঁতের প্লেট নিয়ে আমরাও সেই রকম বিপর্যস্ত হ'য়ে উঠি। সবটাই স্বার্থ, ভোগের ইচ্ছা আর অসময়ের বিলাপ বিড়ম্বনা।

তবে দাঁত নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী হ'লেও তার অনেকখানি আভিজাত্য আছে, এটা মানতেই হবে। দাঁতের শোভা মানুষের মুখকে আভিজাত্য দেয়, এটা ঠিক। দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়, কিন্তু হাড় থাকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কী চিহ্ন আজো রয়েছে? খানকয়েক কঙ্কাল, ম্যামথের হাড় ও দাঁত। সেই সুদূর অতীতের ফসিল থেকে চ'লে আসুন ঐতিহাসিক যুগে। দেখবেন দন্তপূজা ও দন্ত-সংস্কার, বর্বরতার নিদর্শনই বলুন আর সভ্যতার প্রতীকই বলুন। বৌদ্ধরা বুদ্ধ-দন্ত সযত্নে পূজাবস্তু ক'রে রেখেছেন। আর আমাদের প্র্যাক্‌টিক্যাল মনুও দন্তধাবন ও সংস্কার নিয়ে সংহিতার অর্ধেক অধ্যায়ই লিখে ফেলেছেন। কাজেই দাঁতের ঐতিহ্য গর্বের সামগ্রী। প্রাচীন ইতিহাসেও দন্তের মূল প্রবেশ করেছে। এক হিসাবে সর্ব দেহের মধ্যে দন্তেরই জাত্যভিমান থাকা উচিত, কেননা সে ব্রাহ্মণতুল্য, দ্বিজ। উপনীত হ'য়ে ব্রাহ্মণ-তনয় প্রকৃত স্নাতক পদবাচ্য হন। তেমনি দুধে দাঁত পড়ে, আবার নবকলেবর নিয়ে সংসারী দাঁত গজায়।

কঠিন তপশ্চর্যায় ব্রহ্মচারীর সিদ্ধিলাভ। আক্কেল-দাঁত ওঠায় মানুষের যন্ত্রণাদায়ক সাবালকত্ব অর্জন।

অতএব দেখা যাচ্ছে দাঁতের একটা নিজস্ব ইতিহাস, চরিত্র ও দর্শন আছে যা মানুষকে দেয় চরিত্র, ব্যক্তিত্ব এবং জগৎকে আহ্বান ও গ্রহণ করবার ভঙ্গী। আরেকটি কথা। দাঁত দেখা ও দাঁত দেখানো, এ দুটি প্রক্রিয়া আমরা আমাদের আদিমতম পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পেয়েছি। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজী দাঁত আমরা চিনেছি, সেখানে আছে চতুর গন্ধবণিকের কুটিল হাসি। আমরা প্রত্যুত্তরে দুর্বল দাঁত খিঁচোই। স্বর্ণমানে সুপ্রতিষ্ঠিত আমেরিকান দেঁতো হাসি আমরা সম্প্রতি দেখছি, চিনেছি তার সুবর্ণ-বণিকের কারবারী হাসি। খালি ধরতে পারছি না ঠিকমতো দুর্জ্ঞেয় রুশ হাসি। গোঁফের নীচে দাঁত দেখা যায় না। তবে গত ছ বছর ধ'রে অনেক দাঁত দেখলুম ও দেখালুম। এতে মনে হয়, আমরা দাঁতকে অবহেলা করিনি, তার ঐতিহ্যকে যথাযথ মূল্য দিয়েছি রাজনীতির ক্ষেত্রে, সমাজে ও চোরা-বাজারে।

দাঁত নিয়ে অনেক বাজে কথার আলোচনা করলুম। তার উদ্দেশ্য অবশ্যই ব্যক্তিগত সান্ত্বনা। আমার মনে হয়, দাঁত থাকলেই পড়বে। এতে বিচলিত হবার কিছু নেই। যাদের দাঁত ভালো, তারা আশাবাদী। অতবড় ব্যক্তিগত শোক পেয়েও যে ব্রাউনিং 'র‍্যাবিবেন এজরা'তে বার্ধক্যের জয়গান করলেন, তা কিসের জোরে? তখনও কবির দাঁত পড়েনি, এইটেই আসল কথা। আমি কিন্তু তেমন ভরসা পাচ্ছি না। কেমন যেন হীনবল ও হৃতশক্তি ঠেকছে নিজেকে, যখনই দৃষ্টি পড়ছে আমার টেবিলে ঐ দুটি দাঁতের ওপরে। একটি আমার, যদিও অকালে গেল আজ সকালেই। বিবর্ণ, স্থানচ্যুত, গতমূল। অপরটি ছোট্ট সাদা দুধে দাঁত, আমার পুত্রের। সুকুমার, উচ্ছিন্নকোরক।

তবু বলি, নবজীবনেরই জয়।

নিমন্ত্রণ। বৈশাখ ১৩৫৯ ॥

ঘড়ি

অজিত দত্ত

অনাদ্যন্ত সময়কে গোলাকার গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখবার ভান ক'রে দুনিয়ার খবরদারির পরোয়ানা নিয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছে ঘড়ি। এই মানব-নির্মিত উপকরণটি আজকে সভ্যতার ঘাড়ে চেপে বসেছে সিন্ধবাদের ঘাড়ের বুড়োর মতো। যাঁরা সভ্যতার আয়ুর্বেত্তা, তাঁরা ঘড়ির .টিক-টিক আওয়াজে নাড়ীর স্পন্দন শুনতে পান। বস্তুতঃ ঘড়ির শাসন যে দেশে যত প্রবল আজকের বিচারে সেই দেশই তত সভ্য, উন্নত ও জীবন্ত ব'লে গণ্য হবার স্পর্ধা রাখে।

ছোটোদের পড়ার সময় থেকে বড়োদের মৌতাতের সময় পর্যন্ত ঘড়ি বলিষ্ঠ হাতে নির্দিষ্ট ক'রে রেখেছে বলেই রক্ষে। নইলে ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পাঠিয়ে বাড়ির গিন্নি এমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে মোহন সিরিজের বইখানা নিয়ে শুতে পারতেন কিনা সন্দেহ, কেননা এমন নিশ্বাস-নিরোধী রোমাঞ্চকর কাহিনী একটানা শেষ না করলেই নয়। ভাগ্যিস ঘড়ির কাঁটায় মেপে চলে হাকিমি থেকে কেরানীগিরি, মাস্টারি থেকে মোসাহেবি, তাই রাষ্ট্রের যন্ত্রটি নিয়মিত চালে চলছে। জীবনের সুখ-দুঃখের চাকাটিকে ট্রামের লাইনের মতো বাঁধা রাস্তায় এনে ফেলা গেছে, যেখানে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম। দুঃখগুলো হয়ে এসেছে ছোটো, আনন্দগুলি সংকীর্ণ। ছুটি পাওনা নেই এমন কেরানীকে সন্তানের শোক বেশীদিন বা বেশীক্ষণ মুহ্যমান ক'রে রাখতে পারে না। আবার প্রথম শরতের সাদর সম্ভাষণ দশটা-পাঁচটা ভ্রূকুটির আড়ালে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ে, তার আর ঠিকানা মেলে না।

তবু ঘড়িকে আমরা সবাই মান্য করি, ভয় ক'রে চলি। ঘুম থেকে উঠে যদি দেখা যায় ঘড়ির ছোটো কাঁটাটি আটটার কাছাকাছি এসেছে, তাহলে নিজের মনের কাছে বারবার জবাবদিহি করতে হয়।

আপিসে পৌঁছে যদি দেখা যায় ঘড়ির নিরপেক্ষ হাত ঠুটি সাড়ে নটার ঘর থেকে পৌনে দশটায় গিয়ে পৌঁছেছে তাহলে ধিক্কার রাখবার আর জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না। কাউকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ ক'রে বারোটার মধ্যে আহার্য পরিবেশন করতে না পারাটা যথেষ্ট লজ্জার। এমনকি ছুটির দিনের আলস্য যাপনের নেশায় মনে যখন রং ধ'রে আসছে, তখন বাড়িতে এক পেয়ালা চা চাইলেও মনের নেশার প্রতিষেধক রূপে এইরূপ মন্তব্য শোনাই স্বাভাবিক—"এই বেলা বারোটায় চা খাবে!"

অথচ মনের দরবারে বেলা বারেটার কোনোই মানে নেই। সেখানে অলৌকিক ব্যাপার ঘটছে, যা ঘড়ির কাঁটার হিসেবে কোনো-মতেই ব্যাখ্যা করা চলে না। বর্ষণমুখর শ্রাবণের অমাবস্যায় সেই মনোসভা সহসা ভাস্বর সূর্যালোকে প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে, আবার দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রে সেখানে কখনো কখনো নেমে আসে প্রায়ান্ধকার গোধূলি লগ্ন, যেখানে জীবনের সকল বুঝ-সমুঝ না-বোঝার ছায়ায় রহস্যময় হ'য়ে ওঠে। মনের ভিতরকার মানুষটি তো ঘড়ি দেখতে জানে না, তাই শেখেনি সে নিয়মানুবর্তিতা, জানে না নির্ভুল চালে চলতে। এই সময়ের বর্তুলাকার প্রহরীর অনুশাসনে সময়টা যখন কাজের, তখন অকাজের ভূতটা তার ঘাড়ে চেপে বসে। ঘুমের সময়ে সে স্মৃতির সমুদ্রে অবগাহনের নেশায় মেতে জেগে থাকে, কখন ভোর হ'য়ে যায় টেরও পায় না। সেইজন্যই ছোটো ছেলে-মেয়েরা ইস্কুল পালিয়ে ঘুড়ি ধরতে যায়, আর কেরানীরা লেজারের নীচে রেখে লুকিয়ে উপন্যাস পড়বার চেষ্টা করে। অর্থাৎ কোন সময়ে কোন কাজটি করতে হবে, এ সম্বন্ধে ঘড়ির নির্দেশই যে মাননীয় একথা সভ্যজগৎ সমবেতভাবে মেনে নিলেও স্বতন্ত্রভাবে আমরা কেউই পুরোপুরি মানতে রাজি নই। কেননা ঘড়ি অন্তর্লোকের শাসনকর্তা নয়। সে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। মানুষের মন ঘড়ির প্রজা হ'য়েই জন্মায়নি। ঘড়ি তাই তার জীবনে মান্য হ'য়েও অসহনীয়।

আজকের দিনের সভ্য, শিক্ষিত, সংস্কৃতিপরায়ণ মানুষের কাছে এইরকম মনে হ'তে পারে যে ঘড়ি না থাকলে আমরা কি করতাম! কি করে, কার নির্দেশে চলতো আমাদের কাজকর্ম, শোয়া-বসা, লেখা পড়া! কি করে হতো সভা, কি করেই বা জানা যেতো রেডিয়োতে ঠিক কোন মুহূর্তে আমাদের প্রিয় গানগুলি গাওয়া হবে। সত্যিই আমরা কি করতাম! আজকের ব্যবহারিক জীবন যে কাঠামোয় আমরা গ'ড়ে তুলেছি, তার ভিত গড়েছে ঘড়িরূপী খণ্ড খণ্ড বহু-বিভক্ত, অথচ শৃঙ্খলিত সময়। ঘড়ি ছাড়া আমাদের কিছুতেই চলতে পারে না।

চলতে যে পারে না সেটাই দুর্ভাগ্য। এবং মনোময় ব্যক্তিত্বের আপত্তিও এইখানে। লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, যে মানুষ যত বেশি আবেগপ্রবণ, ঠিক সেই পরিমাণেই সে সময়ের এই অস্বাভাবিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। মানুষ যুক্তিশীলতার অপ্রাকৃত কাঠামোর মাপে নিজের জীবনকে যতটা বাঁধতে সমর্থ, ঠিক সেই পরিমাণেই সে সভ্য ও উন্নত ব'লে গণ্য হয়, এবং ঠিক সেই অনুপাতেই সে ঘড়ির ভক্ত প্রজা। কিন্তু শিশুর মন ও নারীর মন, অসভ্যের মন ও শিল্পীর মন হয়তো এখনো যুক্তির কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেনি, তাই মহাকালের অন্তরঙ্গ হ'য়েও তারা ঘড়ির বিরুদ্ধে চিরন্তন বিদ্রোহী। ঘড়ির কাঁটার মাপে জীবনের স্বাধীনতাকে টুকরো ক'রে কাটতে তারা নারাজ। এইজন্য শিশুর সঙ্গে আজ ভালো ক'রে আমরা মিশতে ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছি। কেননা তার কাছে সময়ের—অর্থাৎ ঘড়ির মাপে বাঁধা সময়ের কোনোই দাম নেই। গভীর রাত্রিকে শিশু তার কাকলির অযোগ্য সময় ব'লে মনে করে না। অথবা রোজই সে নিয়মিত সময়ে তার পিতা ও মাতা তার সঙ্গ ত্যাগ করবে এটাও সহজে মেনে নিতে তার আপত্তি থেকেই যায়। সেই জন্যই বাবা আপিস যাবার সময় সে আপত্তি জানায়, মার রান্নাঘরে যাতায়াত সে পছন্দ করে না। শিশুমনের সঙ্গে নেহাৎ ঘনিষ্ঠ না

হ'লেও এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে শিশু প্রকৃতই মনে-প্রাণে ঘড়ির বিনাশ প্রার্থনা করে।

“যতো ঘণ্টা যতো মিনিট
সময় আছে যতো
শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,
তখন স্কুলে না-ই বা গেলাম
কেউ যদি কয় মন্দ
আমি বলবো দশটা বাজাই বন্ধ,
তা-ধিন—তা ধিন—তা ধিন।
শুই না ব'লে বকিস যদি
আমি বলবো তোরে
রাত না হলে রাত হবে কি করে ?
দশটা বাজাই থামলো যখন
কেমন করে শুই,
দেরি ব'লে নেইতো মা কিচ্ছুই,
তা ধিন—তা ধিন—তা ধিন।

যুক্তির চেয়ে বেশি আবেগের অনুসারী ব'লে মেয়েদের মনটাও শিশুদের মতোই ঘড়ির নির্দেশ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর উদাসীন। সময় দিয়ে সময় না রক্ষা করার সম্বন্ধে মেয়েদের যে খ্যাতি সেটা পাশ্চাত্ত্য পর্যন্ত বিস্তৃত। দশটার সময়ে গাড়ি আসতে ব'লে কোন আর মেয়ে সাড়ে দশটার আগে প্রসাধনরতা হন ? সিনেমায় আলো নিবে যাবার আগে যে সব মহিলা আসন গ্রহণ করেন বুঝতে হবে তাঁদের স্বামীরা অসাধারণ কড়া মানুষ; নচেৎ এরূপ অঘটন ঘটতো না। কোনো জায়গায় বেড়াতে গিয়ে যথাসময়ে ফেরবার জন্য তাড়া দিলে ‘এইতো এলাম, এক্ষুনি ফিরতে হবে ?’ অপর পক্ষের থেকে এরূপ একটা বিস্মিত উক্তিই প্রত্যাশা করবেন।

বস্তুতঃ মেয়েরা সময় মাপেন ঘড়ি দিয়ে নয়, ভালো-লাগা না-লাগার

মানদণ্ডে। এবং আমার মতে সেইরূপ হওয়াই সংগত এবং প্রকৃতির অভিপ্রেত। ঘড়ির কাঁটায় যাই বলুক এ সত্য কে না উপলব্ধি করেছেন যে আপিসে দশটা থেকে পাঁচটা যেন আমাদের বারবারই স্মরণ করিয়ে দেয় যে সময় হচ্ছে অনাদি এবং অনন্ত। অপরপক্ষে রবিবারের আড্ডাটা ভালো ক'রে জমতে না জমতেই দেখা যায় যে ঘড়ির মাপে অনেকখানি সময় পার হ'য়ে আসা গেছে। যৌবনের যে রোমাঞ্চকর দিনগুলি ঘড়ির মাপে নেহাৎ স্বল্পায়ু ছিলো না, কিন্তু ভাবতে গেলে মনে হয় যেন বড্ডই তাড়াতাড়ি সেগুলি শেষ হ'য়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ যে অশীতিশীর্ষ অতিক্রম ক'রেও আমাদের মধ্যেই ছিলেন এ কথাই মনে হয় না। মনে হয় তাঁকে যেন আমরা বড়োই অল্পক্ষণ পেলাম। প্রেমিক-প্রেমিকার গুঞ্জনে গোধূলি অজানিতে উষার রূপ ধ'রে দেখা দেয়। তার কারণ তাদের বক্তব্য ঘড়ির কাঁটায় মাপা যায় না, মহাকাল সেই দুর্লভ মুহূর্তটিও লিপিবদ্ধ ক'রে রাখবার জন্যে স্বয়ং খবরের কাগজের রিপোর্টারের মতো তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রকৃতই সময় দিয়ে জীবনের মূল্য যাচাই করবার মতো হাস্যকর আর কিছুই হ'তে পারে না। ঘড়ির মাপে যে সময়টার মূল্য হয়তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা, ওজন করলে দেখা যাবে হয়তো জীবনের বাদ বাকি ঘণ্টাগুলির চেয়ে সে বেশি ভারী। আবার চ্যাটারটন, কীটস কিংবা রূপার্ট ব্রুক-এর জীবনের সঙ্গে আমাদের পেন্সন-প্রাপ্ত শতায়ু রামচন্দ্র পতিতুণ্ডি মহাশয়ের জীবনের তুলনা করতে যাওয়া হাস্যকর বাতুলতা, যদিও জানি ঘড়ির হিসেবে পতিতুণ্ডি মহাশয় বহুগুণ এগিয়ে গেছেন।

অযৌক্তিক কবিমনের সৌভাগ্য নিয়ে যারা জন্মেছেন তাঁরা নিঃসন্দিগ্ধরূপে একথা জানেন যে সময় ব'লে একটা শাশ্বত পদার্থ আছে, ঘড়ির কাঁটায় তাকে ভাগ করা চলে না। কাক্কেশর কুচকুচের ভাগের মতো সময়কে ঘড়ি দিয়ে ভাগ করতে গেলে, হাতে থাকে পেন্সিলের মতো অসহনীয় অসন্তোষ। কেননা কবির সবচেয়ে বড়ো

পরিচয়ই এই যে সংসাররূপ আদি ও অকৃত্রিম পেষণ-যন্ত্রের চাপেও তার মন নামক পদার্থটি পিষে যায় না। মনকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাতেই কবির এতো দুর্ভোগ। এবং মনটাই যাদের প্রধান, ঘড়ির সঙ্গে কারবার চালানো তাদের পক্ষে সহজ নয়। কেননা মনের লেনদেন প্রকৃতির সঙ্গে এবং ঘড়ির নির্দেশ সব সময়ই অপ্রাকৃত। মন চেনে উষা ও গোধূলি, দ্বিপ্রহর ও রাত্রি। লাইটিং আপ টাইম সাতটা ব'লে যতই বড়ো ক'রে লেখা থাক, আকাশের আলোর ধূসর ছায়াচ্ছন্নতাই মাত্র তার কাছে গোধূলির মায়া বহন ক'রে আনতে পারে। সে গোধূলি ঘড়ি অনুযায়ী সাতটাতেই আসতে পারে, আবার বর্ষার মেঘে সে মোহকে টেনেও আনতে পারে বিকেল পাঁচটা কিংবা বেলা তিনটের সময়।

কোনোদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি পূব দিকের জানালা দিয়ে বিছানার উপর এসে পড়েছে ভোরের অনতিউষ্ণ রোদ, রংটা যার সোনার আর আহ্বানটা জাগরণের। কোনোদিন বা বর্ষার রিমঝিম শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। আবার কোনো সকালে উত্তাল হাওয়া বিছানার চাদর থেকে মাথার চুল পর্যন্ত এলোমেলো ক'রে দিয়ে যায়। ঘুম ভেঙে মনে হয় মনটাও যেন সহসা তার খেই হারিয়ে ফেলেছে। অথচ ঘড়িতে হয়তো রোজই দেখা যাচ্ছে সকাল সাতটার ইঙ্গিত। কিন্তু ভেবে দেখুন—রোজই সময়টা কি একই? আবার দুপুর আর বিকেল আর সন্ধ্যা আর রাত্রি। তারই বা কত রূপ, কত বৈচিত্র্য! ঘড়ির একই প্রকোষ্ঠে দাঁড়িয়ে আমরা কত নতুন নতুন সময়ের আবিষ্কার করি। মহাকালের ভাণ্ডারে যত রত্ন আছে ঘড়ির বেড়াজালে তাকে কুড়িয়ে আনা যায় না। ঘড়ি অনুযায়ী একই সময় নিত্যই নতুন রূপ ধ'রে দেখা দেয়। এবং সময়ের এই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই আমরা বাঁচি, নতুবা পৃথিবীর অধিকাংশের মতো আমরা সবাই যন্ত্রমানব হ'য়ে পড়তাম।

যদি ভেবে দেখা যায়, তাহলে সময়ই হচ্ছে একমাত্র জীবন্ত পদার্থ

যাকে ঘড়ি দিয়ে বাঁধা যায় না। এমন কি বিজ্ঞানের সমস্ত পুঁজি উজাড় ক'রেও মানুষ এমন কোনো অতি-ঘটিকা আবিষ্কার করতে পারে নি, যা দিয়ে সময়কে সে বাঁধতে পারে। সময় স্থাবর নয়, জঙ্গম। নদীর স্রোতের চেয়েও অব্যাহত, সহজ তার গতি। তার উপরে যশ ভিন্ন অন্য কোনো বস্তু দিয়ে সাঁকো বাঁধা যায় না। বাঁধ গড়া চলে না সেই স্রোতে। সময়ের তুলনায় মানুষই হচ্ছে বরঞ্চ স্থাবর। পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেটুকু ঢেউ তটের কাছে এসে মিলিয়ে যায়, সেইটুকুই তার গতি, তার বেশি নয়। এইরূপ সংকীর্ণ, গণ্ডিবদ্ধ আয়তন ব'লেই তার উপর শাসন চলে। সেইজন্যেই আমরা আজ ঘড়ি মেনে চলতে ইতস্তত করি না। কেননা, জানি যে আয়ুর সীমানার মধ্যে ঘড়ির সাহায্যে যতটুকু ঘর গুছিয়ে চলতে পারি ততই লাভ। হয়তো জীবনটাকে এমনি ক'রে খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত ক'রে নিলে 'চুরি চামারি ক'রে একটু সময় বাঁচানো চলে। হয়তো ভাবি, ঘড়ির কাঁটায় হিসেব করলে জীবনের অপরিবর্তনীয় সীমারেখাকে একটু বড়ো ক'রে দেখে নিজেরি মনের কাছে সান্ত্বনা পাওয়া যাবে।

চিরপ্রবহমান সময়! আমাদের জীবনের শৈবালগুলি সেখানে কেমন করে জেগে, কবে কোথায় মিলিয়ে যায় কে তার সন্ধান রাখে? আমরা ঘড়ি দিয়ে হিসেব করি অতো হাজার কি অতো লক্ষ ঘণ্টা। বস্তুতঃ মানুষের জীবনকে আমরা ঘড়ি দিয়ে যতই শৃঙ্খলিত করতে চাই না কেন, সর্বদাই সে শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে যেতে চায় পিঞ্জরমুক্ত পাখির মতো। দু এক জাতের পাখি থাকে যারা দাঁড়ে ব'সে থাকতেই ভালোবাসে। শিকলি কেটে দিলেও পালায় না। এদেরই লোকে ভালোবাসে, আদর করে, পাখি পড়ায়, বলে—'বলো তো ময়না রাধে কৃষ্ণ চচ্-উ-উ।' জীবনের সার্থকতার মাপকাঠিতে এরাই পাশমার্ক পেয়ে যায়। এরা সার্থক ব্যবসাদার, অফিসার ও কেরানী।

কিন্তু জীবনের সার্থকতার ছাপ যারা পায় নি. নিয়মানুবর্তিতার পাঠশালে ছাত্রবৃত্তিতে যারা ফেল করেছে, তারা চেতনা বা অবচেতনায়

জানে যে সময়কে ও-ভাবে বাঁধতে যাওয়া হাস্যকর মূঢ়তা। নীরব, ভাষাহীন কাল তার নির্দেশ এমন ক'রে অঙ্গাঙ্গী ক'রে দিয়েছে আমাদের অন্তর্লোকের বাসিন্দার চলা-ফেরার সঙ্গে, যে তাকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। ঘড়ির শাসন যেন বৃটিশের অধীনে দেশীয় রাজার শাসন। আপাতদৃষ্টিতে যতই হুকুমদারি করুক উপরওয়ালার কড়ে আঙুলের নির্দেশে তাকে উঠতে বসতে হয়। সেইজন্যই সময়ের তরফ থেকে ভল্টেয়ারের উক্তি :

"There's scarce a point whereon mankind agree
So well, as in their boast of killing me ;
I boast of nothing, but, when I've a mind,
I think I can be even with mankind."

সেইজন্যই কবির জগৎ ঘড়ির থেকে বিচ্ছিন্ন, সেইজন্যই কবিমনের কাছে ঘড়ির অস্বীকৃতি। বারবারই সে বলে, আমার যা সৃষ্টি তার বিচার হবে ঘড়িহীন কালের দরবারে, ঘড়ির সংকীর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে নয়, বারবারই সে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে কাল হচ্ছে নিরবধি। মহাকালের সঙ্গে যে-মন অন্তরঙ্গ, ঘড়িকে সে জানে অনধিকারী শাসনকর্তা ব'লে। সে-ই শুধু বলতে পারে—

"রাতের বেলা দুপুর যদি হয়,
দুপুর বেলা রাত হবে না কেন ?"

জনান্তিকে। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬ ॥

আড্ডা

বুদ্ধদেব বসু

পণ্ডিত নই, কথাটার উৎপত্তি জানি না। আওয়াজটা অ-সংস্কৃত, মুসলমানি। যদি ওকে হিন্দু ক'রে বলি সভা, তাহলে ওর কিছুই থাকে না। যদি ইংরেজি ক'রে বলি পার্টি, তাহলে ও প্রাণে মরে। মীটিঙের কাপড় খাকি কিংবা খাদি; পার্টির কাপড় ফুরফুরে কিন্তু ইস্ত্রি বড়ো কড়া; সভা শুভ্র, শোভন ও আরামহীন। ফরাশি সালঁর অস্তিত্ব এখনো আছে কিনা জানি না, বর্ণনা পড়ে মনে হয় এতো সমারোহ ভালো না। আড্ডার ঠিক প্রতিশব্দটি পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষাতেই আছে কি? ভাষাবিদ্ না হ'য়েও বলতে পারি, নেই; কারণ আড্ডার মেজাজ নেই অন্য কোনো দেশে, কিংবা মেজাজ থাকলেও যথোচিত পরিবেশ নেই। অন্যান্য দেশের লোক বক্তৃতা দেয়, রসিকতা করে, তর্ক চালায়, ফুর্তি ক'রে রাত কাটিয়েও দেয়, কিন্তু আড্ডা দেয় না। অত্যন্ত হাসি পায় যখন শুভানুধ্যায়ী ইংরেজ আমাদের করুণা ক'রে বলে—আহা বেচারা, ক্লব কাকে বলে ওরা জানে না! আড্ডা যাদের আছে ক্লব দিয়ে তারা করবে কি? আমাদের ক্লবের প্রচেষ্টা কলের পুতুলের হাত পা নাড়ার মতো, ওতে আবয়বিক সম্পূর্ণতা আছে, প্রাণের স্পন্দন নেই। যারা আড্ডাদেনেওলা জাত, তারা যে ঘর ভাড়া নিয়ে, চিঠির কাগজ ছাপিয়ে চাকরদের চাপরাশ পরিয়ে ক্লবের পত্তন করে, এর চেয়ে হাস্যকর এবং শোচনীয় আর কিছু আছে কিনা জানি না।

আড্ডা জিনিসটা সর্বভারতীয়, কিন্তু বাংলা দেশের সজল কোমল মাটিতেই তার পূর্ণ বিকাশ। আমাদের ঋতুগুলি যেমন কবিতা জাগায়, তেমনি আড্ডাও জমায়। আমাদের চৈত্র সন্ধ্যা, শ্রাবণের রিম্‌ঝিম্ দুপুর, শরতের জ্যোছনাঢালা রাত্রি, শীতের মধুর উজ্জ্বল সকাল—সবই আড্ডার নীরব ঘণ্টা বাজিয়ে যায়, কেউ শোনে, কেউ

শোনে না। যে দেশে শীত গ্রীষ্ম দুই-ই অতি তীব্র, সেখানে আড্ডার ক্ষীণতা অনিবার্য। বাংলার কমনীয় আবহাওয়ায় গাছপালার ঘন শ্যামলিমার মতোই আড্ডার উচ্ছ্বাস। ছেলেবেলা থেকে এই আড্ডার প্রেমে আমি আত্মহারা। সভায় যেতে আমার বুক কাঁপে, পার্টির নামে দৌড়ে পালাই, কিন্তু আড্ডা! ও না হ'লে আমি বাঁচি না। বলতে গেলে আড্ডার হাতে আমি মানুষ। বই পড়ে যা শিখেছি তার চেয়ে বেশি শিখেছি আড্ডা দিয়ে। বিশ্ববিদ্যাবৃক্ষের উচ্চশাখা থেকে আপাতরমণীয় ফলগুলি একটু সহজেই পেড়েছিলুম— যেটা আড্ডারই উপহার। আমার সাহিত্য রচনায় প্রধান নির্ভর-রূপেও আড্ডাকে বরণ করি। ছেলেবেলায় গুরুজনেরা আশঙ্কা করেছিলেন যে আড্ডায় আমার সর্বনাশ হবে, এখন দেখছি আড্ডায় আমার সর্বলাভ হলো। তাই শুধু উপাসক হ'য়ে আমার তৃপ্তি নেই, পুরোহিত হ'য়ে তার মহিমা প্রচার করতে বসেছি।

যে-কাপড় আমি ভালোবাসি আড্ডার ঠিক সেই কাপড়। ফর্শা, কিন্তু অত্যন্ত বেশি ফর্শা নয়, অনেকটা ঢোলা, প্রয়োজন পার হ'য়েও খানিকটা বাহুল্য আছে, স্পর্শ-কোমল, নমনীয়। গায়ের কোথাও কড়কড় করে না, হাত পা ছড়াতে হ'লে বাধা দেয় না, লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়তে চাইলে তাতেও মানা নেই। অথচ তা মলিন নয়, তাতে মাছের ঝোল কিংবা পানের পিক লাগেনি, কিংবা দাওয়ায় ব'সে গা-খোলা জটলার বেআব্রু শৈথিল্য তাকে কুঁচকিয়ে দেয়নি। তাতে আরাম আছে, অযত্ন নেই; তার স্বাচ্ছন্দ্য কোনোখানেই ছন্দোহীনতার নামান্তর নয়।

শুনতে মনে হয় যে ইচ্ছা করলেই আড্ডা দেয়া যায়। কিন্তু তার আত্মা বড়ো কোমল, বড়ো খামখেয়ালি তার মেজাজ, অতি সূক্ষ্ম কারণেই উপকরণের অবয়ব ত্যাগ ক'রে সে এমন অলক্ষ্যে উবে যায় যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বোঝা যায় না। আড্ডা দিতে গিয়ে প্রায়ই আমরা পরাবিদ্যার—মানে পড়া-বিদ্যার আসর জমাই, আর নয়তো

পরচর্চার চণ্ডীমণ্ডপ গ'ড়ে তুলি। হয়তো স্থির করলুম যে সপ্তাহে একদিন কি মাঝে দু দিন সভা ডাকবো, তাতে জ্ঞানীগুণীরা আসবেন এবং নানারকম সদালাপ হবে। পরিকল্পনাটি মনোরম তাতে সন্দেহ নেই। প্রথম কয়েকটি অধিবেশন এমন জমলো যে নিজেরাই অবাক হ'য়ে গেলাম, কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেলো যে সেটি আড্ডার স্বর্গ থেকে চ্যুত হ'য়ে কর্তব্যপালনের বন্ধ্যা জমিতে পতিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে যাওয়ার মতো নির্দিষ্ট দিনে যেখানে যেতে হয় তাকে, আর যাই হোক, আড্ডা বলা যায় না। কেননা আড্ডার প্রথম নিয়ম এই যে, তার কোনো নিয়মই নেই; সেটা যে অনিয়মিত, অসাময়িক, অনায়োজিত, সে বিষয়ে সচেতন হ'লেও চলবে না। ও যেন বেড়াতে যাবার জায়গা নয়, ও যেন বাড়ি; কাজের শেষে সেখানেই ফিরবো, এবং কাজ পালিয়ে যখন-তখন এসে পড়লেও কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না।

তাই ব'লে এমন নয় যে এলোমেলো ভাবে আড্ডা গ'ড়ে ওঠে, নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে তার পিছনে কোনো একজনের প্রচ্ছন্ন কিন্তু প্রখর রচনাশক্তি চাই, অনেকগুলি শর্তপূরণ হ'লে তবে আড্ডা ঠিক আড্ডা হ'য়ে ওঠে। একে-একে সেগুলি পেশ করি।

আড্ডায় সকলের মর্যাদা সমান হওয়া চাই। ব্যবহারিক জীবনে মানুষে-মানুষে নানারকম প্রভেদ অনিবার্য, কিন্তু সেই ভেদবুদ্ধি আপিসের কাপড়ের সঙ্গে-সঙ্গেই যারা ঝেড়ে ফেলতে না জানে, আড্ডার স্বাদ তারা কোনোদিন পাবে না। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি এতোই বড়ো যে তার মহিমা কখনো ভুলে থাকা যায় না, তাঁর পায়ের কাছে আমরা ভক্তের মতো বসবো, কিন্তু আমাদের আনন্দে তাঁর নিমন্ত্রণ নেই, কেননা তাঁর দৃষ্টিপাতেই আড্ডার ঝর্ণাধারা তুষার হ'য়ে জমে যাবে। আবার অন্যদের তুলনায় অনেকখানি নীচুতে যার মনের স্তর, তাকেও বাইরে রাখা দরকার, তাতে তারও শান্তি। আড্ডার লোকসংখ্যার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, ঊর্ধ্বসংখ্যা দশ কি

বারো, নিম্নতম তিন। দশ-বারো জনের বেশি হ'লে অ্যালবার্ট হল হ'য়ে ওঠে, কিংবা বিয়ে-বাড়িও হতে পারে ; আর যদি হয় ঠিক দুজন, তার সঙ্গে কূজনই মেলে—পদ্যেও, জীবনেও। যে-কজন থাকবেন তাঁদের স্বভাবের উপর-তলায় বৈচিত্র্য তো থাকবেই, কিন্তু নীচের তলায় মিল না থাকলে পদে পদে ছন্দপতন ঘটবে। অনুরাগ এবং পারস্পরিক জ্ঞাতিত্ববোধ স্বতঃই যাদের কাছে টানে, আড্ডা তাদেরই জন্য এবং তাদেরই মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত ; চেষ্টা ক'রে সংখ্যা বাড়াতে গেলে আড্ডার প্রাণ-পাখি কখন উড়ে পালাবে কেউ জানতেও পাবে না।

কিন্তু এমনও নয় যে ঐ কজন এক-সুরে-বাঁধা মানুষ একত্র হ'লেই আড্ডা জমে উঠবে। জায়গাটিও অনুকূল হওয়া চাই। আড্ডার জন্য ঘর ভাড়া করা আর শোক করার জন্য কাঁদুনে ভাড়া করা একই কথা। অধিগম্য বাড়িগুলির মধ্যে যেটির আবহাওয়া সবচেয়ে অনুকূল, সেই বাড়িই হবে আড্ডার প্রধান পীঠস্থান। সেই সঙ্গে একটি দুটি পারিপার্শ্বিক তীর্থ থাকাও ভালো, মাঝে মাঝে জায়গা বদলি করাটা মনের ফলকে শান দেয়ার শামিল। ঋতুর বৈচিত্র্য এবং চাঁদের ভাঙা-গড়া অনুসারে ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে ছাতে, এবং ছাত থেকে খোলা মাঠে বদলি হ'লে সেই সম্পূর্ণতা লাভ করা যায়, যা প্রকৃতিরই আপন হাতের সৃষ্টি। কিন্তু কোনো কারণেই, কোনো প্রলোভনেই ভুল জায়গায় যেন যাওয়া না হয়। ভুল জায়গায় মানুষগুলোকেও ভুল মনে হয়, ঠিক সুরটি কিছুতেই লাগে না।

আড্ডার জায়গাটিতে আরাম থাকবে পুরোপুরি, আড়ম্বর থাকবে না। আসবাব হবে নীচু, নরম, অত্যন্ত বেশি ঝকঝকে নয় ; যদি মরজি মতো অযথাস্থানে সরিয়ে নেবার আন্দাজ হালকা হয় তাহলে তো খুবই ভালো। চেয়ার-টেবিলের কাছাকাছি একটা ফরাশও থাকবে—যদি রাত বেড়ে যায়, কিংবা কেউ খুব ক্লান্ত থাকে, তাহলে শুয়ে পড়ার জন্য কারও অনুমতি নিতে হবে না। পানীয় থাকবে কাঁচের গেলাশে ঠাণ্ডা জল, আর পাতলা সাদা পেয়ালায় সোনালি সুগন্ধি চা ; আর

খাদ্য যদি কিছু থাকে তা হবে স্বাদু, স্বল্প, এবং শুকনো, যেন শুয়ে-শুয়েও খাওয়া যায়, আবার পরে হাত মুখ ধোবার জন্য উঠতে হয় না। বাসনগুলি জমকালো হবে না, পরিচ্ছন্ন হবে; এবং ভৃত্যদের ছুটি দিয়ে গৃহকর্ত্রী নিজেই যদি খাদ্য পানীয় নিয়ে আসেন এবং বিতরণ করেন তাহলেই আড্ডার যথার্থ মানরক্ষা হয়।

কথাবার্তা চলবে মসৃণ, মন্থর, স্বচ্ছন্দ স্রোতে তার জন্যে কোনো চেষ্টা কি চিন্তা থাকবে না; মনের মধ্যে যে-সব ঢেউ সব সময় উঠছে পড়ছে; কেজো দিনের আবর্তের তলায় যা চাপা প'ড়ে থাকে, কথাগুলি তারই যেন ছলছলানি। এখানে সংকোচ নেই; বিষয়-বুদ্ধি নেই, দায়িত্ববোধ নেই। ভালো কথা বলবার দায় নেই এখানে। ভালো কথা না আসে এমনি কথাই বলবো। এমনি কথারও যদি খেই হারিয়ে যায়, থাকবো চুপ ক'রে—চুপ ক'রে থাকতে ভয় কিসের। জোর ক'রে মেকি কথার অবতারণার চাইতে ঢের ভালো চুপ ক'রে থাকা। নানা কথার টানা-পোড়েনে যে কাপড়টি বোনা হয়, চুপ ক'রে থাকা তো তারই সোনালি পাড়। পাড় জিনিসটা কাপড়কে রূপ দেয়, চুপ করে থাকাটা কথাকে সুস্পষ্ট ক'রে তোলে। এই জন্যই চুপ ক'রে থাকাকে যাঁরা বুদ্ধির পরাভব কিংবা সৌজন্যের ত্রুটি ব'লে মনে করেন, আড্ডা জিনিসটা তাঁরা বোঝেন না। তার্কিক এবং পেশাদার হাস্যরসিক, আড্ডায় এই দুই শ্রেণীর মানুষের প্রবেশ নিষেধ। যাঁরা প্রাজ্ঞজন কিংবা যাঁরা লোকহিতে বদ্ধপরিকর, তাঁদের সম্মানও বাইরে রাখতে হবে। কেননা আড্ডার ইডেন থেকে যে সূক্ষ্ম সর্প বারবার আমাদের ভ্রষ্ট করে তারই নাম উদ্দেশ্য, যত মহতই হোক, কিংবা যত তুচ্ছই হোক, কোনো উদ্দেশ্যকে ভ্রমক্রমেও কখনো ঢুকতে দিতে নেই। এটা ধ'রে নিতে হবে যে আড্ডা কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নয়; তা থেকে কোনো কাজ হবে না, নিজের কিংবা অন্যের কিছুমাত্র উপকার হবে না। আড্ডা বিশুদ্ধ; নিষ্কাম, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

শুধু পুরুষদের নিয়ে কিংবা শুধু মেয়েদের নিয়ে আড্ডা জমে না। শুধু পুরুষরা একত্র হ'লে কথার গাড়ি শেষ পর্যন্ত কাজের লাইন ধ'রেই চলবে, আবার কখনো লাইন থেকে চ্যুত হ'লে গড়াতে গড়াতে একেবারে সুরুচির সীমাও পেরিয়ে যাবে হয়তো। শুধু মেয়েরা একত্র হ'লে ঘরকন্না, ছেলেপুলে, শাড়ি-গয়নার কথা কেউ ঠেকাতে পারবে না। আড্ডার উন্মীলন স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রণে। মেয়েরা কাছে থাকলে পুরুষের, এবং পুরুষ কাছে থাকলে মেয়েদের রসনা মার্জিত হয়, কণ্ঠস্বর নীচু পরদায় থাকে, অঙ্গভঙ্গি শ্রীহীন হ'তে পারে না। মেয়েরা দেন তাঁদের স্নেহ, তাঁদের লাবণ্য, ন্যূনতম অনুষ্ঠানের সূক্ষ্মতম বন্ধন; পুরুষ আনে তার ঘর-ছাড়া মনের উদ্দামতা। বিচ্ছিন্নভাবে মেয়েদের দ্বারা এবং পুরুষের দ্বারা পৃথিবীতে অনেক ছোটোবড়ো কাজ হ'য়ে থাকে; ছন্দ হয় দুয়ের মিলনে।

আড্ডা স্থিতিশীল নয়, নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপের বদল হয়। মন যখন যা চায়, তাই পাওয়া যায় আড্ডাতে। কখনো কৌতুকে উজ্জ্বল, কখনো খামকা ভালো লাগায় ভরপুর, কখনো স্বপ্নে মদির। বুদ্ধিতে লাগে হৃদয়ের স্পর্শ, হৃদয়ে পড়ে বুদ্ধির আলো। আড্ডা যা দিতে পারে, আর কিছুই তা পারে না। আর কিছুই আড্ডার মতো নয়। বিশ্বসভায় অখ্যাতির কোণে আমরা নির্বাসিত; যারা ব্যস্ত এবং মস্ত জাত, যাদের কৃপাকটাক্ষ প্রতি মুহূর্তে আমাদের বুকে এসে বিঁধছে, তারা এখনো জানে না যে পৃথিবীর সভ্যতায় আড্ডা আমাদের অতুলনীয় দান। যারা ছিলো বিশ্বজয়ী তারা আজ স্বরচিত পুঞ্জ-পুঞ্জ উপকরণের তলায় চাপা প'ড়ে মরছে—প্রকৃতির প্রতিশোধের হাত থেকে তো বিশ্বজয়ীরও নিস্তার নেই। এই প্রায়শ্চিত্তের মহাযজ্ঞ যখন শেষ হবে, তখন নবজন্মের দুয়ার খুলে বেরিয়ে পড়বো আমরা, অস্ত্র নিয়ে নয়, মানদণ্ড নিয়ে নয়, ধর্মগ্রন্থ নিয়েও নয়, বেরিয়ে পড়বো নিশান উড়িয়ে, বিশুদ্ধ বেঁচে থাকার মন্ত্র নিয়ে, আনন্দের উদ্দেশ্যহীন ব্রত নিয়ে, আড্ডা দিয়ে পৃথিবী জয়

করবো আমরা, জয় করবো কিন্তু ধ'রে রাখবো না; কেননা আমরা জানি যে ধ'রে রাখতে গেলেই হারাতে হয়, ছেড়ে দিলেই পাওয়া যায়। পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতি বলে, কাড়ো; আমাদের আড্ডা-নীতি বলে, ছাড়ো।

উত্তর তিরিশ। ১৯৪৫ ॥

বিকিকিনি

পরিমল রায়

আজকাল পুস্তকের দোকানগুলিতে পুস্তক ব্যতীত আরো নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফ্ল্যাট ফাইল আছে ?" দেখিবেন, দোকানী ক্ষণমধ্যে একখানি ডিক্‌শনারি আনিয়া হাজির করিয়াছে। আপনার আভিধানিক প্রয়োজন হয়তো আপাততঃ নাই। সুতরাং আপনি আশ্চর্য এবং ততোধিক বিরক্ত হইয়া বলিবেন, "এ কী আনলেন, মশায় ? আমি চাইলাম ফ্ল্যাট ফাইল।" দোকানী অবিচলিত কণ্ঠে বলিবে, "কেন, এগুলো তো আজকাল খুব চলছে। নিয়ে যান না এক কপি।"

আপনি পুনরায় আপনার প্রয়োজন নিবেদন করিবেন : "শুনতে ভুল ক'রে থাকবেন। আমি ডিক্‌শনারি চাইনি! ফ্ল্যাট ফাইল আছে ?"

"হ্যাঁ, সে তো শুনেছি, ফ্ল্যাট ফাইল চাইছেন। না সে এখন ষ্টকে নেই। তা' এর এক কপি—"

অতঃপর আর দোকানে সময় নষ্ট করা চলে না। আপনি অন্যত্র বাহির হইবেন।

যাহা বলিলাম, খুব একটা অতিরঞ্জন নহে। কোনো কোনো দোকানের নিয়মই হইল—না, খদ্দের চটানো নহে—তাহার প্রয়োজন সৃষ্টি করা। ফ্ল্যাট ফাইল নাই তো কী হইয়াছে? ডিক্‌শনারি তো আছে। উহা যে আপনার লাগিবেই না, এমন কথা শপথ করিয়া বলিতে পারেন না। দোকান হইতে বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ছেলেটা একটা ডিক্‌শনারির জন্য সত্যই বড়ো আবদার করিতেছে। নিয়া যাইব নাকি এক কপি ? কিছু বলা যায় না, হয়তো পুনরায় দোকানে ঢুকিয়া ফ্ল্যাট ফাইলের পরিবর্তে একখানি অভিধান লইয়া বাড়ি ফিরিলেন।

এরূপ হামেশাই ঘটিতেছে, এবং আমার মনে হয়, এই ধরনের দোকানীদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কেনাকাটায় বাহির হইয়া প্রয়োজনগুলি প্রায়ই মনে থাকে না। ফলে তিন মাইল পথ দুই বার দৌড়াতে হয়। ইহারা সেই পথশ্রান্তি দূর করেন বলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। অনেকে কিন্তু বিরক্ত হন। সেটা ঠিক নহে। প্রথমটায় একটু বিরক্ত হইবারই কথা। এক ঘটি জলের পরিবর্তে তৃষ্ণার্তের নিকট একটি বিম্বফল আনিয়া হাজির করিলে ক্রোধ অনিবার্য। কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝিবেন, অভিধানখানি আনা হইয়াছে নিতান্তই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে, সেই মুহূর্তেই আপনার রাগ পড়িয়া যাইবে। অবশ্য ফ্ল্যাট ফাইলের প্রশ্নটি নিষ্পত্তি হইয়া যাইবার পরই অভিধানের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা উচিত। কিন্তু দোকানীর দিক হইতে যদি বিষয়টি বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আর ও কথা বলিবেন না। "ফ্ল্যাট ফাইল নাই" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তো আপনি চলিয়া যাইবেন, অভিধান সন্দর্শন কখন ঘটিবে? সুতরাং ঐ পথ অবলম্বন ব্যতীত দোকানীর গত্যন্তর নাই।

অনেকে বলেন, দোকানীর পক্ষে এই প্রকার দুষ্ট ফন্দিতে জিনিস গছাইয়া দেওয়া নিতান্তই জুলুম। কিনিতে গেলাম খোকনের জন্য ধারাপাত, কিনিয়া ফিরিলাম খোকনের মায়ের জন্য সীবনশিক্ষা। কিন্তু ইহাতে ফন্দিটাই বা কী, জুলুমটাই বা কোথায়? বিজ্ঞাপনকে জুলুম বলিবেন কী হিসাবে? বাজারে খদ্দেরই রাজা। তাহার উপরে কথা বলে কাহার সাধ্য। বিক্রেতা কেবল অভিধানখানি দেখাইতেই পারে, কিন্তু কিনিবেন কিনা, সে আপনার মর্জি। অবশ্য বলিতে পারেন, উহারা লোভ দেখায় কেন? চোখ-কান বুজিয়া একগজ মার্কিন কিনিয়া বাড়ি ফিরিবার কথা, তা নহে তো রাজ্যের শাড়ি আর ব্লাউস্-পিস আনিয়া হাজির। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে তো কথাই নাই, একা গেলেও উহার দু একখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতেই বাণ্ডিল-ভুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও দোকানীকে দোষ দেওয়া চলে না।

মিষ্টান্নের দোকানে গিয়া আপনি অবশ্যই আশা করিতে পারেন না যে, আপনাকে দেখিবামাত্র উহারা সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি উৎকৃষ্ট সামগ্রীগুলি সরাইয়া ফেলিতে থাকিবে, যাহাতে দু একখানি তেলেভাজা জিলিপি কিনিয়াই আপনি হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিতে পারেন।

কথাটি মনে ধরিল না বুঝি? আচ্ছা, অন্য এক রকম দোকানের কথা ভাবিয়া দেখুন। ছাতাটি বন্ধ করিয়া দোকানে গিয়া উঠিলেন। আপনাকে দেখিয়া কেহ সম্ভাষণও করিল না, আগাইয়াও আসিল না। যে যাহার স্থানটিতে মহা বৈরাগ্যভরে উপবিষ্ট হইয়া রহিল। আপনি নির্বোধের মত ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৎপর দ্বিধাসহকারে একজনের দিকে অগ্রসর হইতেই সে প্রকাণ্ড এক হাই তুলিল। আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমুক দ্রব্যটি আছে?" হাই তখনও শেষ হয় নাই। সেই আল-জিহ্বা-প্রদর্শিত মুখব্যাদানের বিকৃত ভঙ্গিটি না মিলাইবার পূর্বে কণ্ঠ হইতে একটি মিশ্র ধ্বনি উদ্গত হইয়া আসিল। উহা যে নঞ্-বোধক তাহা মালুম হইল সমসাময়িক হস্ত সঞ্চালনের ইঙ্গিতে। বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

এখন বলুন, দুই-চারিটা উৎকৃষ্ট জিনিসের নমুনা দেখা ভালো, না ঐ বিশ্বরূপ দর্শনই বাঞ্ছনীয়?

বাজারে যাওয়া আর দোকানে যাওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে। তফাৎটা হইল, বাজারে দরদস্তুর করা চলে, দোকানে চলে না।

"দাম কত?"

"ডে-ট্রাকা।"

"বলেন কী? এই জিনিসই তো ঐ দোকানে দেখে এলাম পাঁচসিকে।" আপনি ভাবিলেন খুব জব্দ করা গিয়াছে। কিন্তু দোকানী কি বলিবে, জানেন?

"তাহলে ওখান থেকেই নিন গে।"

বলিয়া পরম নিরুদ্বেগে অন্য খদ্দেরের প্রতি মনোনিবেশ করিবে। আবার কোথাও দেড় টাকা দাম শুনিয়া যদি পাঁচ সিকার প্রস্তাব করেন,

তাহা হইলে ঈষৎ উন্নাসিকতা সহকারে কিঞ্চিৎ আশ্চর্যান্বিতভাবে দোকানী বলিবে, "দরাদরি কচ্ছেন? এখানে ওসব নেই," এবং এমন সুরে যে, আপনি লজ্জিত হইবেন। মনে হইবে, তাই তো, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরগণ আমাদের সুবিধার নিমিত্ত দয়া করিয়া পসরা সাজাইয়া বসিয়াছে, আর আমি কিনা চার আনা পয়সা ঠকাইয়া জিনিসটি হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

কিন্তু এই দুইটির কোনোটিই দোকনীর পক্ষে প্রশংসনীয় নহে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগসূত্রই হইল জিনিষের দাম। দেড় টাকাই যে উপযুক্ত এবং ন্যায্য মূল্য তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করাটা দোকানীর দায়। ঔদাসীন্য, তাচ্ছিল্য কিংবা অপমানসূচক কথা এস্থলে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। 'মূল্য' জিনিসটি আলোচনার বিষয়। মাথা বিক্রয় করিয়া জিনিস কিনিবার জন্য কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। দাম যদি একটু বেশি লইতে হয়, বেশিটার জন্য জিনিসটিকে একটু শিষ্টতার মোড়কে বাঁধিয়া হাতে তুলিয়া দেওয়া দোকানীর কর্তব্য।

সাহেবী দোকানে কোনোদিন গিয়াছেন? মেমসাহেব আপনাকে দেখিবামাত্র হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, "আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করিয়া ধন্য হইতে পারি?"

আপনি হয়তো বলিবেন, "আমার একটি ঝর্ণা কলমের প্রয়োজন।"

মেমসাহেব কৃতার্থ: "অতি আনন্দের কথা। ইজ্ ইট্ টু বি এ গিফ্ট্ ফর দি লেইডি?" বলিয়া বত্রিশখানি লেডিজ ফাউন্টেন পেন আপনার সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া বসিবে। ইহা শিষ্টতার চূড়ান্ত চাতুরী। এতখানির প্রয়োজন নাই, উচিতও নহে। তবে ক্রেতা বিরক্ত হইয়া না ফেরে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা দোকানীর কর্তব্য।

সাহেবী দোকানের অনুকরণে ইদানীং কোনো কোনো দিশি দোকানে (বিশেষতঃ কাপড়ের দোকানে, কাপড় কিনিতে অনেক সময় যায়) ভদ্রতা পরিবেশন সুরু হইয়াছে। কেবল মিষ্ট হাসি নহে, পান-সিগারেটের বন্দোবস্তও থাকিতে দেখা যায়। কাউন্টারে এদেশে

এখনো নারীর আবির্ভাব হয় নাই। সুতরাং হাসিটা ঠিক রমণীয় হয় না বলিয়া তাম্বুলাদির আয়োজন রাখিতে হয়। আপনি দোকানে প্রবেশ করিতেই পাঁচ-ছয় জোড়া বিকশিত দন্তপংক্তি আপনাকে অভ্যর্থনা করিবে। ভাবটা, আপনি কালেভদ্রে এখান হইতে দু এক গজ লংক্লথ কিনিয়া লইয়া যান বলিয়াই না উহারা এখন পর্যন্ত কোনো প্রকারে টিকিয়া আছে! একটি বিষয়ে কিন্তু সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার। যদি পাসিং-শো খাইবার অভ্যাস না থাকে, তাহা হইলে নিজের একটি ধরাইয়া দোকানে প্রবেশ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

এযাবৎ কেবল বিক্রেতার কথা বলিয়াছি। এবার অপরপক্ষ সম্বন্ধে দু একটি কথা বলি। ক্রেতার দিক হইতে যে একেবারেই কোনো ত্রুটি নাই, তাহা নহে। তাঁহাদেরও কোনো কোনো বিষয়ে দোষ দেখা যায়। মূল্যের ব্যাপারটাই ধরুন। দেড় টাকা চাহিলে চোদ্দ পয়সায় দিবে কিনা এইরূপ বিজাতীয় অনুসন্ধান না করাই ভালো। উহাতে কোনো পক্ষের সুবিধা হইবার কথা নহে, বরং বৃথা সময়ের অপচয়। এ বিষয়ে মেয়েদেরই বেশি নির্লজ্জ হইতে দেখা যায়। মেয়ে মাত্রেরই ধারণা, তাহার চটকে (সে যে-কারণেই হউক) ষোলো আনা হইতে বারো আনাই ঠিকরাইয়া পড়িবে।

মেয়েদের আর একটি দোষ দেখা যায় দ্রব্য নির্বাচন ব্যাপারে। ইঁহারা কি চান তাহা জানেন না, কী চান না, তাহাই কেবল বলিতে পারেন। ফলে, কাপড়ের দোকানে শাড়ির উপর শাড়ি পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠে, স্টেশনারি দোকানে হরেক রকম জিনিসে কাউণ্টার বোঝাই হইয়া যায়, জুতার দোকানে গিয়া আবিষ্কৃত হয়, ঠিক তাঁহার পছন্দ মাফিক জোড়াটিই এখন পর্যন্ত তৈরি হইয়া আসে নাই। আপনি যদি ইঁহার সাথী হইয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে লজ্জিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। যদি একটা কিছু সমাধা তাড়াতাড়ি করাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় বলেন, "এই শাড়িটাই নাও না," শুনিবেন, উহার পাড়টি অত্যন্ত বোকা বোকা। "তাহলে এটা?" উহার রঙের

বোকামিটা আরো ঘোরতর। শাড়ির অরণ্যের মধ্যে চালাক শাড়িটি আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। জুতা কিনিতে গিয়া যখন দোকানের সমস্ত বাক্সগুলি নামানো হইয়া গিয়াছে, তখন দেখিবেন, আপনার সঙ্গিনী অম্লানবদনে বলিতেছেন, পাশের দোকানটা দেখে আসি। সেখানে আবার সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। এই সময়ে বাহিরে আসিয়া যদি দুই দোকানের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়ান, তাহা হইলে দেখিবেন, এক দোকানে জুতা র‍্যাকের উপর উঠিতেছে, আর দোকানে জুতা র‍্যাক হইতে নামিতেছে।

ক্রেতার আর কটি দোষ উল্লেখযোগ্য। সেটি হইল জিনিস অন্যায়ভাবে পরীক্ষা করা। স্নো কিংবা ক্রীম কিনিতে গিয়া পট্ হইতে এক খাবলা আঙুলে উঠাইয়া লওয়া (মেয়েরা হয়তো একটু মাখিয়াও দেখেন), চিরুণীর ধার নির্ণয়ের জন্য উহা মাথার চুলে চালাইয়া দেখা, ব্লেড কিনিতে গিয়া মরিচার সন্ধানে মোড়কটি আদ্যোপান্ত খুলিয়া ফেলা, টুথ ব্রাশটি ভোঁতা কিনা বুঝিবার জন্য হাতের তেলোতে ক্ষৌরকারের ক্ষুর চালানোর পদ্ধতিতে বার কতক ঘষিয়া দেখা ইত্যাদি। যদি অপছন্দ হয়, জিনিসগুলি অল্পবিস্তর নষ্ট হইয়া রহিল, তাহাতে দোকানীর ক্ষতি। এটুকু বিবেচনা ক্রেতার থাকা উচিত, এবং জিনিস পরীক্ষার সময় কোনো ক্ষতিকর প্রণালী অবলম্বন করা কখনোই শোভনীয় নহে।

জিনিস দেখিয়া বেড়ানো কোনো কোনো ব্যক্তির ব্যসন। কিনিবার উপস্থিত বাসনা কিংবা শক্তি নাই, তবে নয়নান্দটাই মন্দ কি ? অনেক অবসরপ্রাপ্তগণ বাজারে বেড়াইতে যান। চাউলের দর কত চড়িল, ইলিশ মৎস্যের আয়তন আরেকটু বাড়িল কিনা, নূতন গুড় কবে উঠিবে ইত্যাদি মহামূল্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইঁহারা বাড়ি ফেরেন। দোকানে দোকানে কাচের আলমারি দেখিয়া বেড়ানোটাই খুব নির্দোষ আমোদ। ঘ্রাণে ও দর্শনে অর্ধেক ভোজ হইয়া যায়। কিন্তু যাহারা না-বাজার না-দোকান অর্থাৎ যাহারা ফেরিওয়ালা, তাহাদের পক্ষে এই

ব্যসন অত্যন্ত মারাত্মক। হরেকরকম ছিট এবং বহুবিধ কটাহ্ সন্দর্শনের পর গৃহিণী অত্যন্ত নির্বিকার চিত্তে দ্বাররুদ্ধ করিয়া কার্যান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। ফেরীওয়ালার বহু সময় নষ্ট হইল। একখানি জিনিসও বিকাইল না। তবে, মুটেটার কিছুটা বিশ্রাম হইল।

বোধ হয় মমতাময়ীর উহাই আসল উদ্দেশ্য ছিল।

ইদানীং। আশ্বিন ১৩৫৬॥

আধুনিকা

যাযাবর

পশ্চিমের শিক্ষা, সভ্যতা ও ভাবধারা আমাদের দেশে এনেছে নূতন আবেষ্টন। তার ফলে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের কর্মে এবং চিন্তায়। আমাদের আহার, বিহার, বসন, ভূষণ বদল হয়েছে। বদল হয়েছে রীতি, নীতি ও ধ্যান-ধারণা। এতকাল নারীকে আমরা শুধুমাত্র পুরুষের আত্মীয় রূপেই দেখেছি। সে আমাদের ঠাকুমা, দিদিমা, মাসি, পিসি, দিদি, বৌদি কিংবা শ্যালিকা। কিন্তু জননী, জায়া এবং অনুজা ছাড়াও নারীর যে আরও একটি অভিনব পরিচয় আছে, সে সম্পর্কে আমরা বর্তমানে সচেতন হয়েছি। তার নাম সখী।

প্রাণীজগতের মতো মনোজগতেরও বিবর্তন আছে। তার ফলে বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি বা নীতির মূল্য সম্পর্কে আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। নারীর মূল্যেরও যুগে যুগে তারতম্য ঘটেছে।

একদা সমাজে মায়ের স্থান ছিলো সর্বপ্রধান। সেদিন পরিবার পরিচালনা থেকে বংশ-পরিচয় এবং উত্তরাধিকার নির্ণীত হতো মাতার নির্দেশ, সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক দিয়ে। ক্রমে এই ম্যাট্রিয়ার্কল ফেমিলী বিলুপ্ত হলো। রাজমাতার চাইতে রাজরানীর মর্যাদা হলো অধিক। সাধারণ পরিবারেরও পরিধি পরিমিত হলো। সংসারের কর্ত্রী হলেন জননী নয়, গৃহিণী। ছেলেরা মায়ের কোল ছেড়ে বউএর আঁচলে আত্মসমর্পণ করলো।

বলা বাহুল্য, এই হস্তান্তরের ফলে মায়েরা খুশি হলেন না। কেউ কেউ অধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ফল হলো না। হার হলো তাঁদেরই, শুধু বউকাঁটকী শাশুড়ী আখ্যা পেয়ে নাটক, নভেলে তাঁরা নিন্দিত হলেন। যাঁরা বুদ্ধিমতী, তাঁরা কালের লিখন পাঠ করলেন দেয়ালে, মেনে নিলেন অবধারিত বিধি। নিঃশব্দে,—কিন্তু স্বচ্ছন্দ চিত্তে নয়। জগতের সমস্ত বিক্ষুব্ধ মাতৃকুলের অনুক্ত

অভিযোগ আজও জেগে রইলো বধূশাসিত আধুনিক গৃহের বিরুদ্ধে। য়ুরোপ ও আমেরিকার সমাজে পত্নীকর্তৃত্ব পুরোপুরি স্বীকৃত। বিবাহের পরে ছেলের সংসারে তার মায়ের স্থান নেই, কিংবা থাকলেও সে স্থান উল্লেখযোগ্য নয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের লুপ্ত অকারচিহ্নের মতো তাঁর অস্তিত্ব আছে, গুরুত্ব নেই।

কিন্তু স্ত্রী বলতে যেদিন ভাবী সন্তানের গর্ভধারিণী বা গৃহকর্ত্রী মাত্র বুঝতেম, সেদিনও বিগত। স্ত্রীর মধ্যে চাই সচিব সখীমিথ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। কিন্তু একজনের কাছে এতখানি প্রত্যাশা করা শুধু কালিদাসের কাব্যেই শোভা পায়, বাস্তবক্ষেত্রে নয়।

এ যুগের পুরুষের কাছে ঘরের চাইতে বাইরের ডাক বেশী। সে দশটা পাঁচটায় আপিসে যায়, কারখানায় খাটে, শেয়ার মার্কেটে ঘোরে। সেখান থেকে টেনিস, রেস, কিংবা মিটিং। রাত্রিতে ক্লাব, অথবা সিনেমা। এর মধ্যে গৃহের স্থান নেই, গৃহিণীরও আবশ্যকতা নেই। আগে সস্ত্রীক ধর্মাচরণ করতে হতো। যাগ-যজ্ঞ-ব্রত-পার্বণে প্রয়োজন ছিলো ভার্যায়। কিন্তু ধর্ম এখন শুধু ইলেকশনে ভোট সংগ্রহ ছাড়া ভারতবর্ষেও বড়ো একটা কাজে লাগে না। তাই এ যুগে সহধর্মিণীর চাইতে সহকর্মিণীকে নিয়ে বেশি রোমান্স লেখা হয়।

পুরুষের জীবনে আজ গৃহ ও গৃহিণীর প্রয়োজন সামান্যই। তার খাওয়ার জন্যে আছে রেস্তোরাঁ, শোয়ার জন্য হোটেল, রোগে-পরিচর্যার জন্য হাসপাতাল ও নার্স। সন্তান-সন্ততিদের লালনপালন ও শিক্ষার জন্য স্ত্রীর যে অপরিহার্যতা ছিলো বোর্ডিং-স্কুল ও চিলড্রেনস-হোমের উদ্ভব হ'য়ে তারও সমাধা হয়েছে। তাই স্ত্রীর প্রভাব ক্রমশঃ সংকুচিত হ'য়ে ঠেকেছে এসে সাহচর্যে। সে পত্নীর চাইতে বেশিটা বান্ধবী, সে কর্ত্রীও নয়, ধাত্রীও নয়,—সে সহচরী।

নারীর পক্ষেও স্বামীর সম্পর্ক এখন পূর্বের ন্যায় ব্যাপক নয়। একদিন স্বামীর প্রয়োজন মুখ্যতঃ ছিলো ভরণ, পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের। কিন্তু এযুগের স্ত্রীরা একান্তভাবে স্বামী-উপজীবিনী নয়।

তারাও দরকার হ'লে আপিসে খেটে টাকা আনতে পারে। তাই স্বামীর গুরুত্ব এখন প্রধানতঃ ভর্তারূপে নয়, বন্ধুরূপে।

ভারতবর্ষও এই নব ভাবধারার বন্যাকে এড়িয়ে থাকতে পারে নি। ঢেউ এসে লেগেছে তার সমাজের উপকূলে। আমাদেরও পরিবার ক্রমশঃ ক্ষুদ্রকায় হচ্ছে, আত্মীয় পরিজনের সম্বন্ধ সংকীর্ণ হচ্ছে। গ্রাম্য সভ্যতার ভিত বিধ্বস্ত, কলকারখানাকে কেন্দ্র ক'রে নগর-নগরীর বিস্তৃতি ঘটছে ধীরে ধীরে। তার সঙ্গে নূতন সভ্যতা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন জীবন-ধর্মের উদ্ভব অপরিহার্য।

এদেশেও পুরুষের জীবনে এবার আবির্ভূত হয়েছে সখী; নারীর জীবনে সখা। সেটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে তর্ক করতে পারো, মনু পরাশর উদ্ধৃত ক'রে মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখতে পারো। কিন্তু তাকে ঠেকাতে পারবে না।

স্ত্রী-পুরুষের জীবনে সখাসখীর যে উপলব্ধি, তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সমাজকর্তারা একেবারে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু পতিকে পরমগুরু এবং পত্নীকে সেবিকা বানিয়ে দাম্পত্যে তাঁরা সখীত্বের অবকাশ রাখতে পারেন নি। ট্রান্সফারড্ এপিথেটের মতো সেটা পুরুষের পক্ষে বউদি এবং স্ত্রীর পক্ষে দেবরের উপর ন্যস্ত করে-ছিলেন। সংসারে এর চাইতে মধুরতর সম্পর্ক আমার জানা নেই।

সীতার সাথী ছিলেন লক্ষ্মণ, তাঁর অপর কোনো বন্ধুর প্রয়োজন ছিলো না। বুড়ো হ'লেও ঋষি বাল্মীকি সে-কথা জানতেন। পাঞ্চালীর পাঁচ পাঁচটা স্বামী থাকতেও একটি দেবরের অভাব ঘোচেনি। তাই বেদব্যাসকে আনতে হলো,—শ্রীকৃষ্ণ। তিনি দ্রৌপদীর সখা,—সংকটে শরণ্য এবং সম্পদে স্মরণীয়।

এযুগে জীবন যাত্রার উপচার বহুবিধ এবং ব্যয়সাধ্য। যে-লোক দু'শ টাকা পায় তার পক্ষে বউকে কাছে রাখাই কঠিন, বউদি দূরে থাক। মেয়েরাও জানেন, পণের টাকা ও সোনার হার না হ'লে বরই জুটবে না অনেকের, দেবর তো পরের কথা। তাই আধুনিকারা ঘা

খেয়ে মন দিয়ে মেনে নিয়েছেন যে, বেশি আশা ক'রে ফল নেই, একটি নির্ভরযোগ্য সহৃদয় বন্ধু পেলেই ভাগ্য। আধুনিকেরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছেন যে, অনেক লোভে লাভ নেই, তার চেয়ে বরং চাই শুধু একটি বান্ধবী। প্রিয়বান্ধবী।

কিন্তু সাধারণ হিন্দু পরিবারে অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্বের পথ উন্মুক্ত নয়। সাধারণ মুসলমান পরিবারেরও নয়। সেখানে বান্ধবীর স্বীকৃতি মাত্র নেই। সেখানে পুরুষের জীবনে প্রথম যে অনাত্মীয়া নারীর সান্নিধ্য ঘটে, তিনি নিজের স্ত্রী। তাই ক্লাবে-পার্টিতে বিলাত ফেরত ও বড় চাক্‌রেদের ড্রয়িংরুমে তরুণের দল আসে। কাউকে ডাকে ললিতাদি, কাউকে বলে বীণাবউদি, কাউকে বা শুধু পদবীর আগে 'মিস' বা 'মিসেস' জুড়ে দিয়ে সম্বোধন করে—মিস্ গুপ্ত, মিস্ আয়েঙ্গার বা মিসেস্ সোনেরা জাহীর।

দৃষ্টিপাত। পৌষ ১৩৫৩ ॥

মধুসংহিতা

সুবোধ ঘোষ

ওঁ মধু! মধু! মধু!

মন্ত্রোচ্চারণ করছি না। নিছক পেটুকে আহ্বান মধু নামে একটি খাদ্যবস্তুকেই অভিনন্দন জানাই। পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে মধুর চেয়ে রোমান্টিক খাদ্য আর কি হ'তে পারে? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাসায়নিকের জ্ঞানের অহংকারকে খর্ব ক'রে দিয়ে একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গ আজও পৃথিবীর কুঞ্জে-কাননে যে রসাল কীর্তি রচনা ক'রে চলেছে, তারই দানের গুণে যুগ যুগ ধ'রে মানুষের গলা মিষ্টি হয়েছে। কবি সেক্সপীয়ারের কাছে আমাদের এই ক্ষুদ্র পতঙ্গটি শ্রদ্ধা আদায় ক'রে ছেড়েছে—

........So work the honey bees,
Creatures that, by rule in nature, teach
The art of order to a peopled kingdom

মধুপ্রীত কবি ভার্জিল হুলায়ুধ মৌমাছিকে 'কালো আঙুর' ব'লে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

* * * * *

জীবনের সর্ব আচরণে আমরা আন্তরিকভাবে মধুরতাকে কামনা করি। ওঁর স্বভাব মধুর, তাঁর দৃষ্টি মধুর, ছোটো ছেলেটির হাসি কী মধুর! মানুষের জীবনের যত প্রাপ্য ও কাম্যের প্রকৃতিকে অজস্র ভাষা দিয়েও যখন বুঝিয়ে উঠতে পারি না, তখন একটি মাত্র উপমা দিয়ে তা প্রকাশ ক'রে ফেলি—মধুর! সকল মনের মাধুরী মিশায়ে মানুষ একমাত্র তাকেই রচনা করতে চায়, জীবনের ঊর্ধ্বলোকে যা অপ্রত্যক্ষের রহস্য হ'য়ে আছে। চরন্ ইব মধু বিন্দতি—যুগ যুগ ধ'রে আমরা যে এগিয়ে চলেছি তার প্রাপ্তি ও আনন্দ একমাত্র মধুর সঙ্গেই তুলনীয়।

মধু আমাদের জীবনের মাঙ্গলিক উপচারের মধ্যে একটি। রাজ্য অভিষেকের কাজে মধু চাই, শিশুর জাতকৃত্যে মধু চাই। কবি ভার্জিল মধুর বন্দনা করেছেন। মধু ও মধুপতঙ্গ আরিস্টটলের প্রিয় ছিলো, মেটারলিঙ্ক জীবনের দর্শনকেই মধুময়রূপে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন।

সারা পৃথিবীর আয়ুঃশাস্ত্রী পণ্ডিত ও চিকিৎসকের দল মুক্তকণ্ঠে মধুর মহিমাকে স্বীকার ক'রে গেছেন। আয়ু-কান্তি-মেধা—জীবনের স্বরূপকে সুন্দর করার আয়োজনে মধুর চেয়ে মধুরতর কিছু আর হ'তে পারে না। আমাদের ভাষায় 'মধু' আজও নিরুপম হ'য়ে রয়েছে, মধুর সঙ্গে আমরা অন্যকে তুলনা করি, মধুকে কারও সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

* * * * *

মধুকে নিছক খাদ্য আখ্যা দিলে যেন এর গৌরবকে ছোটো করা হয়। আধুনিক রাসায়নিকের লেবরেটরীতে হাজার টন নকল শর্করা তৈরী হ'তে পারে, কিন্তু 'মধু' হবে না। মানুষের বুদ্ধির চেয়ে একটি ছোটো পতঙ্গের প্রবৃত্তি যে সূক্ষ্মতায় ও দক্ষতায় এখনো কত বেশি উন্নত হ'য়ে আছে, তার প্রমাণ এই মধু। দিনের আলো দেখা দিতে না দিতে এই কোটি কোটি পতঙ্গ-কেমিষ্টের ঘুম ভেঙ্গে যায়। চাক ছেড়ে উড়ে চ'লে যায় দূরে ও সুদূরে—বনে উপবনে। ডি-এস-সি ডিগ্রী নেই, তবুও ফুলের বুকে কোথায় তার মধুময় আত্মাটি লুকিয়ে আছে, তার সন্ধান বিনা মাইক্রোস্কোপে খুঁজে বার করে। নিরাস্বাদ জগত থেকে এক বিচিত্র স্বাদুতা আহরণ ক'রে নিয়ে যায়। জড় ও জঙ্গমের জগতে এক গোপন পদার্থলীলাকে সে বন্দী করে, সুললিত করে, তাকে মধুতে পরিণত করে। মধুর মধ্যে তাই যেন মহাকাব্যের আস্বাদ আছে।

* * * * *

একটা আশঙ্কার বিষয়, আমাদের মধ্যে তবুও মধু সম্বন্ধে একটা উদাসীনতা এসেছে। আগে ছিলো না, এটা বর্তমানের লক্ষণ। এই লক্ষণটা যেন পরোক্ষভাবে আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক দীনতাটুকু স্মরণ

করিয়ে দেয়। মধুকে খাদ্য হিসাবেও আহ্বান করতে আমরা আজ ভুলে গেছি। স্যাকারিন-উপাসনার যুগে আমাদের এ ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু এ ভুল বড়ো ভয়ানক ভুল। মধু কালচার ঠিক ঔদরিক কালচার নয়। এর সঙ্গে ফুলের বন জড়িয়ে আছে। কমল বন আছে। শিল্পীর সৃষ্টির পক্ষে সবচেয়ে কোমল উপকরণ নবনীত সদৃশ মোম এর সঙ্গে সঙ্গে আছে। মৌমাছির জীবনে জৈব প্রবৃত্তির এক বিরাট প্রকাশ রয়েছে। মৌচাকের গঠনে জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি। মৌচাকের অভ্যন্তরে সমাজ রয়েছে, যে সমাজের রীতিনীতিতে কত বিচিত্র সত্য কাজ্ করছে। দেখবার, শিখবার ও বুঝবার মতো এক পরম গবেষণার আধার এই মৌচাক।

* * * * *

গান্ধীজী বলেছেন মানুষের শ্রমের আদর্শ হবে মৌমাছির মতো। মানুষের তৈরী পণ্য হবে মধুর মতো—পৃথিবীর কোনো ফুলের প্রাণকে আঘাত না ক'রেও তারই ভেতর থেকে প্রয়োজনের পণ্য সৃষ্টি হ'তে পারে। একমাত্র এই পণ্যই নিষ্কলঙ্ক পণ্য। মানুষের শ্রম হবে মধু-করের শ্রম—এই শ্রমের মধ্যে শিল্পীর সাধনা, গানের গুঞ্জন, কাব্য, বিজ্ঞান বিচিত্রতা, সামাজিকতা শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সাম্য—একই বিধানে মিশে আছে। একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ কাজের জীবনের আদর্শ। কজের মধ্যেই গান, কাজের মধ্যেই শিল্পসৃষ্টি, কাজের মধ্যেই রোমান্স।

* * * * *

গান্ধীজী প্রবর্তিত গ্রাম-উদ্যোগের মধ্যে মৌমাছি পালন অন্যতম বিষয়। এই নূতন শিল্পটির একটি বড়ো অর্থ আজ আমরা নতুন ক'রে উপলব্ধি করতে পারি। একটি পুষ্টিকর খাদ্যবস্তুকে শুধু বেশি ক'রে পাওয়ার জন্যই এই প্রচেষ্টা নিশ্চয় নয়। শ্রম ও রুচির একটি বড়ো আদর্শকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার সুযোগ এর মধ্যে রয়েছে। সব খেয়ালের বড়ো খেয়াল, সবচেয়ে সুন্দর hobby, বিজ্ঞানে ও কবিত্বে

মণ্ডিত এই একটি খেলা যদি ঘরে ঘরে সত্য হ'য়ে উঠে, জাতির মন কী মধুর ঐশ্বর্যে ভ'রে উঠবে, তা অনুমান করতে পারি।

জানি না, চৌষট্টি কলার মধ্যে মৌমাছি-পালনের স্থান আছে কি না। কিন্তু মানুষের মনের ধর্মের উপযোগী এর চেয়ে বড়ো আর্ট আছে ব'লে মনে হয় না। মৌমাছির মতো হুলবিলাসী রাগী পতঙ্গও তার প্রবৃত্তি ভুলে যায় যে মমতার খেলায়, যে খেলার প্রয়োজনে ঘরের আঙিনায় যূঁই, গন্ধরাজ ও গাঁদা ফুলের বর্ণ ও সৌরভকে আমন্ত্রণ করতে হয়, এ হলো সেই খেলা। অ্যালসেসিয়ান আর টেরিয়ার পুষে ফ্যাশানের পরীক্ষা আমাদের হ'য়ে গেছে। একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি— Bee-Culture আমাদের কালচারকে ছোটো করে না বড়ো করে?

কাগজের নৌকা। রথযাত্রা ১৩৫৪ ॥

বই হারানো

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বই কেনা ও বই পড়ার নিয়মিত অভ্যাস যাঁদের আছে, তাঁরা অবশ্যই জানেন যে বই হারানো ব'লেও একটা বিশেষ ব্যাপার আছে, যার হাত থেকে কারুর অব্যাহতি নেই। কোথা দিয়ে কখন যে কোন বইটা হারায় এবং একবার হারালে আর সেটা পূর্ব মালিকের হাতে কেন যে ফিরে আসে না, এ আমার কাছে চিরদিনই একটা রহস্য। এ থেকে আমার ধারণা হয়েছে এই যে বই জিনিষটা আসলে সচল— ওর ধর্মই হচ্ছে এক হাত থেকে আর এক হাতে, তা থেকে আবার আর এক হাতে খালি উড়ে-উড়ে বেড়ানো, যত সাবধান হ'য়েই থাকুন এর যেমন খুশি মনোযোগ দিয়েই আগলে রাখুন, একদিন দেখবেন, সমস্ত অবরোধ ভেঙেই কোথা দিয়ে দু চার খানি বই ভেগেছে এবং তা আজো গেছে, কালও গেছে। গোটা পৃথিবীটা হাতড়ালেও আর তাদের পাত্তা পাবেন না।

যখন থেকে সাহিত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ, তখন থেকেই সুরু হয়েছে এই বিভ্রাট এবং যতদিন বাঁচবো, ততদিনই এটা চলবেও সমান বেগে। তাই এ নিয়ে আর নালিশ নেই। তবে সময় সময় দুঃখ পাই প্রচুর এবং বাড়ির সকলকে, বিশেষ ক'রে স্ত্রীকে সাময়িক ভাবে বিব্রত ক'রেও তুলি রীতিমতো ভাবে। হঠাৎ কোনোদিন অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই একটা বইয়ের স্মৃতি মনকে পেয়ে বসে, মনে হয় সেটা তখনি না পেলে নয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ঠিক সেই বইটিই আর পাওয়া যায় না। আলমারি, ড্রয়ার, টেবিল, চৌকির তলা, সুটকেশ, কাগজের বাক্স, সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত জায়গা তোলপাড় ক'রে ফেলি, বাড়ির ছেলেমেয়েদের ধমকাই, গৃহিণীকে বকুনি দিই, বইয়ের মূল্য বা মর্যাদা যারা বোঝে না, কোন বইটা কখন দরকার হ'তে পারে সে ধারণাই নেই যাদের, যারা মনে করে, ছাতা, হারিকেন বা ষ্টোভের মতো

সংসার-জীবনে বইয়ের একটা অপরিহার্যতা নেই, তাদের উদ্দেশে কটূক্তি করি এবং অন্যের বই ব'লে বা না ব'লে যারা নিয়ে যায় এবং তা ফেরৎ দিয়ে যেতে যাদের হয় উৎসাহ থাকে না, নয় ইচ্ছে থাকে না, তারা যে আসলে বই পড়ে না, একথাও যথেষ্ট তর্জন-গর্জন সহকারেই বোঝাতে চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মনটা স্থির হ'য়ে যায়, পড়বার স্পৃহাটাও হ'য়ে আসে স্তিমিত এবং হারানো বইটাকে বাতিলের দলে ফেলে দিয়েই নিশ্চিন্ত হই। বলা বাহুল্য এর পর সে বইটি পাওয়া গেলেও আর লাভ নেই, কারণ পড়ার যে নেশাটা জমেছিলো ভেতর থেকে, এখন বাইরে থেকে তাকে খুঁচিয়ে তুলতে হয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখি, মন তাতে নারাজ! সে মেজাজটাই থাকে না আর। তবে সৌভাগ্য এই যে পাওয়া খুব কমই যায় এবং নিজে থেকেও হারানো বইগুলোর জায়গা খুব কমই পূরণ করা হ'য়ে থাকে— অর্থাৎ যা যায়, তা চিরদিনের জন্যেই যায়।

পূরণ হবে কি করে? কোনো বইটা দিয়েছিলেন কোনো সাহিত্যিক বন্ধু— তাঁর স্বহস্ত-লিখিত প্রীতির স্মারকচিহ্ন স্বরূপ। কোনোটা এসেছিলো সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে সমালোচনা ক'রে দেবার জন্যে। কোনোটা চলতি পথের একান্তে স্তূপীকৃত বাজে বইয়ের আবর্জনা হাঁটকে অল্প মূল্যে সংগৃহীত হয়েছিলো। কোনোটা বা পাওয়া গিয়েছিলো কোনো গুণমুগ্ধ ব্যক্তির সাদর উপহার স্বরূপ। এছাড়া নগদ মূল্যে কেনা, কিস্তিতে কেনা, ডাক খরচা দিয়ে বাইরে থেকে আনানো বইও জমা হয়েছিলো নেহাৎ কম নয়। এর কতক পড়া, কতক আধ-পড়া, কতক বা কোনো অনিশ্চিত ছুটির অপেক্ষায় অপঠিত মমতায় রক্ষিত। কিন্তু হায় রে মানুষের আহরণী বুদ্ধি, এই পুঁজি ভেঙেই লোকে বই সরায় এবং কেমন ক'রে সরায় তা টেরও পাই না আমি।

আপনারা হয়তো এতক্ষণে বুঝেছেন যে বই আমি কারুকে ধার দিই

না। অন্ততঃ নীতি আমার তাই। আমাদের দেশে অধিকারী ভেদ ব'লে কোনো কথা নেই— বই দেখলেই দেশসুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষের হাত সুড়সুড়িয়ে উঠে। দুঃখের বিষয় পড়বার শক্তি তাঁদের নেই, মানে পড়ে রস পাবার, অথচ নিয়ে যাবার লোভটি আছে— কাজেই মলাট ছিঁড়ে, নস্যি বা পানের ছোপ লাগিয়ে, কোনো জায়গায় beautiful, নয়তো rubbish, নয়তো '—লেখক' এমনি কোনো অমূল্য মন্তব্য খোদাই ক'রেই তাঁরা দায় সেরে থাকেন। তারপর ক্রমাগত তাগাদা চালাতে পারলে, হয়তো সেই খণ্ড-বিখণ্ডিত বই ফিরে আসবে, আর ভুলে গেলেন ত আপদ চুকেই গেল! হ্যাঁ, নিজের চাড়ে যিনিই নিয়ে যান বই, ফেরৎ আনার চাড় কিন্তু আপনার। তাও তাগাদা দিলেই ঘরের বই ঘরে ফিরবে, এমন নিশ্চয়তা নেই-- কারণ আপনার কাছ থেকে বই নিয়ে গিয়ে তাঁরা যে আবার তা sublet ক'রে বসে আছেন! নির্লজ্জতার সঙ্গেই জানাবেন যে উক্ত ভদ্রলোক বা সম্ভবস্থলে ভদ্রমহিলা আবার তা আর একজনকে পড়তে দিয়েছেন। এইভাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, টেরই পাওয়া যায় না।

এই জন্যেই আমি কারুকে বই ধার দিই না। নিতান্ত অসভ্যের মতোই জানাতে বাধ্য হই যে প্রার্থিত বইগুলো উপস্থিত আমার দরকার—একটা প্রবন্ধ লিখছি, নয়তো সমালোচনা লিখবো। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হয় না। কেউ অতি আত্মীয়তা ক'রে বলেন, আরে সে হবে'খন, লিখছেন তো হরদমই—দু-দিন পরেই লিখবেন, দুটি দিন মাত্র, এর মধ্যেই আমি পড়ে শেষ ক'রে ফেলবো! ব্যস, এইখানেই শেষ। এরপর আমাকে নিতে হবে তাঁর পিছু এবং তিনি তখন শেলীর spirit of delight, rarely rarely 'cometh he'! কেউ বা বলবেন, আচ্ছা, শনিবার দিন আসছি—এর মধ্যেই কাজ সেরে রাখবেন কিন্তু। যেন আইনতঃ আমি বাধ্য ঐ সময়ের ভেতর আমার কাজ সেরে, তাঁর গ্রহণের জন্যে বইগুলি মোতায়েন রাখতে।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে তিনি ঠিকই আসবেন এবং বইগুলির কথাও ভুলবেন না। মজার কথা এই যে একখানা বই হ'লেই চলবে না, এক সঙ্গে একগাদা না হ'লে এঁদের কারুরই পেট ভরবে না, আর ফেরৎ দেবার নীতিও এঁদের সকলেরই এক। অর্থাৎ এঁদের হাত থেকে বই বাঁচানো রীতিমতো বেহায়া হ'য়েও আমার সাধ্যাতীত!

কিন্তু এঁরা তবু চেয়ে নেন, কাজেই এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অনেকে আছেন, দয়া ক'রে যাঁরা জানাবারও দরকার বোধ করেন না। তাঁরা আসেন মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে, নয়তো আত্মীয়তার ছুতোয় নিজেদের বড়-মানুষীর কাহিনী কীর্তন করতে এবং যাবার সময় বহুমূল্য উপস্থিতি দানের বিনিময়ে হঠাৎ থাবা মেরে খানকতক বই উড়িয়ে নিয়ে যান র‍্যাক অথবা টেবিল থেকে—যেন উঠানের নটের শাক ছিঁড়ে নিলেন, যার জন্য কোন কৈফিয়তের দরকার নেই। কোনোটা পড়তে পড়তে রেখে গেছি, কোনোটা সমালোচনা করছি, কোনোটা এনেছি কারুকে উপহার দোব বলে—কোনোটা লেখকের অনুরোধে নূতন সংস্করণের জন্যে সংশোধন করছি, ফিরে এসে দেখি নেই, বেবাক খোয়া গেছে! মেয়েদের ওপর তম্বি করবো সে ভাগ্যও করিনি! পরম ঔদাস্যের সঙ্গেই বলবেন কেউ, তার হয়েছে কি? গেলেই বা দু খানা বই নিয়ে, খেয়ে তো আর ফেলবে না, যদি বোঝাতে চাই যে বই খাবে না, খাবে আমার মাথা, তাহলেই গৃহিণী বলবেন, কে জানে বাপু, বইয়ের খবর রাখতে পারি না অত! টাকা নয়, ধন-দৌলত নয় যে আগলে রাখবো— কাগজের পাহাড়, ইঁদুর, উই, আর আরশোলার ডিপো, ঘরের জঞ্জাল, ও থাকলেই কি, আর গেলেই কি? আগেই বলেছি যে বই স্টোভ নয় যে জল গরমে লাগবে, ছাতা নয় যে রোদে-বৃষ্টিতে মাথা বাঁচাবে, সুতরাং আমারই হার! মুখ কালো ক'রে ভাবি, শিশি-বোতলওয়ালাকে ধ'রে বাকি বইগুলো বিক্রি ক'রে ফেলবো। ও-আপদ আর রাখবোই না ঘরে! কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই আবার জমে ওঠে বই। নসীবকে ধন্যবাদ যে এক হাতে দান ও আর

এক হাতে হরণ ক'রে তিনি বরাবরই আমার ভাড়াটে বাড়ীর ভারসাম্য রক্ষা ক'রে থাকেন, নইলে আরো কি বিপদই ঘটতো।

অবসর সময়ে মাঝে মাঝে ভাবি, এই হারানো বইগুলো যায় কোথায়? একদিন যা পড়েছি অগাধ আনন্দ নিয়ে, কারুর খোলা পৃষ্ঠার ওপর মাথা রেখে কেঁদেছি শিশুর মতো, হয়তো করেছি কোনো জায়গার মতামত নিয়ে তীব্র সমালোচনা, নয়তো লিখেছি কোথাও কোনো নোট, কোনোদিন ব্যবহার করবো ব'লে এবং তা আর করা হ'য়ে ওঠেনি—হয়তো কোনো একটা অংশে দাগ দিয়ে রেখেছি বুঝতে না পেরে, সেই সমস্ত কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, ইতিহাস ও দর্শন-বিজ্ঞানের রাশি রাশি নূতন পুরানো স্বদেশী বিদেশী বইগুলো যায় কোথায়? বেশ বুঝতে পারি, আমার হাত থেকে যাঁর যাঁর হাতে পড়েছিলো, সেখানেই তারা স্থির হ'য়ে নেই, উড়ো পাখির মতো তারা শুধু উড়ে উড়েই বেড়াচ্ছে! এক শাখা থেকে আর এক শাখায় বসা, সে তাদের মুহূর্তের খেয়াল, আসলে তারা হলো অসীম শূন্যের জীব। আকাশে আকাশেই তাদের চলাফেরা! বৃথা মমতায় আমরা তাদের ওপর খাটাতে যাই মালিকানা, আমাদের সেই অহমিকা চূর্ণ ক'রেই একদিন তারা পালায়, এবং কোথায় পালায় তা আর জানা যায় না।

অবশ্য হারানো বই দু একটার সাক্ষাৎ আর কখনো পাইনি এমন নয়। পথের পুরানো দোকানে একদিন দেখলাম বিয়র্ণসনের নাট্য গ্রন্থাবলী—মলাট ওলটাতেই চোখে পড়লো একটি নাম, যা শিরিষ কাগজ দিয়ে উঠানোর চেষ্টা ক'রেও বেয়াড়া ভাবে বেঁচে রয়েছে। বলুন তো কে সে? দ্বিতীয় বারের জন্যে কিনে আনলাম, কিন্তু আবার পালালো এবং এবার বেপাত্তা পলায়ন! আর একবার একটি বন্ধু এলেন খানকতক মোটা মোটা second hand বই বেচতে। বললেন, বড়ো অভাব, বইগুলো রেখে আর কি করবো? শুধু ঘরের ভার বৃদ্ধি। কিন্তু একদিন সখ ক'রে কিনেছিলাম—আপনি গুণী লোক,

আপনার হাতে পড়লে তবু মনটা খুশি থাকবে, জানবো, অপাত্রে পড়েনি! কিনলাম! তার ভেতর থেকে বেরুলো আমারই পরলোকগত এক বন্ধুর নাম-লেখা দু খানা গ্রীক কবিতার অনুবাদ সংকলন, যা এক সময় তাঁর কাছ থেকে এনে পড়েছিলাম। অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলাম, এ দুটো বই ওঁর হাতে পড়লো কি করে? অনেকক্ষণ ধ'রে উল্টে-পাল্টে দেখলাম, কয়েকটা কবিতা দু জনে এক সঙ্গে পড়েছিলাম, সেগুলোর মার্জিনে এখনো রয়েছে আমাদের হাতের লেখা নোট! কোথায় সেই বন্ধু, যিনি বাঁচলে আর কিছু না হন, অন্ততঃ আমার চেয়ে ভালো সাহিত্যিক হতেন! কিন্তু আশ্চর্য এই দুটি বই কিছু দিন পরেই আবার উধাও হলো। একজন কবি নিয়ে গেলেন অনুবাদ করতে—হয়তো নেপথ্যে অনুবাদ তাঁর সম্পূর্ণও হয়েছিলো, কিন্তু মূল আর মালিকের হাতে ফিরে এলো না!

'কথাসাহিত্য'। কার্তিক ১৩৬১ ॥

যদি

কালপেঁচা

বাংলা ভাষায় এমন একটি "শব্দ" আছে যাকে সাহিত্যিকরা উপেক্ষা করেন, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা অবহেলা করেন, অথচ যার আকর্ষণশক্তি দুর্বার, মাধুর্য অনির্বচনীয় এবং ব্যঞ্জনার কোনো আদিঅন্ত নেই। বাংলাভাষার মহারণ্যে মাত্র দুই অক্ষরের সেই শব্দটি ঠিক নিরাভরণ বনদুহিতার মতোন। কোনো ঝংকার নেই তার, কোনো রূপলাবণ্য নেই। আলংকারিকের দৃষ্টিতে কোনো অলংকারের চিহ্ন তার গঠন-বিন্যাসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। তবু তারই জন্যে "সাহিত্য" সচল এবং "জীবন" দুর্বিষহ বোঝার ভারে আজও অচল হয় নি। কাব্যের উপেক্ষিতা সে আমাদের "আ মরি বাংলাভাষার" নগণ্য "যদি"।

আমরা কোনোদিন ভেবে দেখিনি, আমাদের অলংকারবহুল জীবনে এই নিরলংকার নির্বিকার "যদি" যদি কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার ক'রে রয়েছে। "চলন্তিকা" অভিধানে "যদি" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু লিখেছেন ঃ "অবধারণে বা বিকল্পে, if (যদি বৃষ্টি হয় তবে ঠাণ্ডা পড়বে, যদি আসতে তো ভালোই হতো); সংশয়ে বা আশঙ্কায়, lest (যদি রাত হয় তাই লণ্ঠন এনেছি, ভয় হয় যদি সে রাগ করে); সংশয়াধিক্যে (যদি মরি তাতে ক্ষতি কি ইত্যাদি)।" এই হলো "যদির" আভিধানিক অর্থ। অবধারণে বা বিকল্পে, ইংরেজি "ইফের" মতোন, সংশয়ে বা আশঙ্কায়, ইংরেজী "লেষ্টের" মতোন, অথবা সংশয়াধিক্যে, ইংরেজি "ইভ্‌ন ইফ্‌"-এর মতোন, আমাদের বাংলাভাষার "যদি"। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, আভিধানিক অর্থের এই নির্দিষ্ট সীমানা ছাড়িয়ে বাংলার "যদি" তার গভীর দ্যোতনার ইন্দ্রজাল মানসিক ভাবানুভাবের নিঃসীম দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তার ক'রে রয়েছে। ইংরেজীর "ইফ্‌" আছে, "লেষ্ট" আছে, "ইভন-ইফ্‌" আছে, "থো" আছে, "অলথো" আছে, কিন্তু বাংলায় আছে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর,

আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, হিমাদ্রির মতোন অচল অটল অদ্বিতীয় "যদি।"

আমাদের জীবনের একমাত্র পাটাতন "যদি" যেমন ওদের লাইফের "ইফ্"। সারাজীবনের সমস্ত সঞ্চিত পাথেয় থেকে যে কোনো সময় একটি একটি ক'রে সবগুলি "যদি" একবার যদি খসিয়ে নেন, তাহলে দেখতে পাবেন বিয়োগফল যা পড়ে রইলো সেটা শুধু একটা শূন্য খোলস্-মাত্র, একটা স্কেলিটন বা কঙ্কাল ; রক্ত মাংস, রূপলাবণ্য কিছুই তার নেই। তার কারণ জীবনের রক্ত-মাংস, জীবনের রঙবেরঙের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য, জীবনের মনোহর লাবণ্য, সবই ঐ "যদি।" জীবন যাদের বিশাল হাজারত্নয়ারী রাজপ্রাসাদের মতোন জমকালো, তাদেরও হাজার স্তম্ভের প্রতিটি স্তম্ভ ঐ "যদি।" জীবন যাদের পর্ণকুটীরের মতোন জীর্ণ, তাদেরও প্রত্যেকটি ঘুণধরা খুঁটি ঐ "যদি।" তা না হলে আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ, এরা ওরা সকলেই তো মানুষ, তবু কেন এক নবকৃষ্ণ শোভাবাজারের মহারাজা হলেন এবং আর এক নবকৃষ্ণ দেনার দায়ে তার শুধু তুই বিঘে জমি বেচে দিয়ে লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে গেল। এক জনের জীবনে স্বপ্নলোক থেকে "যদি" নেমে এলো মাটির পৃথিবীতে, আর এক জনের জীবনে "যদি" চিরদিন স্বপ্নাকাশে তারার মতো উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে রইলো। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান কেবল যদির ব্যবধান, জীবনের সঙ্গে জীবনের দূরত্ব কেবল "যদির" দূরত্ব। জীবনের কোনো এক সময়ে আপনার নিজের পায়ে-হাঁটা পথের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যদি স্থির দৃষ্টিতে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে-যাওয়া কোনো জীবনের মূর্তির দিকে চেয়ে থাকেন, তাহলে দেখবেন গভীর অন্তস্থল থেকে একটি চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো এবং পিছনে পড়ে-থাকা আপনি ও এগিয়ে-যাওয়া সে, এই তুই জীবনের মধ্যে যে পথের দূরত্ব, তার মধ্যে অসংখ্য মাইলপোস্ট দৃষ্টিপথে ভেসে উঠলো, প্রত্যেক পোস্টের পাথুরে গায়ে বড়ো বড়ো হরফে খোদাই করা "যদি"। এই "যদি"-ই আপনার দীর্ঘ নিঃশ্বাসের উৎস এবং জীবনধারণের একমাত্র জীবিকা। যে

যাচ্ছে সে কেবল চলার আনন্দে মশগুল হ'য়ে চলছে না, "যদি"র টানে চলছে. "যদি" আরও একটু চলা যায়, "যদি" আরও কয়েকটা পর্বতচূড়া পার হওয়া যায়, "যদি" জীবনের নন্দাগিরি, ধবলগিরি অতিক্রম ক'রে এভারেষ্ট পর্যন্ত পৌছোনো যায়, যদি তার পরেও কোনো তুষারশৃঙ্গ থাকে—। জীবনের আঁকাবাঁকা পথ দিগন্তবিস্তৃত, সেই পথের বাঁকে-বাঁকে "যদির" মাইলপোস্ট। আপনার চলার ইতিবৃত্ত কয়েকটা "যদি" পার হওয়ার করুণ বা রোমাঞ্চকর কাহিনী, আপনার ব্যর্থতার ইতিহাস সামনে অসংখ্য দূরতিক্রম্য "যদির" মর্মান্তিক ইতিহাস এবং আপনার সার্থকতার ইতিহাস কেবল কতকগুলি অতিক্রান্ত "যদির" রোমাঞ্চকর ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

জীবনে যে ব্যর্থ হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, দেখবেন যখন জীবন-কাহিনী সে বলা সুরু করবে তখন অনর্গল ধারায় মুখ থেকে উৎসারিত হবে "যদি, যদি, যদি।" প্রত্যেক "যদি"র পর এক একটা দীর্ঘশ্বাসের ছেদচিহ্ন, একটা সকরুণ ভাব, একটা গ্লানিবোধ, একটা প্রতিহিংসার লেলিহান প্রবৃত্তিশিখা। যদি ওটা পেতাম তাহলে এই করতাম, এই হতো, যদি পারতাম, যদি ঘটতো, যদি ঐ ভুলটা না করতাম, যদি একবার বাগে পেতাম, তাহলে তাহলে ব'লে বক্তা উত্তেজিত হ'য়ে উঠবেন। যদির কাহিনী শুনতে শুনতে অবসন্ন হ'য়ে পড়বেন। যত মহাজন যত আত্মজীবনী লিখেছেন আজ পর্যন্ত তার সবটাই প্রায় "যদি।" জীবনে যার প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে, প্রতিহিংসার আগুনে সে নিয়ত জ্বলছে আর ভাবছে "যদি একবার পাই—।" প্রেমিক যে সে ভাবছে "যদি সে আসে—।" শিশুর স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা তাজ্জব দুনিয়ায় "যদি" ছাড়া আর কিছু নেই। যদি সে ছাড়া পায় তাহলে গাছে ওঠে, পাহাড় ডিঙোয়, নদী পার হয়। যদি তার ছোট্ট খেলনা-এরোপ্লেনটা উড়তে পারতো তাহলে তাতে চ'ড়ে সমস্ত আকাশটা সে একবার বোঁ করে ঘুরে আসতো, দেখে আসতো মেঘগুলোকে। যদি মা না মানা করতো, তাহলে ঠিকই সে কাগজের নৌকায় চ'ড়ে ভেসে পড়তো

নদীর বুকে, কত দূর দেশ-বিদেশ চলে যেতো। শৈশব থেকে কিশোর-জীবনের "যদি" আরও একটু পাল্লার মধ্যে এলো। "যদি উকিল হই তবে রাসবিহারী ঘোষ হবো, যদি ডাক্তার হই তাহলে গরীব-দুঃখীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করবো, যদি পড়াশুনা করতে পারি, তাহলে বিদ্যাসাগর হবো, যদি ব্যবসা করি তবে বিড়লার চেয়েও বড়ো হবো, যদি শ্যামসুন্দরের মতো বীর হ'তে পারি তাহ'লে বাঘের গলায় বগ্‌লস দিয়ে শিকল বেঁধে কুকুরের মতোন টেনে নিয়ে বেড়াবো, আর দেশের সমস্ত বন্দিনী, অভাগিনী, কুমারী কন্যাদের দস্যুদের কবল থেকে ছিনিয়ে আনবো। অর্থাৎ "যদি" একবার ড্যাশ্ হই, তাহলে দেখে নেবো, দেখিয়ে দেবো কি করতে পারি, যা কেউ করেনি কখনও, ইতিহাসে যে কাহিনী লেখাজোখা নেই।" এই হলো কৈশোরের "যদি।" এ "যদি" এমনই জীবন্ত যে যদি একবার কিশোর রাজপুত্র তার ও-বাড়ির বা ও-পাড়ার কিশোরী রাজকন্যাকে পায়, তাহলে তার হাত ধ'রে সে এই কমলালেবুর মতোন পৃথিবীটাকে স্বচ্ছন্দে জয় ক'রে তার মাথার উপর বিজয়দর্পে দাঁড়িয়ে বিষাণ বাজিয়ে ঘোষণা করতে পারে যে সে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। দিল্লী থেকে মক্কা, মক্কা থেকে কামচকাট্‌কা, টাঙ্গানিকা থেকে সাইবেরিয়া সে এক এক লাফে চ'লে যেতে পারে, গিয়ে সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারে সেখানে, ঠিক এস্কিমোদের মতোন, নিগ্রোদের মতোন, বেদুইনদের মতোন, অবশ্য যদি সে তাকে পায়, যদি তাকে তেমনি ক'রে পাওয়া যায়, যদি তাকে ঐ রুদ্ধ ঘরের জানালার গরাদ ভেঙে একবার ছিনিয়ে আনা যায়, যদি—যদি—। এই হলো দুরন্ত কৈশোরের দুর্ধর্ষ "যদি।" শৈশবের "যদি" রূপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়া, কৈশোরের "যদি" দুর্বারগতি গ্যালপিং ঘোড়া। শৈশবের "যদি" কাগজের নৌকা, কৈশোরের "যদি" হাজার দাঁড়ি ময়ূরপঙ্খী নাও।' যৌবনের "যদি" উত্তাল তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে ভাসমান ষ্টীমলাইণ্ড জাহাজের মতোন, দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে তার বিরামহীন যাত্রা। অনুসন্ধানী মন চির-অতৃপ্ত,

"যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না", তাই যদির টানে কেবল খোঁজা আর চলা, যদি পাই, যদি সার্থক হই, যদি জয়ী হই, যদি—যদি—। প্রৌঢ়ত্বের বালুচরে যৌবনের তরঙ্গায়িত জাহাজটা হঠাৎ যখন ধাক্কা লেগে আটকে যায় তখন বিস্তীর্ণ বালুচরের দিকে চেয়ে চেয়ে হিসেবী মনটা সজাগ হ'য়ে ওঠে, চোখের সামনে অস্তগামী সূর্যের আলোয় জীবনের বালু-স্তূপে ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে অসংখ্য ফেলে-আসা পাশ-কাটানো "যদি", মনে হয় হায়, হায়! যদি না ওটা করতাম, যদি আর একটু বুদ্ধিমান অথবা যদি অতটা লোভ, অতটা বাড়াবাড়ি না করতাম, যদি—যদি—। বালুতটের অস্বস্তি ও হা-হুতাশের মধ্যে বার্ধক্যের সন্ধ্যা নামে, জীবনের সূর্য যায় অস্তাচলে। শেষ দিনের শেষ মুহূর্তটিতে অসংখ্য "যদি" এসে ভিড় করে ক্ষীয়মান দৃষ্টিপথে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলে যখন চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন মনে হয় যেন প্রত্যেকে এক একটি মূর্তিমান "যদি"। বৃদ্ধা মা'র দিয়ে চেয়ে মনে হয় জীবনে তাঁর প্রতি কত অন্যায়, কত অবিচার করেছি, ক্ষমা চাওয়া হয়নি—অমনি কোথা থেকে "যদি" উদ্বেল হ'য়ে ওঠে, মনে হয় যদি একবার প্রাণ খুলে ক্ষমা চাইতে পারতাম, যদি "মা" ব'লে ডাকতে পারতাম। কিন্তু সে সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, ডাকবার শক্তি নেই, তাই "যদি যদি" ক'রে নিভ-নিভ চোখে জল জমে শুধু। স্ত্রী-পুত্র, স্বজন-বন্ধুদের দিকে চেয়েও ঐ কথা মনে হয়, কেবলই মনে হয় যদি একবার সকলকে মনের আসল কথাটা বলতে পারতাম তাহলে কত ভুলের বোঝা হালকা হ'য়ে যেতো। কিন্তু সে সময় নেই। কেবল যদি, আর অন্ধকার। অন্ধকার গাঢ়তর হয়, বৃহত্তর হ'তে হ'তে মাথার উপরে সিলিং স্পর্শ করে—যদি আর একটা দিন, মাত্র একদিন, যদি—যদি—।

জীবনের "দি এণ্ড" বা "ঐ শেষ।" হাজার হাজার অসংখ্য "যদি"র ভগ্নস্তূপ এই জীবন। কিন্তু ঐখানেই শেষ নয়। যার শেষ হ'য়ে গেলো সে তো জানলো না যে যারা বেঁচে রইলো তাদেরও জীবন

কতদিন কতবার ঐ "যদি" জর্জ্জরিত করবে। তারা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ঐ "যদি" তাদের হন্ট্ করবে, যে চ'লে গেল তার কথা ভেবে মনে হবে মধ্যে মধ্যে, ভীষণভাবে মনে হবে—যদি তাকে পেতাম, যদি একদিনের জন্যেও পেতাম, যদি একবারটি জীবন্ত পেতাম তাকে—যদি—তাহলে—। চলার পথে জীবনের বাঁকে বাঁকে মাইল-পোস্ট যেমন "যদি", জীবনের এপার থেকে ওপারের সেতুও তেমনি "যদি।" "যদিশূন্য" জীবন মাত্রেই মৃত্যু আর "যদিদীপ্ত" জীবন মানেই এগিয়ে চলা।

কালপেঁচার দু'কলম। মহালয়া ১৩৫৯॥

মানচিত্র ও ব্র্যাড্‌শ

রঞ্জন

পড়ার ব্যাপারে আমি দ্বিতীয় ভাগের সুশীল। যাহা পাই তাহা পড়ি।

রাস্‌কিন আমার এই অভ্যাসটির নিন্দা করবার ভাষা খুঁজে পেতেন না। সমগ্র মুদ্রিত গ্রন্থরাজি তাঁর মনে সাদা-কালো, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ এমনি দুটো স্পষ্ট ভাগে ভাগ করা ছিলো। এক রকমের বই পড়া যেন সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে কথা বলা, আত্মোন্নতি তার অবধারিত পুরস্কার। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর বই পড়া হচ্ছে দাসীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ ; অথবা কালক্ষেপ তো বটেই, রুচিহীন চিত্তবিক্ষেপও।

রানী দেখলে আমারও রাজা হবার ইচ্ছা হয়। তাঁর প্রতি আমার অনুরাগ রাস্‌কিনের চেয়ে অণুমাত্র কম নয়। কিন্তু আমি পড়েছি শরৎবাবুর উপন্যাস, পাত্রবিশেষে আমার দাসীবিদ্বেষ আমি সানন্দে জয় করতে প্রস্তুত। আরেকটা উপমা দিয়ে বলি, আমি দুর্লভ ভিন্‌টেজের কোনো পেয় পেলে সাগ্রহে তা ওষ্ঠে তুলে নেবো, কিন্তু হাতের কাছে এক গেলাস ড্রাফ্‌ট্‌ পেলেও ঠোঁট ফুলিয়ে ফেলে দেবো না। প্রথম উপমাটি রাস্‌কিনের নিজের ; দ্বিতীয় উপমাটি রাস্‌কিনের চাইতে তাঁর বাবা বেশি উপভোগ করতেন। তিনি মদ্য ব্যবসায়ী ছিলেন।

সোজা কথায়, আমি নির্বিচারে প্রায় সব কিছু পড়ি। হাতের কাছে একটা মানচিত্র বা ব্র্যাড্‌শ থাকলে—এবং আর কিছু না থাকলে—তাই পড়ি।

ব্র্যাড্‌শর কথায় মনে পড়ে গেল বার্ণার্ডশ'র কথা। তিনি বলতেন, পাঠক যা নিয়ে বই পড়তে আসে তাই নিয়ে তাকে ফিরে যেতে হয়। তার বেশি পায় না সে। বহু শ-ত্বর মতো এটাও বোধহয় অর্ধসত্য। তা নইলে আমি কখনোই কিছু পড়তেম না, শ তো নিশ্চয়ই নয়। সে কেমন ব্যবসা যাতে মূলধন থাকে অবর্ধিত ? যা আনবো পড়বার আগে, তাই যদি ফিরিয়ে নিতে হয়—ঝুলির চাল যদি সোনা হ'য়ে না ফলে,

তবে কাজ কী অমন ভিক্ষায়? না, পড়া অমন ব্যবসা কখনোই নয়।

কিন্তু মানচিত্র, ব্র্যাড্‌শ বা রেলওয়ের টাইম-টেবল পড়তে গেলে সত্যি পাঠকের নিজের থাকা চাই মোটা রকম মূলধন। তা নইলে সে কিছুই পাবে না ওসব কাগজ পড়ার বদলে। ম্যাপ পড়তে গেলে সত্যি চাই উদার কল্পনা—যার সাহায্যে মানচিত্রের ঊষর মরুভূমি পরিণত হবে লক্ষ-অধ্যুষিত বর্ধিষ্ণু জনপদে, যা ব্র্যাড্‌শর কঠোর কঙ্কালের উপর কোমল মেদের আবরণ দিয়ে গড়ে তুলবে জীবন্ত মানুষ। আমি সব সময়ই ব'সে ব'সে কিছু ম্যাপ আর ব্র্যাড্‌শ পড়িনে; কিন্তু আঁদ্রে জীদ যাকে বলেছেন অদণ্ডিত আসক্তি, আমি সেই নেশার দাসত্বে এই রকমের অনেক জিনিস মাঝে মাঝে পড়তে বাধ্য হই, এবং পড়ে যে একেবারেই কোনো আনন্দ পাইনে তাও ঠিক নয়।

মানচিত্র খুললেই আমার মন ভরে ওঠে বৈষ্ণবী বিনয়ে। কত জিনিস, কত জায়গা আজো র'য়ে গেল আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বাইরে! আমি বরাবর সন্দেহ করেছি যে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি" নামক কবিতাটি লিখেছিলেন তখন তাঁর সামনে প্রসারিত ছিলো একটি বৃহৎ মানচিত্র। প্রত্যক্ষলভ্য জ্ঞানের হাস্যকর নগণ্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে মানচিত্রের মতো শিক্ষক আর নেই। ম্যাপ খুললেই মনে হয় জানার স্বল্পতা আর অজানার অন্তহীনতা।

কিন্তু বিনয় আমার চরিত্রে অত্যন্ত পরিমিত। একটা বড়ো রকমের দম্ভ আমার মজ্জাগত। তাই মানচিত্রের চাইতে গ্লোব আমার বেশি প্রিয়—যাতে তাকে নিয়ে আমি যা ইচ্ছা করতে পারি। পদাঘাতে তুলে দিতে পারি কড়ি-বরগার কাছে, তারপর তৃপ্তি-সহকারে প্রত্যক্ষ করতে পারি তার অসহায় অধঃপতন—"দি গ্রেট্ ডিকটেটর" ছবিতে চার্লি চ্যাপলিন যেমন ক'রে দেখিয়ে ছিলেন স্বৈরাচারীর তুরভিলাষের প্রতীক। আমি গোটা বিশ্বটিকে নিয়ে খেলতে চাই আপন খেয়াল

মতো, শিশু যেমন খেলে তার মার্বল নিয়ে, বিরাট শিশু যেমন খেলছেন তাঁর আপন হাতে গড়া অগণিত মানুষের দুর্নিবার ভাগ্য নিয়ে।

বিশ্ববিজয়ের এই দৃপ্ত কল্পনাও আবার অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই গ্লোব ফেটে যায় ফানুষের মতো। আর অমনি ইতিহাসের বিশ্বজয়কামী বীরবৃন্দ সারি বেঁধে দাঁড়ায় এসে আমার সামনে। আসে আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ান, হিটলার আর মুসোলিনি। বলে, "একদা মোদের যেথা শেষ, সেথায় তোমারও অন্ত, ভেদ নাহি লেশ!"

শান্ত-শিষ্ট ছেলের মতো আমি আবার তখন আমার নিরীহ মানচিত্র খুলে বসি। উচ্চাভিলাষ তুলে রাখি রাত্রিতে নিদ্রার স্বপ্নবিলাসের জন্যে। আমার মানচিত্রে উঁচু-নীচু নেই, সমতল সেই ম্যাপে মুস্কিল নয় এক লাফে পাহাড় পেরিয়ে যাওয়া, এক ঝাঁপে সাগর উত্তীর্ণ হওয়া। আমি তাই করি। ওই যে ছোট্ট দাগটা, ওটা বার্সেলোনা। আমি ওখানে যেতে চাই এবং চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নিমেষে সত্যি ওখানে পৌঁছে যাই। কেন যে ওখানে যেতে চাই জানিনে। বোধহয় কখনো যাইনি ব'লে। বোধহয় এই জন্যে যে ওটা আমাদের ঠিক আগেকার যুগের তরুণদের শত আশার সমাধি, তাঁদের মধ্যে যাঁরা ইণ্টারন্যাশানাল ব্রিগেডে যুদ্ধ ক'রে গণতন্ত্রের ভরাডুবি রোধ করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই আজ নিরাশা-নিমজ্জিত হ'য়ে নিষ্ক্রিয়। তবু বার্সেলোনা যেতে আমার প্রবল লোভ!

আর শুধু কি বার্সেলোনা? সামনে বিছানো মানচিত্রে যখন যে নাম দেখি তাই মনে আনে অতৃপ্ত কোনো কামনা বা অবিস্মৃত তৃপ্তি। এই দুয়ে মিলে আমার পৃথিবী। মনসা যার পরিক্রমা করে কখনোই আমার সাধ মিটবে না।

মনে যতই ভবঘুরে হই, পরিব্রাজক হিসাবে আমি একান্তই অক্ষম। একবার ভ্রাম্যমাণ হ'য়ে আবার ভ্রাম্যমাণ হ'তে আমার মন উঠতে চায় না, পা তো নয়ই। বিধাতা আমায় অনেক দিয়েছেন, সে জন্যে কৃতজ্ঞতার সীমা নেই আমার। কিন্তু লঘু সংলাপে যে কুশলতা

থাকলে পথ চলতে চলতে বন্ধু কুড়িয়ে এগুনো যায়, আমি সেই গুণটি থেকে একেবারেই বঞ্চিত। এর অভাবে বিশ্বসংসারে আমার মতো নিঃসঙ্গ বুঝি কেউ নেই। গাড়িতে বসে আমি সাথী খুঁজি আকাশের তারাগুলির মধ্যে, জাহাজে আমার একমাত্র সঙ্গী সেই তরঙ্গগুলি যারা নিয়তই দূরে সরে যেতে ব্যস্ত। এমন হতভাগ্যের জন্যে ভ্রমণ সর্বদাই নৈরাশ্য-সংকুল। এমন লোকের পক্ষে মানচিত্রের উপর হাত বুলিয়ে ব্রেইল্‌ পদ্ধতিতে বিশ্বপর্যটনই নিরাপদ। তা নইলে তার দেখা হবে এমন সহযাত্রীর সঙ্গে যাঁকে তার ভালো লাগবে না। আরো বেশি সম্ভব, দেখা হবে এমন সহযাত্রিণীর সঙ্গে যাঁর তাকে ভালো লাগবে না।

কাল্পনিক এই বিশ্বপরিক্রমায় ব্র্যাড্‌শ'র বিশদ বিবরণ জোগায় বাস্তবতা। এ থেকে জানি কখন কোন প্লেনে চড়ে কখন পৌঁছোনো যায় বার্সেলোনায়। স্পেস্‌ আর টাইম এমনি ক'রে জয় ক'রে, বিনা আয়াসে আমি যেখানে খুশি চ'লে যেতে পারি। দায় নেই ভাড়া দেবার, ভয় নেই বিমান দুর্ঘটনার। আহা, সত্যি কেন এমন হয় না মাগো ?

হঠাৎ চোখে পড়লো ব্র্যাড্‌শ'র একটা জায়গায়। লেখা আছে ঝাঝা বলে একটা জায়গার কথা। কলকাতা থেকে নাকি মাত্র ২২৮ মাইল। অমনি মনে পড়লো অনেক দিন আগের একটা কথা। অনেক, অনেক দিন আগে। আমার বয়স তখন পাঁচ কি ছয় হবে। আমাদের বাড়িতে কে একজন এসেছিলেন। কে যে তাও মনে নেই, শুধু আজো মনে আছে জায়গাটির নাম : ঝাঝা ! সেদিন ওখানে যেতে চেয়েছিলাম ওই লোকটির সঙ্গে। সে কি যেমন-তেমন চাওয়া ? সেদিন সব কিছু দিতে পারতেম ওই ঝাঝা যাওয়ার জন্যে। আর আজ ? ঝাঝাতে আজ সোনার খনি আবিষ্কৃত হ'লেও আমি সেদিকে পা বাড়াবো না। সেদিনকার সে-শিশু কোথায় মিলিয়ে গেছে সময়ের নিঃসীম শূন্যতায়, তার সঙ্গে মিলিয়ে গেছে সে শিশুর ঝাঝারূপী স্বপ্নলোক। কে জানে, একদিন হয়তো বার্সেলোনাও যেতে চাইবো না !

আনমনা হ'য়ে ব্র্যাড্‌শ'র পাতা উল্টালে এমনি কত কথাই না বেঁচে উঠবে মরে-যাওয়া অতীত থেকে। ঠিক তেমনি দুয়েকটা ভাবনা ভেসে আসবে অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ থেকে। ওই যে, ১০১-এর পাতায় লেখা আছে বস্তী ব'লে একটা জায়গার কথা। কানপুর থেকে ১১৭ মাইল দূরে। রোমানদের নাকি রোম নিয়ে বড়াইয়ের শেষ নেই, বস্তীর অধিবাসীদেরও নিশ্চয়ই তাঁদের গ্রাম বা সহর নিয়ে একটু-আধটু গর্ব আছে। তাই যদি হয়, তাহলে বস্তীর মতো এমন একটা প্রোলিটারিয়ান নাম কে রাখলে এর জন্যে? হাজার হাজার বছর পরে উত্তর প্রদেশের সরকারের নগরনির্মাণ পরিকল্পনাগুলি যদি এবং যখন বাস্তব রূপ পাবে তখন কি বস্তীর নতুন ক'রে নামকরণ করতে হবে না! নতুন নাম দিলেও এমন সম্ভাবনা থেকে যাবে যে ভালো নামটা আলমারিতেই তোলা থাকবে, কেউ সে নামে ডাকবে না জায়গাটাকে। আমার পাশের বাড়ির খুকীকে যেমন কেউ ডাকে না তার মধুচ্ছন্দা নাম ধ'রে।

ব্র্যাড্‌শ'র পাতার লতা বেয়ে আসল কল্পনা এমনি কত অলীক সমস্যায় চিন্তিত হয়, অলীকতর আশায় উদ্ভাসিত হয়! হঠাৎ চোখ পড়ে অদ্ভুত একটা জায়গার নামের উপর। নামটা রেনটিয়া। বম্বে সেন্ট্রাল ষ্টেশন থেকে মাত্র ৩৩১ মাইল। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৮॥৵০ মাত্র। এখানে আমার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই, কিন্তু রেনটিয়া নামটা কেন জানিনে মনে মনে জপ করিতে থাকি। রেনটিয়া, রেনটিয়া। অমনি মনে পড়ে যায় লর্ড কীন্‌সের বিখ্যাত কথা—Euthanasia of the rentier! ভাবি রেন্টিয়া-র লোকেরা বুঝি মৃত্যুকে চিনেছে বন্ধু ব'লে, বুঝি মরতে শিখেছে সক্রেটিসের মতো নির্ভয়ে, নিরভিযোগে?

মৃত্যুর কথা মনে আসতেই আর আমার চোখ নড়ে না, স্থির থাকে রেন্টিয়ার উপর। অমনি মরণকে দেখি দ্রুত অগ্রসরমান এক অজানা অচেনা অতিথি ব'লে। ওই এলো, ওই আসছে।

একেবারে এসে পড়ার আগে যে ক'টা মুহূর্ত আমার হাতে ছিলো

তার মধ্যে দশ-দশটা মিনিট ব্যয় করেছি এই কথিকা প্রচার করতে। সত্যি যখন অতিথি এসে পৌঁছবে তখন কত কথা না-বলে থেকে যাবে, কত কথা না-লেখা! কত বই থাকবে না-পড়া! তখন আমি ম্যাপ বা ব্র্যাড্‌শ পড়ে যেমন সময় নষ্ট করবো না, তেমনি মডার্ন পেইণ্টার্‌স পড়েও উপকৃত হবো না! অতিথি এসে আমার হাত ধ'রে নিয়ে যাবে জীবনের পরপারে। সেই চিরদিনের আবাসখানার রূপটি কেমন? মৃত্যুলোকের নেই কেন কোনো মানচিত্র? পরলোকের উল্লেখ কেন নেই ব্র্যাড্‌শ'তে?

তখনি আমি ছুঁড়ে ফেলে দিই আমার খেলার-পড়ার ম্যাপ আর ব্র্যাড্‌শ। পড়তে বসি রাস্‌কিনও যাদের সম্রাজ্ঞীর আসন দিতে দ্বিধা করতেন না। কিছুক্ষণ বাদে আবার ও দুটো তুলে রাখি। ওরাই তো আমার সে পথের হদিস দিয়েছিলো যার শেষ থেকে কেউ ফিরে এসে আঁকতে পারে না মানচিত্র, সংকলন করতে পারে না ব্র্যাড্‌শ। হ্যাঁ, আমার লাইব্রেরিতে ওদেরও জায়গা হবে।

বইয়ের বদলে। বৈশাখ ১৩৫৯ ॥

গুম্ফ

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

'চুমু খাওয়ার স্বাদ গেল'—গোঁপ কামানোর রেওয়াজ সুরু হ'লে এই ব'লে একদা আপশোস করেছিলেন জনৈক ফরাসিনী। তারপর বহু বছর অতিক্রান্ত, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই আজ গুম্ফহীন—কিন্তু চুম্বনের স্বাদ সত্যিই কী অন্তর্হিত ?

আমার পক্ষে বলা মুশকিল !

তবে মেয়েলি সাধ-আহ্লাদের কথা যদি ধর্তব্য না-ও হয়, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে গোঁপের বিরাট একটা ঐতিহ্য রয়েছে মানতেই হবে। আমার এক অধ্যাপক বন্ধু বলেছেন, গোঁপের উৎপত্তি গুম্ফা থেকে : গুম্ফা—গুম্ফ—গোঁফ—গোঁপ। গুম্ফাগুলি, কে না জানেন, অতীত ভারতীয় শিল্প-ভাস্কর্যের অনুপম এক-একটি নিদর্শন। সেদিনের শিল্পীরা সগুম্ফ ছিলেন ব'লেই তাঁদের সৃষ্টিকেন্দ্রগুলি গুম্ফা নামে পরিচিত। শুধুই কি তাই ? দম না নিয়ে বন্ধু বললেন, গোঁপের থেকেই গোপ কিনা, দ্বাপরে গোঁপবানদেরই গোপ বলা হতো কিনা, হ'লে গোপকুলচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের গোঁপ কী আকারের কী ধরনের ছিলো—ইত্যাদি নিয়ে গবেষণার জন্যে মার্কিন বৃত্তি পেয়ে সামনের মাসে তিনি হনলুলু যাচ্ছেন।

তা বন্ধু আমার অধ্যাপক হলেও কথাটা নেহাৎ আহাম্মকের মতো বলেন নি।

সত্যিই আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। নইলে অমৃতের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় মুনি-ঋষিদের মুখাবয়ব আমাদের মনে পড়ে না—মনেও পড়ে না গোঁপ-দাড়ির অবাধ বৃদ্ধিতে কী বিশুদ্ধ ভারতীয় সাম্যবাদী মনোভাবের পরিচয় তাঁরা দিয়ে গিয়েছেন।

গুম্ফাদর্শের ক্ষেত্রে আশুতোষ ছাড়া দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া আজ দুষ্কর। একমাত্র আশুতোষই যা-হোক-একটা গোঁপের স্কুল গড়ে

তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু আশুতোষী গোঁপেরও প্রগতিশীল চরিত্র আজ নষ্ট হ'য়ে গেছে। এখানেও অধুনা মাড়োয়ারীর একাধিপত্য।

অবশ্য গুম্ফাদর্শে ঐতিহ্য-বিচুতি আমাদের সম্প্রতিকালে ঘটেনি। দেশপ্রেমের আদর্শ বিদেশের কাছে ধার করবার সময়েই জাতীয় মন্ত্রের উদ্‌গাতা বঙ্কিমচন্দ্রের পদস্খলন ঘটেছিল। পরবর্তী প্রায় সব সাহিত্যিকই তাঁর পদাঙ্ক অনুসারী। এক জোড়া কাইজারী গোঁপে মুখখানি কী মাননসই হতো বিদ্যাসাগরের! আহা, বিবেকানন্দের যদি একটুকরো হিটলারী গোঁপ থাকতো! আচার্য জগদীশের রোনাল্ড কোল্‌ম্যানী! অবন ঠাকুরের স্ট্যালিনী! বিধান রায়ের চৈনিক! ভাবুন তো একবার? কারো কিছু নেই, সব ল্যাপাপোঁছা।

রাজনীতিতেও গান্ধী, জওহরলাল, দেশবন্ধু, প্যাটেল, সুভাষ সকলেই গুম্ফহীন। (এক মহিলা মন্ত্রী আমায় বলেছেন, প্রাক-স্বাধীনতা যুগে নাকি গুম্ফহীনতাই স্বদেশ-প্রেমের সবচেয়ে বড়ো নিরিখ ছিলো—নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই।) ব্যতিক্রম শুধু রবীন্দ্রনাথ। তা রবীন্দ্রনাথকে তো আমরা সব কিছুর ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য করতে অভ্যস্ত। (গুরুদেব কোনোদিন খাওয়ার সময় হাঁ করতেন না, দৃষ্টিকটু দ্যাখায় ব'লে। সত্যিকারের জীবনশিল্পী কিনা!—এক পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতনী সভাপতির মুখে শোনা।) আরেক ব্যতিক্রম ব্রজেন শীল। তবে তাঁর গোঁপদাড়ি রাখার বৈজ্ঞানিক হেতু ছিলো। গোঁপ কামালে দর্শনশক্তি হ্রাস পায়—বিশেষজ্ঞদের মুখনিঃসৃত হ'লেও যদি কথাটা সত্যিই সত্যি হয়? এই আশঙ্কাতেই, আমার ধারণা, দার্শনিক শীল মশায় গুম্ফশ্মশ্রু কোনওদিন মোচন করেন নি।

গুম্ফাদর্শে আজ আমরা পরমুখাপেক্ষী।

কাইজারী, হিটলারী, স্ট্যালিনী ও কোলম্যানী—মোটামুটিভাবে গোঁপকে দুই চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। অবশ্য চতুর্বর্ণ হিন্দুসমাজের অবিকল এ থেকেও অনেক সঙ্করের সৃষ্টি হয়েছে।

এর মানে অবশ্য এই নয় যে, উপরোক্ত চার ব্যক্তিই চতুর্বর্ণ গোঁপ সমাজের আদি পুরুষ। কাইজার, হিটলার, স্ট্যালিন ও কোলম্যানের আগের কি ও ধরনের গোঁপ কারো ছিলো না? অবশ্যই ছিলো। কিন্তু তাঁদের শুধু গোঁপই ছিলো, আর কিছু নয়। তাই তাঁরা কেউ বিখ্যাত হ'তে পারেননি। শুধু সাহিত্য করলেই কি সাহিত্যিক হওয়া যায়—সাহিত্যিকের রাজনীত না ক'রে?

হিটলারী গোঁপের আবিষ্কর্তা চার্লস চ্যাপলিন। নিজে নিগুম্ফ হ'লেও এটা তাঁর ট্রেডমার্ক। এই ট্রেডমার্ক জাল করার দায়ে হিটলারের বিরুদ্ধে চার্লি মামলা পর্যন্ত রুজু করেছিলেন। শুনানী মুলতুবি থাকতে থাকতে যুদ্ধ বেধে গেল। আমার বিশ্বাস, চার্লির নাৎসী বিরোধিতার আসল কারণ এইখানে। নইলে সৎ শিল্পী কখনও রাজনীতিতে নামে—আঁতে ঘা না পড়লে? সরকারী অনুগ্রহের 'আয়—তু-তু' ডাক শুনলে, বা শোনার আশা তিরোহিত হলেই না— যাক সে-কথা।

॥ ২ ॥

আমাদের দেশে যেটুকু গুম্ফচর্চা হ'য়ে থাকে তা একক ভাবে। এ নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ কোন আন্দোলন এ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। অথচ, ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, শুধু আয়নায় কুলোয় না—আরেকজনের হস্তক্ষেপ ব্যতীত সার্থক গুম্ফচর্চা অসম্ভব। বিশেষ ক'রে কোল্‌ম্যানীর চর্চা। সেলুন থেকে একদিন হয়ত খাপসুরত একখানি কোলম্যানী, আপনি বানিয়ে আনলেন। তারপর? হাজার কসরৎ করলে কি একক চেষ্টায় স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখতে পারবেন? নৈব নৈব চ। কালনেমির লঙ্কা-ভাগের মত এদিকে ওদিকে কমতে কমতে নির্ঘাৎ সেটা হিটলারীতে পরিণত হবে। চাই কি, মাথা গরম হ'য়ে গেলে, হিটলারের পরিণাম ঘটাও আশ্চর্য না। অথচ এই ট্রাজেডি বন্ধুবান্ধব কেউ বুঝবে না। ভাববে, ব্লেডের ক্ষয় (অর্থাৎ খরচ) কমাবার জন্যেই বুঝি কখনো আপনি গোঁপ রাখেন, কখনো রাখেন না।

আমাদের দেশে গুম্ফ-আন্দোলনের অস্তিত্ব না থাকলেও পৃথিবীর অনেক দেশেই রয়েছে। সিঙ্গাপুরের লুইস্‌কারস্‌ ক্লাব তো জগদ্বিখ্যাত। এই ক্লাবের বার্ষিক গুম্ফ-প্রতিযোগিতার নামেই তামাম দুনিয়ার গুম্ফ-বিলাসীদের গোঁপ খাড়া হয়। অথচ এই আন্দোলনে রাজনীতির নামগন্ধও নেই। (এ বড় কম কথা নয়। তাই কি শোনা যাচ্ছে—বৃটিশ আমলের ব্রতচারীর মতো সরলমতি স্কুলের ছেলেদের রাজনীতির ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাবার জন্যে স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর আজ স্কুলে স্কুলে এই আন্দোলন চালু করার কথা গভীরভাবে ভাবছেন?)

আমাদের দেশেও সুপরিকল্পিত উপায়ে গুম্ফ-আন্দোলন সুরু হোক একান্তভাবে আমি চাই। কারণ আজো আমাদের দেশে অনেকে গোঁপ রাখেন, অথচ এ-সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান তাঁদের নেই। খবরের কাগজ পড়ার মতো আজও তাই আমাদের বাধ্য হয়ে দেখতে হয়—আশুতোষী গোঁপ নিয়ে কোন তরুণ প্রেমিক হবার প্রয়াস পাচ্ছে, কোল্‌ম্যানীর নাক দিয়ে নস্যির লালা গড়াচ্ছে! কাকে কী মানায় এরা জানে না। জানেনা যে শরীরের দৈর্ঘ্য, মুখের জ্যামিতি, বংশগতি, বয়েস, পেশা, পরিবেশ, মেজাজ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির কথা মনে রেখে শিল্প হিসেবে গুম্ফচর্চা কর্তব্য। শিকারী বেড়ালের গোঁপ দেখলে চেনা যায়—নেতাদের ক্ষেত্রে এটা ষোল আনা মিথ্যে হ'তে পারে, যে কোনো ভদ্র-লোকের বেলায় কিন্তু সতেরো আনা সত্যি।

শিল্প হিসেবে গুম্ফচর্চা শুনেই অনেকে হয়তো আঁৎকে উঠবেন: কী সর্বনাশ! শিল্পের জন্য শিল্প, শিল্পীর জন্য শিল্প, জনগণের জন্য শিল্প ইত্যাদির মতো হিটলারী গোঁপ, না স্ট্যালিনী গোঁপ, না কি কাইজারী গোঁপ, নাকি আদি অকৃত্রিম ভারতীয় আদর্শের রাবীন্দ্রিক গোঁপদাড়ি? —ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেবে না? দিলে কি তা কলমবাজীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে—পথে-ঘাটে গোঁপ নিয়ে টানাটানি শুরু হ'য়ে যাকে না 'গোঁপের আমি—গোঁপের তুমি' শ্লোগান সহযোগে? •

যদি হয়ও, ক্ষতি কি? মহৎ আদর্শের জন্যে মহত্তর ত্যাগ স্বীকার

করতে হয়ই। তাছাড়া মুখসৌন্দর্য ছাড়াও গোঁপের ব্যবহারিক লাভ কি কম? লভের প্রতিযোগিতায় আশুতোষী গোঁপ হয়তো যুৎসই নয়, কিন্তু ভাবুন তো, পানীয় শোধনের কত সুবিধে ওতে। ট্রামেবাসে পরের পকেট থেকে মানিব্যাগ তুলে নেওয়ার পেশা যদি জীবনে গ্রহণ করতে চান, কাইজারী গোঁপের মতো সহায় আর নেই। গৃতপকেট ব্যক্তি টের পেলেও আপনার দিকে আড়ে চাইতে পর্যন্ত সাহস করবে না। সময় ক্ষেপনের সমস্যা থাকলে মনোমত এক সধর্মী জুটিয়ে কোল্‌ম্যানীর চর্চায় আত্মনিয়োগ করুন। ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দারা বাগানপরিচর্যার শখও কোলম্যানীর চর্চায় মেটাতে পারেন। স্ট্যালিনী-ও অতি উত্তম। বিশেষ ক'রে, স্ট্যালিন মারা যাবার পর এ ব্যাপারে আর খুঁতখুঁতানি থাকা উচিত নয়। কেননা, মৃত ব্যক্তি মাত্রেই আমাদের কাছে তর্কাতীত মহাপুরুষ। দেখেননি, একদা 'রক্তখেকো বলশেভিক' নামে প্রচারিত লেনিনের সচিত্র জীবনী আজকাল গান্ধীর পাশাপাশি ছাপা হয় ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে?

তবে একটা কথা, স্ট্যালিনী গোঁপ রাখলে আচমকা রাতারাতি কিন্তু কামিয়ে ফেলবেন না। আপনার কামানো গোঁপ দেখে লোকের হয়তো কুখ্যাত কোন সম্পাদকের কথা মনে পড়ে যাবে, ভাববে, জীবনেও বেশ-কিছু কামিয়ে পুরনো খোলস বদলাবার জন্যে এখন গোঁপ কামিয়ে দাঁত-নেই-তাই-মাংস-খাইনা সাত্ত্বিক সাজছেন।

হিটলারী গোঁপের সুপারিশ কিন্তু করতে পারছি না। হিটলারী গোঁপ দেখলেই আমার মনে হয়, ওটা যেন গোঁপ জাতির 'মিসিং লিঙ্ক'। নামমাহাত্ম্যে কিনা কে জানে, হিটলারী গোঁপ রাখলে মানুষ যেন অমানুষ হ'য়ে যায়, কিংবা অমানুষরাই হিটলারী গোঁপ বেছে নেয়। কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুকে দেখে এই সত্যোপলব্ধি আমার হয়েছে।

হিটলারী গোঁপের চেয়ে চৈনিক শ্রেয়। বিশেষ ক'রে যাঁরা নস্যাসক্ত তাঁদের পক্ষে। নস্যি নেওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে না, নাসিকা-গহ্বরের সামনেটা নিকনো উঠোনের মতো তকতকে

থাকবে, আর ছুপাশে কাঁকড়ার দাঁড়ার মত ছুগাছি গুম্ফগুচ্ছ গণ্ডের ওপর নেমে আসবে। মঙ্গোলীয় মুখ বড়ো অপূর্ব খোলতাই হয় এতে।

শুধু নস্যাসক্ত নন, পারিবারিক কারণে যাঁরা ইচ্ছে থাকলেও গোঁপ রাখতে পারছেন না, তাঁরাও একবার চৈনিকের শরণ নিয়ে দেখতে পারেন। তবে খবরদার, এর সঙ্গে দাড়ি যেন ভুলেও রাখবেন না—সাম্প্রদায়িক হ্যাঙ্গামায় আর রক্ষে নেই!

॥ ৩ ॥

গুম্ফের এবংবিধ উপযোগিতা সত্ত্বেও নিছক পারিবারিক কারণে অনেকের পক্ষে আদৌ গুম্ফচর্চা সম্ভব হয় না। একদিন শেভ না করলেই অনেক স্ত্রী স্বামীর প্রতি বি-মুখ হন। এ হেন স্পর্শকাতর স্ত্রীর স্বামীরা কী করবেন? স্ত্রীকে লুকিয়ে আর সব চর্চা সম্ভব হ'লেও গুম্ফচর্চা তো অসম্ভব?

অর্থাৎ আমি কী করি?

মনে মনে আমি খেলি গোঁপ-চালানো খেলা। অতি উপাদেয় এই খেলা। এই খেলার নেশায় একবার পেয়ে বসলে জাইগের 'রয়্যাল গেম'-এর দাবা-পাগল নায়কের মতো অবস্থা হ'য়ে বসাও কিছুমাত্র আশ্চর্য না।

অপিচ অতি সহজ সরল এই খেলা। জাইগের নায়কের মতো দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ বন্দীজীবন যাপনের দরকার এতে নেই, প্রাথমিক পর্যায়ে দাবার বই ইত্যাদিরও না।

শুধু মনে মনে ছটি নৈর্ব্যক্তিক গোঁপ সংগ্রহ করুন—কাইজারী, হিটলারী, স্ট্যালিনী, কোলম্যানী, আশুতোষী ও চৈনিক। তারপর দেশবিদেশের স্মরণীয়দের একে একে স্মরণে আনুন—বুদ্ধ, খৃস্ট, গান্ধী, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, জহরলাল, রাধাকৃষ্ণণ ইত্যাদি। তারপর—

আশা করি তারপর আর খুলে বলতে হবে না। ভাবুন, ভাবুন, ভাবুন।

তবে দোহাই, মহিলাদের এতে টানবেন না যেন। মহা মুশকিলে পড়ে যাবেন কিন্তু। কাইজারী, হিটলারী, স্ট্যালিনী, কোলম্যানী, আশুতোষী না চৈনিক—আমার এক নাতিপরিচিতা লেখিকার মুখে এর কোনটি মানাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেবে আজ পর্যন্ত আমি মনস্থির ক'রে উঠতে পারিনি। খালি মনে হয়, মেয়েদের সব মানায় সব মানায়। মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা যে ওঁদের অসীম !

'সত্যযুগ'। আষাঢ় ১৩৫৭ ॥

বাজারে আম

রূপদর্শী

বেশ একটা মেয়েলি ছড়া আছে। পৌষে কুশি, মাঘে বৌল, ফাল্গুনে গুটি, চৈত্রে কাটিকুটি, বৈশাখে ঝোল, জ্যৈষ্ঠে তুধের বাটি, আষাঢ়ে আদাড়ে আঁটি, শ্রাবণে—

আর শ্রাবণ পর্যন্ত গিয়ে কাজ নেই, আঁটির তত্ত্ব তোলা থাক। আমের তত্ত্বই বলি। আম আমাদের ন্যাশনাল ফ্রুট। বিদেশে চাহিদা যেমন বাড়ছে, ভয় হয় একদিন না দেশের তাবৎ আম কালাপানি পাড়ি দিয়ে ডলার স্টার্লিং রোজগার করতে বিদেশের বাজারে যাত্রা শুরু করে। আম নিয়ে কালাপানির পারের দেশে আমার জ্ঞানতঃ তু'বার কেলেঙ্কারি হয়েছে। একবার রামায়ণে, হনুমান লঙ্কায় গিয়ে রাবণরাজার ল্যাংড়ার বাগানে ঢুকে একেবারে ভুট্টিনাশ ক'রে ছেড়েছিলো। সে গল্প তো ছেলে বুড়ো সবাই জানে। আম নিয়ে আর কেলেঙ্কারি করেছিলেন বার্নার্ড শ। তার অবিশ্যি কায়দাটা অন্য। পণ্ডিত নেহেরু একবার আমের টাইমে লণ্ডন যাবার সময় কয়েক ঝুড়ি আম নিয়ে গিয়েছিলেন। বার্নার্ড শ-এর সঙ্গে মোলাকাৎ ক'রে তাঁকে তো এক ঝুড়ি সরেশ ফল চাখবার জন্যে দিয়ে এলেন। তুদিন বাদে দেখা হ'তেই একগাল হেসে পণ্ডিতজী শুধুলেন, মহাশয়ের কেমন লাগলো ফলগুলো? শ বললেন, সবুর, বলছি। ব'লেই হাঁক পাড়লেন বাবুর্চিকে। বাবুর্চি এলো, শুধুলেন, কি হে, ফলগুলো যে দিলাম, তা কেমন খেলে বাপু? একগাল হেসে বাবুর্চি বললে, ফাস্ কেলাস্। আছে নাকি আরো? শ বললেন, কি হে ছোকরা, পেলে তো সার্টিফিকেট? কিছু মনে করো না। এই শেষ বয়সে নতুন এক্স্পেরিমেণ্ট করতে সাহসে কুলোয় নি। তাই ও ব্যাটাকেই দিয়েছিলুম টুকরিটা।

আমের নামে শ হয়ত 'শক্' পেতেন, কিন্তু বাঙালীদের জিভ্ যে সক্সক্ করে, পড়ি কি মরি তাঁরা যে বাজারে ছোটেন সে তো চোখের

সামনেই দেখি। ব'সে ব'সে দেখছিলুম তাই। ক'দিন ধরে কী গরমটাই পড়েছে! সূর্য এমন চটা চটেছেন যে থেকে থেকে মুঠোভর রোদের গুঁড়ো সামনের বিরাট পাত্র থেকে তুলে নিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছেন। গোল মরিচের গুঁড়ো এসে যেন আমাদের চোখে ঢুকছে, যন্ত্রণাটা মালুম হচ্ছে তেমন। প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি। কিন্তু আমের বাজার সমান চালু। মেম আসছে, মাড়োয়াড়ী আসছে, বাঙালী, মাদ্রাজী বাদ আর কেউ নেই।

আড়তদার বললেন, আম খায় না কে? সাহেব বিবিরা ল্যাংড়া পেলে আর ছোঁবেই না। ল্যাংড়া ধ্যান ল্যাংড়া জ্ঞান ল্যাংড়াই ওদের সার। অবিশ্যি ল্যাংড়া সবারই পেয়ারের। কিন্তু মজা দেখুন, মাড়ো-য়াড়ীরা বাজারে এসে আগেই খুঁজবে আল্‌ফান্‌সো। এ মুলুকের আম নয়, কোইম্বাটুর, বোম্বাই ওই সব তল্লাটে জন্মায়। বড় বড় গাড়ি ক'রে শেঠের পো-রা নামবেন সব। তারপর মুখ খুলেই শুধুবেন, হাপুস হ্যায়? লাও দো টুকরি। আল্‌ফান্‌সো আমকেই এখানকার বাজারে হাপুস বলে। পেলেন তো উত্তম, নইলে সেকেন্‌ অর্ডার গেল, আচ্ছা বোম্বাই মিলে গা? খাস বোম্বাই মিলবে? মিলবে না কেন শেঠজী, তাহলে আর আছি কেন এখানে। তবে হিমসাগরটা একবার দেখলে হতো না? হিমসাগর! আরে, রাজজী তেরা ভালা ক'রে, দো ভাই, দো চার টুকরি দে দো। দিয়ে দাও ভাই, হিমসাগর পেলে আর কি কথা। তবে হ্যাঁ, সাইজগুলো যেন বেশ চোখে লাগার মতো হয়।

মাড়োয়াড়ীদের ওই ব্যাপার। হিমসাগর না পেলে তখন দেখ বোম্বাই, তাও যখন মিলছে না সুবিধে মতো, তখন ক্ষমা ঘেন্না ক'রে ল্যাংড়াই হয়তো নিলে এক টুকরি। তবে বলিহারি আম খায় বটে মাদ্রাজী। কী যে ওদের পছন্দ ঈশ্বরই জানেন। এই যে দেখছেন সব পুষ্টু পুষ্টু আম, কী ফ্লেভার, কী রং, কী স্বাদ! আমের আর এক নাম যে 'অর্মেত' (অমৃত) ফল, তা সে নামটা কি আর বে-ফজুল দেওয়া হয়েছে। তেমন তেমন আম হ'লে এক চাকলা জিভে দিতে না দিতেই প্রাণ তর্‌র্‌ হ'য়ে যায়। তা মাদ্রাজীদের মশাই সেদিকে নজর নেই

একটি ফোঁটা, বাজারে এসেই খুঁজে পেতে বেছে বেছে রাম-টক আম সব বের করবে, তারপর সেগুলো কিনে ঘরমুখো রওনা। আর টকও কি একটু আধটু না কি? গাই-এর কাছ দিয়ে নিয়ে গেলে বাঁট দিয়ে আর দুধ বেরুবে না মশাই, গুচ্ছের চিনি খাইয়ে সে সময় যদি দুইয়ে নিতে পারেন তো বিনা পরিশ্রমে একেবারে চিনিপাতা দই পেয়ে যাবেন। মিষ্টি আম যেন ওদের ভাসুর।

হ্যাঁ, এসব দিক দিয়ে বাঙালী। সত্যিকারের আম-'ঈটার' বটে। সর্বজীবে দয়া। আঁটির কি কলমের, বোম্বাই কি জিজিটোরা, ফজলী কি মধুকুলকুলি, মিষ্টি কি টক কি পানসে, কিচ্ছু বাছ-বিচার নেই, আম হ'লেই হলো, টপাটপ পেটে পুরে শান্তি। নইলে বুঝছেন না, ভারতের প্রায় সর্বত্রই তো আম জন্মায়, কিন্তু কলকতার মতো এত বড়ো বাজার আর কোথাও নেই। একজন দুজন নয়, ষাট হাজার লোক শুধু এই কাজেই লেগে রয়েছে।

কথাবার্তায় বাধা পড়লো। এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হ'য়ে ঢুকে পড়লেন আড়তদারের ঘরে। চোখাচোখি হ'তেই হৈ হৈ করে উঠ্‌লেন, কী আমই দিয়েছিলে ভায়া! একটা যদি মুখে তুলতে পেরেছি। সব ক'টা কাঁচা। একবার যেও বাড়িমুখো। তোমার শ্যালিকাটি একেবারে শ্রীশ্রীচণ্ডী সেজে বসে আছেন।

আড়তদার হাঁক পাড়লেন, বুধুয়া! গুটি গুটি বুধুয়া এসে দাঁড়ালো। মুখভরা একগাল হাসি। কি রে ব্যাটা, কাল এই বাবুকে কী আম দিইছিস? কেন, বেশ সরেশ আম দিয়েছি। আপনার কথা মতোই দিয়েছি। কোন গুদাম থেকে? দু নম্বর। একটু চুপ ক'রে গেলেন আড়তদার। তারপর বললেন, ঠিক হয়েছে। কি আর বলবো দাদা, সবই গেরো। ফার্স্ট ক্লাস আমই আপনাকে দেওয়া হয়েছিলো। ল্যাংড়ার এই ভ্যারাইটি বাজারে পাওয়াই যায় না। চল্লিশ টুকরি এসেছিলো, সব কটাই পরিচিত লোকদের ডেকে ডেকে দিয়েছি। সবই হয়েছিলো, একটুর জন্যে সব বরবাদ হ'য়ে গেল। আচ্ছা, দাঁড়ান,

দেখি। আপনাদের তো আর কিছুতে তর সইতে চায় না। বুধুয়া !'

ডাক শুনে বুধুয়া এসে দাঁড়ালো। আড়তদার খাতা খুলে দেখে বললেন, রামধারীর ঘরে যা। বল্‌গে, পরশু আমার কাছ থেকে ল্যাংড়ার যে টুকরি কটা নিয়ে গেছে, বিক্রি হ'য়ে না থাকলে এক টুকরি নিয়ে আয়। বলবি যে বাজার দরই দেবো, নইলে ব্যাটা দিতে চাইবে না। বুধুয়া চলে গেল। ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললেন, একটু যদি ধৈর্য ধ'রে থাকতেন তো দেখতেন যে কি চীজ্‌ দিয়েছিলাম কত সস্তায়। কত, ন টাকায় দিয়েছিলাম না টুকরি? এখন দেখুন সেই টুকরিই কত দিয়ে কিনতে হয়। সেরেফ দুটো দিন যদি কম্বল চাপা দিয়ে রেখে দিতেন টুকরিটা, কিছুই না, নীচে একখানা গরম কম্বল ভাঁজ ক'রে, তার ওপর টুকরিটা রেখে আর একখানা কম্বল দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলেই হতো, আজ দেখতেন গন্ধে ঘরখানা ভরে উঠতো।

বুধুয়া এক টুকরি আম নিয়ে এলো। ঝুড়ি খুলতেই পাতার ফাঁক থেকে টুকটুকে ল্যাংড়াগুলো মিচকি মিচকি হাসতে সুরু করলে। ভদ্রলোক তো মহা খুশি। আড়তদার বললেন, 'সেম্‌' জিনিস। অথচ, —কি রে, কত চাইলে? তের টাকা? দেখলেন, আমারই বেচা মাল, আমাকেই আবার চড়া দামে কিনতে হচ্ছে।

ভদ্রলোক চ'লে যেতেই আবার গল্পগুজব সুরু করলুম। বললেন, বারো মাসই প্রায় কলকাতার বাজারে আম পাবেন। তবে 'অফ্‌ সিজিন'এর আম সে মশাই ফিলিমের বিবি। দেখতে-শুনতেই যা ছিম্‌ছাম, দূর থেকে জেল্লা মারে, তৃপ্তি পাওয়া যায় না। যে সময়ের যা, সিজিন কালের আমের চেহারা অন্য রকম। আর মার্চ মাসের শেষের দিক থেকে সেই যে আম আসতে সুরু করে, শেষ হতে আগষ্ট মাস। বাজারে আম পাঠিয়ে বউনি করে কাল্লিকট। মার্চেই কাল্লিকটের আম কলকাতার বাজারে এসে ঝাঁটপাট ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে দোকানের ঝাঁপ খুলে বসেন। তারপর দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে

কোইম্বাটুরী; পাইরী, হাপুস, সবেদা, গোলাপখাস, বেগুনফুলী, তোতাপুরী আসতে স্থরু করেন। দেখে বাঙলা বিহারে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। বাংলার সরেশ আম হিমসাগর, বিহার বারাণসীর ল্যাংড়া, বোম্বাইএর আল্‌ফান্‌সো। বাজারে পড়তে না পড়তেই সরগরম। মেওয়াবাজার ভরাভরন্ত। ক্যায়া ভাও? এই টুকরিতে কত আম আছে? ভসাভস ট্যাক্সি ক'রে মেম আস্‌ছেন, সাহেব আসছেন, দেশ-বিদেশের লোক মেয়েলোকে আমের বাজার থকথক করছে। জুন মাস আমের মাস। জুন শেষ হ'তে-হ'তেই তেজের স্থতোয় ঢিলে পড়ে। এতদিন ধ'রে মালদা এক কোণায় ঘাপটি মেরে শুধু ছোকরাদের তড়পানি দেখছিল। আর মিচকি মিচকি হেসে ছটাকী আমেদের লাফঝাঁপ করবার স্থযোগ দিচ্ছিল। যেই দেখলে ওদের দম ফুরিয়ে এসেছে, ঝপাঝপ পাঠাতে স্থরু করলে ফজলী। হ্যাঁ; আম বটে ফজলী, বাপ্‌ কী সাইজ একখান, একটাকে কায়দা করতেই ঘাম বেরিয়ে যায়। ফজলী আম গেরস্থদের খুব আদরের। গুষ্ঠীপোষানী কি না। যোগযোগে একটা কিনে নাও, একপিঠ নিজেরা খাও, অন্য পিঠ বেয়ানবাড়ি পাঠাও, আঁটিটুকু চাকর-বাকরকে দাও, ছিটেফোঁটা যা লেগে থাকবে, তাই খেলেই ঢেকুর উঠবে—হে-উ। ফজলী আমের সঙ্গে সঙ্গেই আমের বাজারের অন্ত শেষ রজনী। তাই কি? আরে দাঁড়াও। আরে, ওই যে ফরাসের পাশে ট্যাম ট্যাম করছে, ওটা কে? লজ্জায় পড়ে গেল বেচারা। নেমন্তন্ন ছিল তুপুরে, গড়িমসি ক'রে এসে যখন পৌঁছুলো, তখন ঝি-ঝাকরের অব্দি খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেছে। তাই লজ্জায় বেচারা অধোবদন হ'য়ে, নখ দিয়ে মেঝেতে আঁকিবুকি কাটছে। কি করতে কত্তা ইদিকে আবার এসেছিলেন। দেখেই চীৎকার ক'রে উঠলেন, আরে এসেছে তাহলে, এস এস, আমি আরো ভাবছিলুম—

কত্তার হাঁকডাকে সবার দৃষ্টি আবার পড়লো। তখন আধার তাকে নিয়ে সব্বায়ের টানাটানি। এঁর নাম কাঞ্চন। কালো কালো চেহারা।

আম্রকুলের ইনি কনিষ্ঠ সন্তান। ভাঙা হাটেই এঁর আসর। আগস্টের মাঝামাঝি এঁর আগমন। ইনি আসবেন, 'ক্লোজিং সঙ্' গাইবেন—

ভাঙল আমার খেলা
সাঙ্গ আমার বেলা।
যাই গো এবার, যাই!

নকশা। ডিসেম্বর ১৯৫২ ॥

চিঠিপত্র

প্রাণতোষ ঘটক

মাথায় যে নামটা দেখছেন তা থেকে আমি চিরকাল বঞ্চিত। বিশ্বাস করুন চাই নাই করুন, এ অধম কোনো খুবসুরত বেগম সাহেবার কাছ থেকে কখনও কোনো আসনাই নিবেদন লাভ করেনি। তামাম দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে আমার সুখে অথবা অসুখে চিঠি দিয়ে খবরাখবর করবে, চোখের পানিতে দু চার ছত্র লিখে সময়ে অসময়ে তলব ক'রে পাঠাবে।

তথাপি আমার মেজাজ ঠিক রাখার দাওয়াই হিসাবে আমি সেবন ক'রে থাকি পত্রনির্যাস। যাদের কখনও দেখিনি তখন তাদের দেখতে পাই, যাদের সঙ্গে কদাচ দেখা হতো না তখন তাদের দেখা পাই, যারা আমার কেউ নয় তারাই অতি আপনজনের মতো আমার মনের মধ্যে বাসা বাঁধে—ইতিহাস তখন মিথ্যা মনে হয়, বাংলার ঐতিহাসিকদের মনে হয় ঘুষখোর, শিশুকাল থেকে পাঠ্যপুস্তক প'ড়ে ইতিহাসের যে জ্ঞান অর্জন করেছিলাম, নিমেষের মধ্যে কর্পূরের মতো তা যেন উবে যায়, তখন পৃথিবীর অন্যতম মহাজন সক্রেতিস, কনফুসিয়াস, যীশু, গান্ধী, বঙ্কিম, সেক্‌স্‌পীয়র, শেলী, রবীন্দ্রনাথ, নেপোলিয়ন, বিসমার্ক, হিটলার, চার্চিল প্রভৃতির স্বরূপ মূর্তি দেখতে পাই। চিঠি প'ড়ে যতটা তাঁদের জানতে পারি তাঁদের কথা আর উক্তি প'ড়ে তার কিছুই জানা যায় না।

আমাদের দেবভাষায় একটি কথা আছে—"পাত্যতে স্থানাৎ স্থানান্তরং সমাচারয়হনেন।" কথাটির বঙ্গার্থ করলে মানে হয়, যদ্দারা সংবাদ এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে নীত হয়, তাকে পত্র বলে। এই 'পত্র' শব্দের মুখ্যার্থ ছিলো বৃক্ষাদির পাতা, গৌণার্থ—লিপিকার্যের জন্য ব্যবহৃত তালপত্র, কদলীপত্র, ভূর্জপত্র এবং সাচিপত্র ইত্যাদি।

ইংরেজী ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হয়, যন্ত্র আবিষ্কার

করেন মিঃ গটেনবর্গ। তারপর অনেক পরে এ যন্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। তার আগে পর্যন্ত তাই আমরা গাছের পাতার সাহায্যে এগিয়েছি। আমাদের সভ্যতার হাতেখড়ি বৃক্ষপত্রে হয়েছে এমন কথাও বলতে পারেন ইচ্ছা করলে।

এই 'পত্র' অর্থাৎ পাতা থেকে ক্রমশঃ সৃষ্টি হয়েছে অনেকগুলি শব্দের। যথা—পাট্টাপত্র, কবুলিয়তপত্র, তমঃসুকপত্র, চুক্তিপত্র, মুক্তি-পত্র, দানপত্র, নাদাবীপত্র, আশীর্বাদীপত্র, উইল বা চরমপত্র, প্রেমপত্র প্রভৃতি আর কত বলবো ?

শুনতে পাই, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করতে হ'লে বাল্যাবস্থায় শিক্ষা করতে হয় পত্র-লেখন-প্রণালী। ক্ষোভের কথা এই, ডিগ্রীধারীদের একজনকেও তাই বড়ো একটা Letter-Writer হ'তে দেখা যায় না। দেখা যায়, যাঁদের ডিগ্রী আদপেই ছিলো না তাঁরাই পারেন সত্যিকারের চিঠি লিখতে।

এক Man of letter-এর নাম স্বতঃই মনে উদিত হয়, তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার নির্দিষ্ট পত্রলিখন-শিক্ষার কেতাবগুলি যাঁরা রচনা করেন তাঁরা পণ্ডিত বররুচির 'অমরকোষ' গ্রন্থখানি যদি একবার উলটে-পালটে দেখতেন তাহলে আর এমন দশা হয়তো হতো না আমাদের।

আমাদের আদিম এবং অকৃত্রিম বিশ্ববিদ্যালয় শেষ পর্যন্ত মাত্র একটি কথাই সারশিক্ষা দেন। কথাটি হলো—Your most obedient servant, অর্থাৎ আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য।

দুঃখের কথা, এই সকল ভৃত্যের জীবনে অফিসের কাজ-সংক্রান্ত ব্যতীত আর কোনো রকমে চিঠিপত্র রচনার অবকাশ নেই। তাদের বৈষয়িকপত্রেও থাকে না তাই, এমন কোনো ভাবের কথা, যা থাকে তার সবটুকুই অভাবের কথা।

চিঠিপত্র সম্বন্ধে বররুচি কি বলেন ?

আপনি যে কাজের মানুষ, নতুবা এক কথায় ব'লে দিতাম কি

আছে তা জানবার আগে 'পত্রকৌমুদী' গ্রন্থটিকে পুনরায় আপনাদের কাজে লাগিয়ে দিন। আপনি যে এখন দেশের কাজে গা এলিয়ে দিয়েছেন, খদ্দরের বোঝায় আপনার আপাদমস্তক ভারাক্রান্ত, আপনি বারোইয়ারি ক্লাবের মেম্বর, পুরুষ ও মহিলা সমিতির পাণ্ডা, দুঃস্থ ও দুর্গতদের মুস্কিল-আসানের চিন্তায় আপনি সদাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত—বররুচির 'অমরকোষ' ও 'পত্রকৌমুদী'র রীতিনীতি কি পালন করতে পারবেন? সময় আছে?

তবুও এত যখন আগ্রহ, তখন না বললে আমাকে হয়তো পণ্ডিতম্মন্য মনে করতে পারেন।

পত্র-রঞ্জন

স্বর্ণরূপ্যরঙ্গাদ্যৈ রঞ্জয়েৎ পত্রমঞ্জমৎ।
সামান্যোত্তমমধ্যানাং পত্ররঞ্জনমীরিতম্॥

অর্থাৎ, পূর্বকালে পত্র রঞ্জিত করিবার রীতি ছিলো। স্বর্ণ দ্বারা রঞ্জিত পত্র উত্তম, রৌপ্য দ্বারা রঞ্জিত পত্র মধ্যম এবং রাং ও তামা বা সীসাদি দ্বারা রঞ্জিত পত্র অধম বলিয়া কথিত হয়।

পত্র-প্রমাণ

ষড়ঙ্গুল্যধিকং হস্তং পত্রমুত্তমমীরিতম্।
মধ্যমং হস্তমাত্রং স্যাৎ সামান্যং মুষ্টিহস্তকম্॥

অর্থাৎ, এক হস্ত ছয় অঙ্গুলি পত্র উত্তম, এক হস্ত প্রমাণ-পত্র মধ্যম এবং একমুষ্টি প্রমাণপত্র সামান্য পত্র বলিয়া গণ্য হয়।

পত্র-ভাঁজা

পত্রস্তু ত্রিগুণীকৃত্য উর্দ্ধে তু দ্বিগুণং ত্যজেৎ।
শেষভাগে লিখেদ্বর্ণান্ গদ্যপদ্যাদি সংযুতান্॥

অর্থাৎ, পত্র সমান তিন ভাগ করিয়া ভাঁজিতে হইবে। তাহার উপর দিকের দুই ভাগ পরিত্যাগ করিয়া নিম্ন (শেষ) ভাগে গদ্যপদ্যাদি ছন্দে পত্র লিখিবার রীতি।

পত্রলেখন-প্রকার

অঙ্কুশং প্রথমং দদ্যাৎ মঙ্গলার্থং বিচক্ষণঃ।
মধ্যে বিন্দু সমাযুক্তমধঃ সপ্তাঙ্ক-সংযুতম্।
তদধঃ স্বস্তি বিন্যস্য ততো গদ্যং সুশোভনম্॥

অর্থাৎ, পত্রের প্রথমে মঙ্গলার্থ অঙ্কুশ, মধ্যে বিন্দু ও সপ্তাঙ্ক লিখিতে হয়। তন্নিম্নে 'স্বস্তি' শব্দ প্রয়োগ করিয়া কুশল-বার্তা লিখিবার রীতি।

পত্র-রচনার ক্রম

রাজলেখকমাহূয় নৃপো ব্রূয়াৎ প্রযত্নতঃ।
পত্রং কুরু যথাযোগ্যং গদ্যপদ্যাদি-সংযুক্তম্॥
পণ্ডিতদ্বয়মানীয় লেখকো রহসি স্থিতঃ।
যথাযোগ্যানুসারেণ পত্রং কুর্য্যাৎ মনোরমম্॥
দিনদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি বিচার্য্য পণ্ডিতেন বৈ।
স্বভ্রান্তের্দূষণং জ্ঞাত্বা বিলিখেৎ পত্রপুস্তকে॥
সামান্যপত্রে সংলিখ্য রহসি শ্রাবয়েৎ নৃপম্।
নৃপাজ্ঞয়া শুভ্রে পত্রে বিলিখেৎ রাজলেখকঃ॥

অর্থাৎ, রাজা মহাশয় তাঁহার নির্দিষ্ট লেখককে আহ্বান করিয়া পত্র রচনার আদেশ দিলে, পত্রলেখক গদ্য বা পদ্যাদিতে তাঁহার মুসাবিদা করিয়া দুই জন পণ্ডিতের সহিত সমবেত হইয়া, দুই-তিন দিবস সেই বিষয়ে তর্ক করিতেন এবং এইরূপে তর্ক-বিতর্কে যেরূপ সংশোধিত হয়, তাহাই পত্রপুস্তকে লিখিয়া রাজাকে গোপনে শুনানো হইত। পরে রাজাজ্ঞানুসারে শুভপত্র হইলে তাহা যথাস্থানে প্রেরণের রীতি ছিলো।

এ স্থানে একটি কথা ব'লে নিই, বররুচির রাজকীয় পত্র সম্বন্ধে কেবল এই ব্যবস্থা নয়, সেকালে ব্যক্তিগত পত্র উপরি-উক্ত উপায় অবলম্বনে রচনা করতে হতো। এখনও পুত্রেষ্টিক্রিয়া, রাজ্যাভিষেক, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও শ্রাদ্ধাদি কার্যের নিমন্ত্রণপত্র, গুরু, পুরোহিত ও পণ্ডিতগণ রচনা ক'রে থাকেন।

চিঠি লিখলাম আর ডাকে পাঠিয়ে দিলাম, এ সুবিধা বেশি দিনের

নয়, ইংরেজী আমলের। আমাদের দেশে রীতি ছিলো পত্র চিহ্নিত করা। এখন যেমন খামের উপরে প্রেরক এবং প্রাপকের নাম-ধাম ঠিকানা দেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে পুরাকালে তা ছিলো না। পত্রের চিহ্ন দেখে অনুমানে বুঝে নেওয়া যেতো সে চিঠি কে পাঠিয়েছে—কাকে পাঠিয়েছে। এখনও দেখা যায়, আমাদের এই পুরাতন রীতি বিদ্যমান রয়েছে। সরকারী লেফাফা চোখে পড়লে বেশ বোঝা যায় যে সে-চিঠি সরকারী, প্রাপক সরকার সংশ্লিষ্ট কোনো একজন।

বিশেষ চিঠিতে বিশেষ চিহ্ন দেওয়ার প্রথা এখনও আমাদের মানতে হয় কোনো কোনো সময়ে। কেউ একজন আমন্ত্রণ করতে এলেই, প্রথমেই আমাদের লক্ষ্য পড়ে তাঁর হাতে কী রঙের পত্রলিপি রয়েছে। রং লাল হ'লেই যে বুঝতে হবে কোনো সাম্যবাদী প্রচার-পত্র তার কোনো মানে নেই, বরং চিন্তিত হ'তে হবে লাল অক্ষরের লেখায় চিঠির নীচে যে একটি পঙক্তি লিখিত রয়েছে, তার জন্য কী করতে হবে এই দুশ্চিন্তায়।

"লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ বাঞ্ছনীয়" ছাপার অক্ষরে লেখা সত্ত্বেও যখন আপনি ব্রহ্মচারী কিংবা নববধূকে আশীর্বাদ করতে যাবেন তখন হয়তো চোখে পড়বে দ্রষ্টব্যের আশে পাশে কাগজ-কলম নিয়ে লিষ্টি করতে বসেছেন একজন ননদিনী রায়বাঘিনী স্থানীয়া দয়া-মায়া শূন্যা মহিলা। চিত্রগুপ্তের হিসাবে ভুলভ্রান্তি ঘটতে পারে, কিন্তু ঐ মুনাফাভোগী শোষকের কখনও ভুল হবে না, সে ঠিক লিখে নেবে আপনি কি দিলেন আর কে কি দিলেন না। যিনি দিলেন না তিনিও তাঁর পুত্রকন্যার বে-পৈতেয় সে বাড়ি থেকে পাবেন অষ্টরম্ভা। সুতরাং লাল রং দেখলেই কী দিতে হবে সে চিন্তা আজকের দিনে এক অন্যতম প্রধান সমস্যা।

আর কালো রঙের লিপি দেখলে তো বিশেষ শোকের চিহ্ন দেখতে হয়। তখন পত্রবাহক উদ্ধারপ্রার্থী, তাঁকে এই দুঃসময়ে আমাদের সহানুভূতি জানাতে হবে, বিষয়টি যাতে নির্বিঘ্নে সমাধা হ'য়ে যায়

সে-জন্য সবান্ধবে উপস্থিত থাকতে হবে শ্রাদ্ধ-বাসরে। এ-চিঠির শিরোনামায় থাকে মাত্র একটি সকরুণ শব্দ—৺গঙ্গা। কালো অক্ষরে।

বররুচি বলেছেন, পূর্বকালে সম্পর্কভেদে পত্রাদি চিহ্নিত এবং সুবাসিত করবার নীতি ছিলো।

রাজার পত্র—কস্তুরী ও কুম্‌কুম্ দ্বারা ;
রাজমন্ত্রীর পত্র—কুম্‌কুম্ দ্বারা ;
স্বামীর পত্র—সিন্দুর দ্বারা ;
ভার্যার পত্র—আলতা দ্বারা ;
পিতা, পণ্ডিত, গুরু ও সন্ন্যাসীর পত্র—শ্বেতচন্দন দ্বারা ;
ভৃত্যের পত্র—রক্তচন্দন দ্বারা ;
একমাত্র শত্রুর পত্রই রক্ত দ্বারা পদ্ম চিহ্নিত।

বররুচি আর এক বিধান দান করেছিলেন পত্রের মস্তকে যথা যোগ্য প্রশস্তি গাইতে হবে। স্বামীর প্রতি ভার্যার প্রশস্তি, ভার্যার প্রতি ভর্তা, পিতার প্রতি পুত্র এবং পুত্রের প্রতি পিতার পৃথক পৃথক প্রশস্তি দিতে হবে।

এ-বিষয়েও আমরা অত্যন্ত প্রগতিশীল। ইংরেজী কায়দা-কানুনে এতই আমরা দক্ষ যে বহু সময়ে দেখতে পাবেন এমন পত্র, যাতে পুত্র প্রবাসী পিতাকে লিখছেন My dear father.

যে-চিঠিকে আমাদের সভ্যতার প্রথম লিখিত বিকাশরূপে পণ্ডিতগণ ধার্য করেছেন আজও তার প্রয়োজন কথঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি। আজকের দুর্দিনেও প্রিয়তম জনকে ক্ষুদ্রতম একটি কথা জানিয়ে দেওয়ার নিমিত্ত সামান্যতম একখণ্ড চিরকুট যে কতটা সাহায্য করে তা কি আর লিখে প্রকাশ করা যায়? ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা ব'লেও যে-কথা মুখে বলা যায় না চিঠিতে সে-কথা লেখা যায় অতি সহজে। ইনিয়ে-বিনিয়ে কাব্যি ক'রে যত বড়ো ইচ্ছা চিঠি লিখতে পারেন কিংবা এক কথায় সেরে দিতে পারেন—চিঠির মতো মন দেওয়া নেওয়ার এমন মাধ্যম আর কই সৃষ্টি হলো?

জেনানাদের সম্বন্ধে জানি না, তবে এ কথা জানি মানুষের স্বরূপ মূর্তি প্রকাশ পায় তাদের চিঠিতে। ডাঃ জনসন বলছেন "In a man's letter, you know, madam, his soul lies naked." এককথায় নগ্ন সত্য কোথাও যদি থাকে তবে সে একমাত্র মানুষের চিঠিতেই আছে। সত্য জানতে হ'লে নকল নয় আসল চিঠি সর্বদা পাঠ করতে হবে। আর তখন দেখবেন জ্ঞান অর্জনের এমন মধুভাণ্ড আর কোনো বাজারে গিয়ে পাওয়া যাবে না। লর্ড বায়রণ তা না হ'লে ভুলে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে এমন কথা বললেন—"I forgot to say that one of the pleasures of reading old letters is the knowledge that they need no answer."

আমারও সেই এক কথা। এই কারণেই আমার সময়ে অসময়ে আমি সেবন ক'রে থাকি পত্রনির্যাস। আর তাই যদি কখনও বলতে ভুলে যাই, তাই চিঠিপত্র সম্বন্ধে দু-চার কথা ব'লে রাখলাম।

'মাসিক বসুমতী'। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬ ॥

বসন্ত কেবিন

নীলকণ্ঠ

"যদি আরো একটু কম আড্ডা দিতাম তখন, যদি—আরো একটু দূরে হতো বসন্ত কেবিন…"

—বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ দরজায় এসে, শিক্ষার শেষ রাজতোরণের তলা দিয়ে যেতে যেতে,—ঠিক যাবার মুখেই, উপরোক্ত করুণ স্বগতোক্তি শোনা যায় সকলের মুখে। চরম পরীক্ষা যখন এগিয়ে আসে, বিভীষিকার বৈতরণী পার হ'তে সদ্য-কেনা নোট বইয়ের ভারে জ্ঞান-তরণী যখন ভরাডুবির আশঙ্কায় ভারি হয়ে ওঠে, তখনই বসন্ত কেবিনের হাতলভাঙা-কাপে পরিবেশিত অমৃতও এক মুহূর্তে বিস্বাদ লাগতে থাকে। তারপর অবশ্য ভয় আর থাকে না। এমনকি বিভীষিকার বৈতরণী পার হ'য়ে, প্রথম শ্রেণীর সংকীর্ণ জমিতে মুখ থুবড়িয়ে কেউ কেউ গিয়ে পড়েও এবং তখন কলেজ স্কোয়ারের সেই অন্ধকার ছোট্ট ঘরটার বাইরে নর্দমার ধারে ব'সে শেষ-চায়ের কাপ হাতে নিয়ে, বহু-পরিচিত বন্ধুর কাছে বিদায় নেওয়ার চেয়েও মর্মান্তিক দুঃখে মন অভিভূত হয়।

এ দুঃখ আমার একার নয়। কিংবা কারুরই একার নয়। কলেজ স্ট্রীট আর কলুটোলার মোড়ে ওই সাদা থামওয়ালা বাড়িগুলোয় দু বছর ধ'রে কিংবা তারও বেশি যাদের যেতে আসতে হয়েছে, এ দুঃখ তাদের সকলেরই।

বাস্তবিক, ওই ছোট্ট নোংরা অপরিসর অন্ধকার কুটুরিতে পঁয়ত্রিশ-টাকা দামের পাঞ্জাবী-পরা সখের ডিগ্রীলোভী শৌখিন কাপ্তেনের সঙ্গে স্কলারশিপ-সম্বল প্রতিভা বিক্রয়ের ঘৃণ্য ব্যবসায়ে বাধ্য দরিদ্রতম কেরানী-সন্তানের পাশাপাশি জায়গা ক'রে নিতে এতটুকু দেরী হয়নি কোনোদিন। এমন কি পরবর্তী জীবনে প্রথম যৌবনের অদৃষ্টকে হাস্যমুখে অস্বীকার করবার সৌভাগ্য অর্জন করলো যারা তারাও কি

এমন ভাবে ভোগ করতে পারলো তাদের বহু-আকাঙ্ক্ষার, অনাস্বাদিত অবসরের নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার মুহূর্তগুলোকে ?

অর্থের অনটনে সেদিনকার বহু কামনার অকাল মৃত্যু ঘটেছে, সত্যি। কিন্তু শূন্য পকেটের মতো আমাদের মনও কিছু রিক্ত ছিলো না। অর্থের দুর্ভাবনায় প্রপীড়িত বহু দ্বিপ্রহর না-ভেবে-চিন্তে ধার করেছি। অত্যন্ত প্রয়োজনের বহুমূল্য সঞ্চয় ছড়িয়েছি হয়তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো আনন্দের পেছনে! পরবর্তী জীবনে সেই দুর্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে প্রথম যৌবনের এই মেজাজ। হাতে-না-রেখে বিলোবার এই বদ-অভ্যাস, সাংসারিক পরিভাষায় যার নাম অবিবেচনা, তার পুরস্কার আমরা পেতাম হাতে হাতে। কিন্তু সে-দুঃখ একেবারে অবিমিশ্র নয়। সে-দুঃখ সঙ্গে নিয়ে আসতো অব্যক্ত অসহ্য, উত্তেজনায় অস্থির এক আনন্দ। তারপর বিজ্ঞ হয়েছি। সংসারের শক্ত পাথরে মাথা ঠুকে ঠুকে বুঝেছি তার পথ অত্যন্ত সর্পিত। অতি-সাবধানে চলতে অভ্যস্ত আমাদের মন এখন আর হঠাৎ আবির্ভূত, অভাবিত আকাঙ্ক্ষার অতীত সেই মুহূর্তটিকে সহসা পুরোপুরি গ্রহণ ক'রে নিতে প্রস্তুত নয়।

সেদিন বসন্ত কেবিনের সামনে দিয়ে বহুদিন বাদে আসতে আসতে এই সব কথাই মনে হচ্ছিলো। একদিন ছিলো যখন বসন্ত কেবিনে না-আসার কথা ভাবতেই পারতাম না। আবার একদিন এলো যখন বসন্ত কেবিনও তার দরজা আমাদের মুখের ওপরই বন্ধ করে দিলো। না, ভুল বল্লাম, আমরাই তার দরজা থেকে দূরে সরে এলাম। কিন্তু তবু তার ছবি মন থেকে মুছে গেল না। যেমন আমাদের সারা বছরের দিন-পঞ্জীতে সমস্ত মিলিয়ে আমাদের স্মৃতিতে ছুটির দাগগুলোই জ্বল জ্বল করতে থাকে, ঠিক তেমনই গতানুগতিক জীবনযাত্রার মধ্যপথ থেকে যে-সব আনন্দ ও উত্তেজনা হঠাৎ ছুটি নিয়েছে, তারাও আমাদের মনে দাগ রেখে যায়।

বসন্ত কেবিনে যেমন অনেক সময়েই অকারণে যাওয়া হতো তেমনি

সেখানে আমাদের আলোচনার বাঁধাধরা কোনো ধারা ছিলো না। সব-কিছু মিলিয়ে মনে হয় বুঝি ধারাবাহিক কিন্তু আসলে তা নয়। আমাদের আড্ডালোকে তর্কের যে অশ্রান্ত ঝড় বইতো, তার যে অনর্গল প্রস্রবণ নিত্যবহমান ছিলো, তা মন দিয়ে শ্রবণ করলে ধরা শক্ত হতো না যে এর শেষের সঙ্গে সুরুর মিল নেই। বহু তথ্যপূর্ণ গম্ভীর আলোচনা হয়তো অতর্কিতে কোনো টুকরো কথায় ঘুরে গেছে কোনো রসে ভরপুর রঙিন হৃদয়ের কূল-না-মানা সমস্ত ভাবনা ভাসিয়ে-দেওয়া উদ্বেল জোয়ারে? হয়তো উড়ে গেছে কোনো চিন্তাশূন্য নীল নীলিমায়!

অমিত রায় লাবণ্যকে বলেছিলো: 'মানুষের জীবনটাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে তা আকস্মিকের মালা-গাঁথা।' আমাদের আড্ডার সেই ক্ষণস্থায়ী জীবনে এমনি সব-কিছুই ছিলো আকস্মিক। জীবন-জিজ্ঞাসার দার্শনিক গভীরত্ব থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং নীতিবিগর্হিত কোনো আলোচনাই বাদ যেতো না। তখন আমাদের প্রথম ভালো-লাগার বয়স। যে কোনো মেয়েকে যখনই দেখেছি তখনই তাকে মনে হয়েছে মনোরম। মনে হওয়ার অবশ্য আর কোনো কারণ ছিলো না এক মনের রোগ ছাড়া। কারণ এম-এ-পড়তে-আসা সেই সব মেয়েদের মধ্যে বাস্তবিক সুন্দরী ছিলো খুব কম। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের দু বছর সুন্দর-ই ছিলো না কেউ। শুধু এম-এ-পড়া মেয়ে নয়, পরে বুঝেছি, পৃথিবীর খুব কম রমণীই সত্যিকারের রমণীয়।

কিন্তু তখন কোনো কুশ্রী মেয়েও যদি একটু হেসে চোখ নামাতো, কিংবা নোট-নেওয়ার ছল ক'রে আঙুল ঠেকে যেতো দৈবাৎ, তখন মনে হতো,—কিংবা মনে হওয়ার মতো অবস্থাই হয়তো মনের থাকতো না। সেই ছল থেকে যার সুরু, তা যে-নিতান্তই ছলনায় সারা হবে,—একথা যে একেবারে বুঝতাম না, এমন নয়, কিন্তু নাগালের বাইরের আঙুরের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করবার জন্যে কথামালা রচনা করাই সোজা, তাকে উপেক্ষা করা শক্ত কাজ। প্রত্যেক মেয়ের মধ্যেই আমরা আমাদের

মানসীকে আবিষ্কার করতাম। দুঃখের বিষয় প্রত্যেক মেয়ের সঙ্গেই আমাদের কিছু যোগাযোগ ঘটতো না, যদি কারুর সঙ্গে কখনো ঘটে যেতো, তবে তাকেই যোগ-বিয়োগ ক'রে নিয়ে, তাকেই আমাদের মানসীকে-উদ্দেশ্য-করা কাব্য-শ্লোক যা কিছু, এবং সঙ্গে বিরহের শোক-কাব্যও না শুনিয়ে ছাড়তাম না। তবে ওই কবিতা পর্যন্তই! মানসীকে পাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতো না—উঠলেও ব্যর্থ-প্রয়াসে শেষ হতো। জীবনে এমনই হয়। যাকে পাওয়ার কথা নয়, তাকে পেয়েই,—যাকে পাওয়ার কথা, তাকে না-পাওয়ার দুঃখ ভুলি।

কিন্তু শুধু মেয়ে নয়, মেয়ে বাদ দিয়েও আমাদের উদ্বৃত্ত সময় কাটতো রাজনীতি চর্চা ক'রে। এমনকি কোনো কোনো দল তো অন্ততঃ প্রকাশ্যে মেয়ের ওপরই রাজনীতির আলোচনাকে স্থান দিতো, মেয়ের চেয়ে রাজনীতিতেই মত্ত হতো বেশী। তখন রাজনীতির উন্মত্ত হাওয়া ছাত্রসমাজে পুরোপুরি বইতে আরম্ভ করেছে। সে-আলোচনায় বাদ যেতো না কেউ। মেয়েরাও নয়। ইকনমিক্সের সাধারণ জ্ঞানে যে-সব মেয়ে পাশ-মার্কসও পায়নি, তারাও কার্ল মার্কস বলতে বিহ্বল হতো। সে-সব আলোচনা সুরু হতো অত্যন্ত শান্ত, ভদ্র, নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে; নিছক জ্ঞানার্জনের স্পৃহা থেকেই যার জন্ম। মুখ দেখে তাদের এর বেশি আর কিছু বোঝা যেতো না। একটু বাদেই এ মুখোস যেতো খুলে। ভদ্রতার সীমা অতিক্রম ক'রে এমন সব কথা তারস্বরে উচ্চারিত হ'তে থাকতো, যা অশিক্ষিত, অভদ্র, অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও প্রকাশ্যে প্রচলিত ছিলো খুব কম। মতান্তর গিয়ে গড়াতো মনান্তরে। সে-সব বন্ধু-বিচ্ছেদ এত হাস্যকর, এতই অযৌক্তিক ছিলো, যে পরে তা মনে ক'রে নিজেরাই লজ্জিত হয়েছি। সে লজ্জা আবার ঝগড়ার মতোই ক্ষণস্থায়ী। হয়তো তার একটু পরেই বসন্ত কেবিনে আমাদের কলরব কখন কলহে গিয়ে পৌঁছেচে।

কিন্তু কেন এমন হয়? এর কারণ আর কিছুই নয়। যখন যৌবনের বন্যায় আমাদের সত্তার দুকূল সহসা প্লাবিত হয় তখন আমাদের উদ্বৃত্ত

জীবনীশক্তি তার প্রকাশের পথ খোঁজে। সেই প্রকাশের প্রয়াসই কাউকে কবি করে, কাউকে শিল্পী, কাউকে টেনে নিয়ে যায় রাজনীতির রক্ষতায়। আবার তা প্রকাশ-অসাফল্যে চরম অচরিতার্থতায় কাউকে বিপথে আকর্ষণ করে। এই সব আলোচনা সেই সৃজনী প্রতিভার প্রথম স্ফুরণের পরিচয়ে দীপ্তিমান। উত্তরকালে যারা দেশকে নতুন-ভাবে গড়বার স্পর্ধা রাখে, তাদের সৃষ্টির প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয় এইখানে।

বসন্ত কেবিনে চা খেতে খেতে তখন একটা কথা আমাদের প্রায়ই মনে হতো। মনে হতো বসন্ত কেবিন যদি আরো একটু বড় হতো, কিংবা আসতে পেতো সেখানে আরো একটু আলো। এই সব চিন্তা ও সমস্যার কোনো সমাধান তখন পাইনি। আজ মনে হয় বসন্ত কেবিন যা হয়েছে তার চেয়ে ভালো হ'তে পারতো না। হয়তো আর একটু বড়ো হ'লে কি আর একটু কম অন্ধকার হ'লে ব্যবসার দিক থেকে মন্দ না হ'লেও আমাদের আড্ডা তেমন জমতো না। কেন জমতো না, সে-কথা আজ চৌরঙ্গীর শৌখিন রেস্তোরাঁয় ব'সে এখন বেশ বুঝতে পারি। এখানে একটু দূরে কোনো বন্ধুকে হঠাৎ দেখলেও জোরে ডাকা যায় না। চা-খেতে জোরে চুমুক দেওয়া বারণ, তাতে পাশের লোক অসভ্য ভাবতে পারে। দম বন্ধ ক'রে অত্যন্ত মনোযোগী হ'য়ে ছুরিকাঁটা সামলাতে ভাবতে হয় কত টিপ্‌স দিলে ভদ্রতা রক্ষা হবে! বসন্ত কেবিনে এ-আরাম ছিলো না, কিন্তু স্বস্তি ছিলো। কারণ সেখানে যে-বসন্ত বইতো তা ছিলো সহজ অন্তর্লোক থেকে স্বতঃ-উৎসারিত! বসন্ত কেবিনে এমন অনেককেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে দেখেছি যাদের বাড়িতে ওই পরিবেশে তাদের ছেলের চা খাওয়ার কথা ছিলো কল্পনারও বাইরে। কী করে তারা কাটাতো? হয়তো অতি-ভদ্রতার মুখোস-আঁটা কয়েদী-জীবন থেকে হঠাৎ-ছুটির সম্পূর্ণ সুখটুকু তারা বসন্ত কেবিনেই সম্পূর্ণ বেপরোয়াভাবে ভোগ করতে ভালোবাসতো।

বসন্ত কেবিন বড়ো হ'লে, আরো বড়ো হ'লে ওখান থেকে উঠে

এসে চৌরঙ্গী কি ড্যালহাউসী স্কোয়ারে ব্যবসা ফেঁদে বসলে যেমন লাভ হবে, তেমনি লোকসানও কম হবে না। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, বসন্ত কেবিনের দৈনন্দিন অতিথিরা, যদি চৌরঙ্গীর বসন্ত কেবিনে খেতে আসতো, তাহলেও ঠিক সে-স্বাদ থেকে বঞ্চিত না হ'য়ে পারতো না। তাই ভাবি ওই সব ছাত্ররা যারা ভবিষ্যতের খ্যাতিমান নাগরিক, তাদের সেই উন্নতি ও অগ্রগতির দিনের জন্যে ফিরপো আর গ্র্যাণ্ড তো আছেই, তাদের অখ্যাত, অবজ্ঞাত প্রথম যৌবনের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলির জন্যে থাক না একটুখানি কিন্তু অনেক বড়ো—বসন্ত কেবিন!

একথা ঠিকই যে বসন্ত কেবিন কিছু চিরকাল ছিলো না কিংবা অনন্তকাল থাকবেও না। আমরা যতই চিন্তিত হই না কেন এর জন্মের আগেও যেমন এর মৃত্যুর পরেও তেমনই দিন কাটবে। এখনই তো আমাদের মন কফি-গন্ধে উতলা হয়েছে। কফি-হাউসে আবার উচ্চ নীচ শ্রেণীর ভেদ-প্রাচীর খাড়া করা হয়েছে। তার ব্যালকনিতে ব'সে রুগ্ন, কুব্জ, কুশ্রী কোনো মেয়ের সঙ্গে আইসক্রীম-কফি খাওয়ার সৌভাগ্য-গর্বিত জনৈক কেউ যখন ব্যালকনি থেকে কৃপাকটাক্ষে দোতলার অভ্যাগতদের সাদর সম্ভাষণ জানান, তখন নীচের অধিবাসীদের জমে-ওঠা আড্ডার তাল হঠাৎ কেটে যায়। ওদের অনেকেই আগে একান্ত-ভাবেই ছিলো বসন্ত কেবিনের। কিন্তু আগেকার সেই উদ্বেলতা আর নেই। সেই অপ্রতিরোধ্য বাক-বন্যা আজ কোথায়? তার বদলে মিহিকণ্ঠে মেয়েলি আলাপ ন্যক্কারজনক। যেন মনে হয়, আদিম হিংস্রতার বুনো গন্ধ গা থেকে মুছে ফেলে লোহার গরাদের আড়ালে পোষমানা বাঘের মতো আজ যেন ওরা থাবা গুটিয়ে বসেছে।

তা হোক। তবু বহুকাল পেছনে-ফেলে-আসা বসন্ত কেবিনের সেই দুর্দমনীয় স্রোত যেন আজও টানছে। একবার, আরেকবার ফিরে যাওয়া যায় না সেই ভাবনা-চিন্তা ভাসিয়ে-দেওয়া প্রথম যৌবনের কলরব-মুখরিত অন্ধকার কোণটিতে?

শুধু একবার। একটি মুহূর্তমাত্র। একটি মুহূর্ত—কিন্তু অনেক। অনন্ত।

ব্রাউনিংএর সেই :

'Out of all your life
Give me but a little moment.'

'অলকা'। আশ্বিন ১৩৫৩॥

লেখক-পরিচিতি

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬—১৮৯৯)

প্রথিতযশা সাহিত্যিক না হলেও গত শতকের অন্যতম বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক হিসাবে রাজনারায়ণের স্থান সেকালের গদ্যলেখকদের পুরোভাগে,—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রচনার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হলেও প্রাঞ্জলতা ও সরসতার গুণে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান স্মর্তব্য। প্রসঙ্গত বলা যায় বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের তিনিই অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর প্রশংসা বালক রবীন্দ্রনাথকেও কাব্যচর্চায় উৎসাহিত করেছিলো।

২৪ পরগণার বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণ বসুর জন্ম হয়।

গ্রন্থাবলী : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮), সেকাল আর একাল, বিবিধ প্রবন্ধ, An old Hindu's hopes, তাম্বূলোপহার ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বিষয়বস্তু ও শিল্পকলার অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখা যায়। ভাষায় সাধু ও চলতি রীতির সমন্বয় সাধন ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা গদ্য রচনার ভঙ্গীকে যথেষ্ট শক্তিশালী ক'রে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি, সাহিত্যের বহু ব্যাপারের প্রথম পথিপ্রদর্শক এবং নব্য বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা। যে গুণে তা সম্ভব হয়েছিলো তাহলো : শিল্পী হিসাবে তিনি যত বড়ো ছিলেন, পুরুষ হিসেবে ছিলেন তার চেয়েও অনেক বড়ো। তাঁর গ্রন্থাবলী পাঠ ক'রে এটাই মনে হয়—Ecce Homo! Behold the man! The first and last word in literature as in life is character. এই character আমাদের সাহিত্যে এত বড়ো আর কারুর ছিলো না।

গ্রন্থাবলী : দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, বিজ্ঞান রহস্য, সাম্য, কৃষ্ণচরিত্র, বিবিধ প্রবন্ধ, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি।

হুতোম প্যাঁচা (১৮৪০—১৮৭০)

'হুতোম প্যাঁচা' বা কালীপ্রসন্ন সিংহ সে কালের একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ। মাত্র ত্রিশ বছরের এই স্বল্পপরিসর জীবনের ভেতর তিনি সাহিত্য, সমাজ ও দেশহিতকর বহু কাজ ক'রে গেছেন। ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে মাত্র তের বছর বয়েসে ইনি বঙ্গভাষার অনুশীলনের জন্য বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সভার পক্ষ থেকে বাংলা কাব্য রচনার জন্য শ্রীমধুসূদনকে এবং নীলদর্পণের অনুবাদ'প্রকাশ করবার জন্যে লঙ্ সাহেবকে সংবর্ধনা করা হয়। সভার মুখ-পত্র বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা ছাড়া আরও কয়েকটি পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছিলেন।

হুতোমের ভাষা কলকাতার কথ্যভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত; আলালের ঘরের দুলালের ভাষার মতোন সঙ্কর ভাষা নয়। নক্‌শা ছাড়া তিনি তিন চার খানা নাটকও রচনা করেছিলেন। কালীপ্রসন্নের আরেক অক্ষয় কীর্তি অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারতের গদ্য অনুবাদ।

চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪—১৯১১)

সেকালে ব্রাহ্মনেতাদের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে 'বঙ্গদর্শনে' একসময় তিনি প্রায়ই প্রবন্ধ লিখতেন এবং সেই আলোকে সমাজতত্ত্ববিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধও তিনি লিখে-ছিলেন। সাহিত্যিক রচনাতেই তাঁর যা কিছু যোগ্যতা ছিলো, এদিক দিয়ে তাঁর কয়েকটি রচনা রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় সূচনা করে। বঙ্গদর্শন ছাড়াও সেকালে প্রচারিত 'সাহিত্য', 'প্রচার' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলির একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। চন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ভেতরে অনেক সময় মতামতের আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। এইজন্যে চন্দ্রনাথ সেকালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী না হলেও প্রতিপক্ষ সাহিত্যিক বলে সাহিত্যিক সমাজে একটা কথা চলিত আছে। সমালোচক চন্দ্রনাথ কবিধর্মী ও রসিক ছিলেন।

গ্রন্থাবলী: পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, ত্রিধারা, ফুল ও ফল, শকুন্তলাতত্ত্ব, সাবিত্রীতত্ত্ব ইত্যাদি।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৪—১৯১০)

উনিশ শতকের প্রবন্ধসাহিত্য যাঁদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়েছিলো, কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁদের অন্যতম। চিন্তামূলক গুরুগম্ভীর নিবন্ধ-রচনার মধ্যেই তাঁর সাহিত্যকৃতি সীমাবদ্ধ ছিলো না। উৎকৃষ্ট লঘু রচনাতেও তিনি ছিলেন পারঙ্গম। তাঁর 'প্রমোদলহরী' ও 'ভ্রান্তিবিনোদ' সরস রচনা হিসাবে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিলো। বিদ্যাসাগরী রচনারীতির ধারক এবং বাহক হিসাবে তাঁর পরিচয় প্রধান হলেও লঘুরচনার ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য যে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি তা অনস্বীকার্য। কালীপ্রসন্নের আরো একটি প্রধান পরিচয় তিনি সেকালের বহুলপ্রচারিত 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন।

গ্রন্থাবলী : নিভৃতচিন্তা, নিশীথচিন্তা, প্রভাতচিন্তা, ভ্রান্তিবিনোদ ইত্যাদি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬—১৯১৭)

বঙ্গদর্শন প্রচারকালে বঙ্কিমচন্দ্র যাঁদের সহকর্মী নির্বাচিত করেছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁদের অন্যতম। অক্ষয়চন্দ্র 'সাধারণী' ও 'নবজীবনে' প্রায়ই প্রবন্ধ লিখতেন। অক্ষয়চন্দ্রের রচনা বঙ্কিম কমলাকান্তরূপে আপনার 'দপ্তরে'ও বেঁধে নিয়েছিলেন। চার বছর ওকালতি করার পর ওকালতি ছেড়ে সাহিত্যকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। সাহিত্যসেবার দীক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন বাবার কাছে। বঙ্কিমমণ্ডলের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অক্ষয়চন্দ্রের রচনারীতি অনিন্দ্য-সুন্দর। দেশীয় ভাষা কখনো ত্যাগ না ক'রে সংস্কৃত শব্দের পাশে তাকে স্থান দিতেন এবং তার প্রয়োগফলে রচনার সরসতা ও শক্তি যেতো বেড়ে। সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত সুপণ্ডিত সরকার মহাশয়ের ক্ষুদ্র রচনাগুলিও লেখার কৌশলে মনোজ্ঞ, সরস ও সুন্দর।

গ্রন্থাবলী : প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ, সমাজ-সমালোচন, সনাতনী, কবি হেমচন্দ্র, মোতিকুমারী ইত্যাদি।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯—১৯১১)

বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলেছিলেন : যে 'ইন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের-আকাশের Halley's Comet, যখন ফুটিয়া উঠে, তখন উহার প্রভায় দশ দিক আলোকিত হইয়া উঠে। পরন্তু সবাই উহাকে দেখিলে ভয় পায়। কে জানে, কাহার কোন অন্ধকার কোণটি উহার পুচ্ছের আলোকে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, আর দেশশুদ্ধ লোকে তাহা দেখিয়া হাসিবে ও হাত-তালি দিবে।' ইন্দ্রনাথের প্রতিভা সমাজতত্ত্ব-ব্যাখ্যানে ও হিন্দুত্ব-প্রতিষ্ঠা-চেষ্টায় সম্যক পরিস্ফুট হয়েছিলো। ইন্দ্রনাথ বলতেন : 'ভাষার tone ও instinct অর্থাৎ ধাতু ও প্রকৃতি ঠিক বজায় না থাকলে সে ভাষা টেঁকে না। আমাদের বাঙলা পদ্যগদ্য অনুচিকীর্ষার বনিয়াদের ওপর বিন্যস্ত, খোসখেয়ালের অত্যাচারে সদাপীড়িত, এর বাঁধন-ছাঁদন নেই।' ইন্দ্রনাথের ধারণা ছিলো, লেখক পাকা হিন্দু হতে পারলে তবে তার লেখায় ও ভাষায় হিন্দুত্ব ফুটে বেরুবে। যে ভাষায় ধর্ম নেই, প্রয়োগ-সংযম নেই, তা এদেশে বিকাবে না—টিকবে না।

গ্রন্থাবলী : কল্পতরু, ভারত-উদ্ধার, জাতিভেদ, ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী ইত্যাদি।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১—১৯০৩)

বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট সমালোচক ও প্রবন্ধলেখক হিসাবে একদা যাঁরা খ্যাতিমান হয়েছিলেন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রঙ্গ-রসিকতা ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং চুটকি বোলচালে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। ভাষাশিল্পী হিসাবে ঠাকুরদাস বিশেষ সার্থক ছিলেন না, কারণ ভাষার অসমতা অর্থাৎ একই কালে চলিত ও সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহারে তাঁর অধিকাংশ রচনাই দোষদুষ্ট ছিলো। তবে তাঁর ভাষার একটা নিজস্বতা ছিলো, 'আলালী' ও 'সাগরী' ভাষার মতো তাঁর ভাষারও একটা স্বাতন্ত্র্য ছিলো, যে-কারণে সেকালে অনেকে তাঁর ভাষাকে 'ঠাকুরদাসী' ভাষা বলে চিহ্নিত করতে চাইতেন। তাঁর রচনা ও ভাষায় একদিকে সেকালের কেতাবতী ভাব ও প্রাচীন ছাঁদ এবং অন্যদিকে নব্যভাব ও ইংরাজীর ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

গ্রন্থাবলী : সহরচিত্র, সাহিত্যমঙ্গল, দুর্গোৎসব ইত্যাদি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩—১৯৩১)

জাত-ঐতিহাসিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর যে সহজাত সাহিত্যবোধও ছিলো, বৌদ্ধযুগ সম্পর্কিত তাঁর গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী তার প্রোজ্জ্বল প্রমাণ। অতি দুরূহ কঠিন বিষয়েও তিনি সরল প্রবন্ধ লিখতে পারতেন। যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লিখে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রাচীন লিপি ও শিলালেখ সম্বন্ধে তাঁর ব্যুৎপত্তির পরিচয় Epigraphia Indica প্রভৃতি পত্রিকায় পাওয়া যায়। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বহু প্রাচীন মূল্যবান পুঁথি আবিষ্কার ও প্রকাশ ক'রে উভয় প্রতিষ্ঠানকেই গৌরবমণ্ডিত ক'রে গেছেন। প্রসিদ্ধ 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' তাঁরই আবিষ্কার। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা তের, প্রবন্ধের সংখ্যা তিনশ, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সুপরিচিত বই ও প্রবন্ধসমূহের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের বেশি।

গ্রন্থাবলী : ভারত মহিলা, বাল্মিকীর জয়, মেঘদূত ব্যাখ্যা, কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, প্রাচীন বাংলার গৌরব, বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)

আধুনিক যুগের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিমাপ করতে যাওয়া

শুধু সাধ্যাতীত নয়, বর্তমান পটভূমিকায় অপ্রাসঙ্গিকও বটে। তাঁর কবিকৃতি, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প এবং অন্যতর শিল্পসিদ্ধি বাদ দিয়েও বাংলার প্রবন্ধসাহিত্যে তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব এক বিরাট বিস্ময়। প্রসঙ্গক্রমে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধারণযোগ্য : 'আমরা একথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, যদি রবীন্দ্রনাথ কবিতা নাও লিখতেন, তাহলেও তিনি নিছক প্রবন্ধ সাহিত্যে যে অতুলনীয় দান রেখে গেছেন, তাতেই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্বদেশ, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। অপূর্ব মননশীলতা ও কবিদৃষ্টির সমন্বয়ে তাঁর প্রবন্ধাবলী রসমধুর হয়েছে। প্রবন্ধ রচনায় রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিলো : সত্যের আবিষ্কার নয়, সত্যের ইঙ্গিত দেওয়া ; সত্যের প্রতিষ্ঠা নয়, সত্যের আনন্দ সঞ্চার করা। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই এই ভঙ্গিটির প্রবর্তক। আধুনিক সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য, লোক সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' এক নবতর সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ যেন কাব্যেরই সহোদর; কবি-আত্মারই প্রতিধ্বনি সদৃশ।'

শরৎকুমারী দেবী চৌধুরানী (১৮৬১—১৯২০)

শরৎকুমারী আত্মগোপনকামী যশোলাভে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নির্লোভ লেখিকা। সেকালের সাময়িক পত্রিকাগুলিতে তিনি লিখতেন, কিন্তু নাম প্রকাশ করতেন না, ফলে বাংলা সাহিত্যের পাঠক পাঠিকার কাছে তিনি অপরিচিতাই থেকে গেছেন। তাঁর লেখা 'শুভবিবাহ' নামে সামাজিক চিত্রটি বাংলা সাহিত্যের সম্পদরূপে গণ্য, রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক সাহিত্যে' এর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর 'শাশুড়ী-বৌ' 'একালের মেয়ে', 'হিন্দু বালিকাগণের শিক্ষা', 'মেয়ে-যজ্ঞি', 'লক্ষ্মীর শ্রী', 'নারীশিক্ষা ও মহিলা শিল্পাশ্রম', 'শিশুশিক্ষার মূলমন্ত্র' প্রভৃতি লেখাগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ ও লেখিকার শিক্ষিত নারীমনের অপূর্ব অভিব্যক্তিতে সমুজ্জ্বল।

গ্রন্থাবলী : শুভবিবাহ, শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮—১৯৪৬)

আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচাবার কাজে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর দান সামান্য নয়। বাংলা ভাষাকে তিনি এক নতুন প্রাণবন্ত চলতি রূপ দিয়েছেন

কথ্য ভাষার লেখ্যরূপে। সেই ভাষাতেই তাঁর রচনাবলী, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা, রেখাচিত্র সব যেন জীবন্ত হয়ে, সরস হয়ে ফুটে উঠতো। তাঁর এই বিশেষ বাচনভঙ্গী তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম 'বীরবল' নামের জন্যে 'বীরবলী রীতি বা ঢঙ' নামে পরিচিত। বিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকা 'সবুজপত্র' প্রকাশ ক'রে তিনি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনেন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

গ্রন্থাবলী : বীরবলের হালখাতা, নানাকথা, পদচারণা, চারইয়ারী কথা, সনেট পঞ্চাশৎ, আহুতি প্রভৃতি।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮—১৯২৯)

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক স্বর্গীয় ললিতকুমার বাংলা দেশে একজন হাস্য রসিক ও সুলেখক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। হাস্যরসাত্মক রচনায় তাঁর যে অদ্ভুত দক্ষতা ছিল তা সকলেই স্বীকার করেন। কথকতার চালে তাঁর অধিকাংশ লঘু নিবন্ধ লিখিত। নির্মল শুভ্র হাস্যরস তাঁর অধিকাংশ লেখার প্রাণবস্তু। শিশু-সাহিত্য রচনাতেও তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিলো।

গ্রন্থাবলী : ফোয়ারা, পাগলাঝোরা, ব্যাকরণ-বিভীষিকা, বানান-সমস্যা ইত্যাদি।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০—১৮৯৯)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রদের ভেতর প্রবন্ধকার হিসেবে বলেন্দ্রনাথের নাম চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বলেন্দ্রনাথের দান চিরস্মরণীয়। নিরাভরণ অথচ কবিত্বমণ্ডিত সহজ এবং স্বাভাবিক রচনারীতির গুণে বলেন্দ্র নাথের প্রবন্ধাবলী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেও বলেন্দ্রনাথের নাম বিশেষ স্মর্তব্য। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে অকালমৃত্যু না ঘটলে বলেন্দ্রনাথের লেখনীদ্বারা বাংলা সাহিত্যের যে আরও ঐশ্বর্যবৃদ্ধি হতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গ্রন্থাবলী : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১—১৯৫১)

'সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের আসন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের নীচে নয়, আর বঙ্কিম-

চন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বর্তী যুগের লেখকদের অধিকাংশের ওপরে।...অবনীন্দ্র-নাথের সব কথাই রূপকথা।...তাঁর সমস্ত রচনা যেন একখানা সুদীর্ঘ মসলিনের থান; ক্রমে ক্রমে অকুণ্ডলীকৃত হয়ে খুলে চলেছে। প্রথম দিকে তার সুতোগুলি মোটা, বুনানি তেমন জমাট নয়; কিন্তু আস্তে আস্তে তা সূক্ষ্মতর ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। আবার এই শাদা জমিনের উপর নানা রঙের ছাপ আছে।' চিত্রশিল্পী হিসাবে তিনি পৃথিবীবিখ্যাত, কথাশিল্পী হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব অতুলনীয়। বাংলায় কলাবিদ্যার পুনরভ্যুত্থানের নায়ক এবং ভারতীয় শিল্পের আধুনিক ধারার পুরোধা শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার সি. আই. ই খেতাবে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট্ উপাধিতে ভূষিত করে সম্মান প্রদর্শন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবনীন্দ্রনাথ 'বাগেশ্বরী অধ্যাপকের' পদে (১৯২১—১৯২৯) বৃত হয়ে উনত্রিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

গ্রন্থাবলী: শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী, ভূতপত্রীর দেশ, নালক, পথে-বিপথে, বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী, ভারতশিল্পে মূর্তি ইত্যাদি।

শশিশেখর বসু (১৮৭৪—১৯৫৫)

শশিশেখর যেমন রসালো গল্প লেখায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, লোকটিও তেমনি সুরসিক ছিলেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলায় যে ধরণের রস-রচনা লিখতেন আমাদের দেশে তার জুড়ি মেলা ভার।

বাংলার যশস্বী সাহিত্যিক রাজশেখর (পরশুরাম) এবং মনস্তত্ত্ববিদ গিরীন্দ্রশেখর বসুর তিনি অগ্রজ ছিলেন। দীর্ঘজীবনে তিনি প্রধানত ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করেছেন। পায়ওনিয়ার, স্টেট্স্ম্যান, বম্বে ক্রনিকল, বেঙ্গলী, ইন্দুপ্রকাশ, ইংলিশম্যান, ডেলি নিউজ, ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি পত্রিকায় এস. এস. বসু এই নামে নানা বিষয়ে বহু হাস্যরসাত্মক গল্প-প্রবন্ধ লিখে গেছেন।

গ্রন্থ: যা দেখেছি যা পেয়েছি।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৯—১৯৫০)

শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উল্লাসকর প্রভৃতির সহকর্মী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানতঃ অগ্নিযুগের বিপ্লবী বলে পরিচিত হলেও লেখক হিসাবে উল্লেখযোগ্য। সাংবাদিকতার মাধ্যমে উপেন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। উপেন্দ্রনাথের রচনা সরস ও সহজ। ঘরোয়া ভাষায় তিনি সাহিত্য রচনা

করতেন, তাঁর 'নির্বাসিতের আত্মকথা' বাংলাসাহিত্যের একটি স্মরণীয় আত্ম-জীবনী। বারো বছর আন্দামানে কারাদণ্ড-ভোগের পর উপেন্দ্রনাথ প্রথমে দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রিকায় সাংবাদিকতা আরম্ভ করেন এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে 'বিজলী' পত্রিকা বের করেন ও পরে বিখ্যাত 'আত্মশক্তি' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ফরওয়ার্ড, লিবার্টি, অমৃতবাজার পত্রিকা, দৈনিক বসুমতী প্রভৃতি বহু পত্রিকার সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

গ্রন্থাবলী : নির্বাসিতের আত্মকথা, ঊনপঞ্চাশী, পথের সন্ধান, ইত্যাদি।

রাজশেখর বসু (১৮৮০)

রবীন্দ্রনাথ রাজশেখর বসুর পরশুরাম নামের প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে, লেখক বুঝি জখম করিবার কাজেই প্রবৃত্ত। কথাটা একেবারেই সত্য নহে।···মূর্তিকারের ঘরে ঢুকিলে পাথর ভাঙার আওয়াজ শুনিয়া যদি মনে করি ভাঙাচোরাই তার কাজ, তবে সে ধারণাটা ছেলেমানুষের মতো হয়,—ঠিকভাবে দেখিলে বুঝা যায়, গড়িয়া তোলাই তাহার ব্যবসা।'

গ্রন্থ : চলন্তিকা, লঘুগুরু, গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, কৃষ্ণকলি, মেঘদূত, রামায়ণ ইত্যাদি। সম্প্রতি 'কৃষ্ণকলি' বইটির জন্য ইনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৫)

শ্রুতকীর্তি আইনজ্ঞ হিসাবে পরিচিত হলেও বাংলা সাহিত্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত অনন্যপুরুষ। স্বীয় লেখনীদ্বারা আধুনিক যুগের বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যকে তিনি ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সমস্তরে তুলেছেন। অতুলবাবু প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সম্পাদিত সবুজপত্রে নিয়মিতভাবে সাহিত্য-সমালোচনা লেখা স্বরু করেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র, আধুনিক বাংলা ও ইরোরোপীয় সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' একখানি অমূল্য অবদান। অতুলবাবুর রচনাশৈলী 'বীরবলী' গদ্যরীতির অনুসারী, প্রসাদগুণ ও গাঢ়বন্ধতায় বিশিষ্ট।

গ্রন্থাবলী : কাব্যজিজ্ঞাসা, নদীপথে ইত্যাদি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪)

বাংলার সুধী-সমাজে সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ ও কলারসিক হিসেবে ধূর্জটি বাবুর একাধিক পরিচয়। ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত 'সবুজ পত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে, পরে 'পরিচয়' গোষ্ঠীতে তিনি যোগদান করেন এবং ঐ পত্রিকাতেই তাঁর বেশিরভাগ লেখা প্রকাশিত হয়। বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর উপন্যাস 'ত্রয়ী' এক সময় বাঙলা উপন্যাসের একটা নতুন পথ খুলে দেয়। তবে প্রবন্ধকার হিসেবেই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁর বাচন-ভঙ্গী ও তথ্য পরিবেশন সেই লেখকের পক্ষেই সম্ভব যাঁর অধীত বিদ্যা ও মানসিক অভিজ্ঞতা গ্রহিষ্ণু ব্যক্তিত্বের মর্মে প্রবেশ করেছে। লঘু নিবন্ধতেও তাঁর পাকা হাত, যেহেতু রসজ্ঞান ও কথকতা, এ দুটি জিনিসই তাঁর প্রচুর পরিমাণে আছে। বর্তমানে তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের অধ্যক্ষ-পদে রয়েছেন।

গ্রন্থাবলী : আমরা ও তাঁহারা, চিন্তয়সি, অন্তঃশীলা, আবর্ত ও মোহনা, রিয়ালিস্ট, কথা ও সুর, সুর ও সঙ্গতি ইত্যাদি।

জ্যোতির্ময় ঘোষ (১৮৯৬)

বাঙালী পাঠকসমাজ ও কথাসাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত জ্যোতির্ময় ঘোষ নিজ নামে এবং 'ভাস্কর' ছদ্মনামে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি বহুদিন থেকে লিখে আসছেন। তিনি ভাবুক ও চিন্তাশীল। তাঁর চারিদিকে যে প্রবহমান জীবন বিদ্যমান তার সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ও অনুকম্পা অসীম। তাঁর লেখা গল্পগুলি আলফাঁস দোদের লিপিচাতুর্য স্মরণ করিয়ে দেয়। Humour এবং Wit উভয়ের সাহায্যেই গল্প রচনা করে তিনি যশস্বী হয়েছেন।

ছাত্র হিসাবেও জ্যোতির্ময় ঘোষ কৃতিত্বসম্পন্ন; এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এচ-ডি। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষপদ তিনি অলংকৃত করেছিলেন।

গ্রন্থাবলী : লেখা, শুভশ্রী, ভাস্করের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প, রুল অব থ্রি, পূর্ণিমা, শিক্ষার কথা, গণিতের ভিত্তি ইত্যাদি।

পরিমল গোস্বামী (১৮৯৯)

পরিমল গোস্বামী গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ-লেখক হলেও কিছু কিছু লঘুনিবন্ধ

লিখেছেন। তাঁর রচনা যেমন তথ্যবহুল, তেমনি সরস ও হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু পরিমলবাবুর সর্বপ্রধান পরিচয় ব্যঙ্গগল্প রচনায়, তাঁর মতো ব্যঙ্গগল্প-লিখিয়ে রীতিমতো দুর্লভ।

জন্ম ফরিদপুরে। অল্প বয়স থেকে সাহিত্য চর্চা সুরু করেন। 'শনিবারের চিঠি' এবং 'অলকা' সম্পাদনা করেছিলেন। বর্তমানে যুগান্তরের রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক। পিকটোরিয়াল ফটোগ্রাফিতে বিশেষ কৃতী।

গ্রন্থাবলী : ট্রামের সেই লোকটি, ডিটেকটিভ শিবনাথ, পরিমল গোস্বামীর ব্যঙ্গগল্প, ঘুঘু, ম্যাজিক লণ্ঠন, পথে পথে, আষাঢ়ের দেশ, ক্যামেরার ছবি ইত্যাদি।

প্রমথনাথ বিশী (১৯০২)

শ্লেষ, বিদ্রূপ এবং বাকচাতুর্যের জন্য প্রমথনাথ বিশী সবিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। অসঙ্গত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং আপাতবিরোধী উক্তি তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর অন্যান্য লেখার মতো লঘুনিবন্ধেও এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও বাকচাতুর্য লক্ষণীয়। স্বনাম এবং ছদ্মনাম প্র. না. বি-তে তিনি গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রসরচনা, সমালোচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

জন্ম : রাজশাহী জেলার জোয়াড়ি গ্রামে। শিক্ষা : শান্তিনিকেতনে। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক।

গ্রন্থ : মৌচাকে ঢিল, ঋণং কৃত্বা, জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার, বাঙালী ও বাংলা-সাহিত্য, রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ, রবীন্দ্রনাট্য-প্রবাহ, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, নিকৃষ্টতম গল্প, নিকৃষ্ট গল্প, চলনবিল, অশরীরী প্রভৃতি।

নবেন্দু বসু (১৯০২—১৯৫৩)

নবেন্দু বসু সেই জাত-লিখিয়েদের ভেতর একজন যাঁরা খুব কম লেখেন, কিন্তু যা লেখেন, তা রীতিমতো উচ্চাঙ্গ রচনা। 'বিচিত্রা'র পাতায় তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারপর উত্তরা, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর একাধিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বেরয়। গোড়া থেকেই তিনি সমালোচনা ও প্রবন্ধসাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। কাব্যালোচনায় আর প্রাক-রবীন্দ্রসাহিত্যে তাঁর যেমনি ছিল দখল, তেমনি উৎসাহ। তাছাড়া, লঘুনিবন্ধের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব

দেখিয়েছেন। স্মিত কৌতুক, যথার্থ কবি-দৃষ্টি আর রস-বিশ্লেষণ এগুলি তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। তাঁর এ জাতীয় রচনায় হারানো সুর যেমন ফুটে ওঠে, খুব কম লেখকের রচনায় তা দেখা যায়। কিন্তু সেটা 'নসট্যালজিক' নয়। সৌন্দর্যের উপাসক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্য ও আঙ্গিকের চর্চা, এই দু জিনিষের সমন্বয় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও স্টাইল গড়ে তুলেছে।

গ্রন্থাবলী : কবিতার প্রকৃতি, রসসাহিত্য ইত্যাদি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যাঁরা অন্যতম স্রষ্টা, তাঁদের ভেতর অচিন্ত্যকুমার একজন। অলংকারবাহুল্য, স্বচ্ছ স্বাচ্ছন্দ্য ও গাঢ়বন্ধতা তাঁর রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অচিন্ত্যকুমারের রচনাভঙ্গীর এমন একটা বলিষ্ঠ অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে যা তাঁর সমসাময়িকদের ভেতর আর কারুর ছিলো না বা নেই বলা চলে। গদ্যের মর্জি অনুসারে অচিন্ত্যকুমার রবীন্দ্রাতিশায়ী। গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি প্রায় সব বিভাগেই তাঁর মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য।

জন্ম : নোয়াখালি। বর্তমানে আলিপুরে বিচার বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। ১৯৫৪ সালে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে ইনি সাহিত্য শাখার সভাপতি মনোনীত হন।

গ্রন্থাবলী : পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, পরমাপ্রকৃতি শ্রীসারদামণি দেবী, ইন্দ্রানী, উর্ণনাভ, প্রচ্ছদপট, আসমুদ্র, সঙ্কেতময়ী, দিগন্ত, ডবল ডেকার, বেদে, হুইসল, কাঠ-খড়-কেরোসিন, স্বনির্বাচিত গল্প, শ্রেষ্ঠ গল্প, 'কল্লোল যুগ' অমাবস্যা, প্রিয়া ও পৃথিবী প্রভৃতি।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০৩)

আধুনিক কালে লঘু প্রবন্ধ লিখে যাঁরা বাঙালী পাঠক-পাঠিকার হৃদয়জয়ে সমর্থ হয়েছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বা ইন্দ্রজিৎ তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচনায় মনন-শীলতার ছাপ আছে, ভাববার মতো উপাদান আছে যথেষ্ট। সামঞ্জস্যবোধ, স্নিগ্ধতা ও স্বচ্ছ সারল্যের মাধুর্য তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমায় হীরেন্দ্রনাথের জন্ম। ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ.। ইস্কুলের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন সুরু। বর্তমানে বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক।

গ্রন্থ : বন্ধনহীন গ্রন্থি, বধূ অমিতা, প্রাণবন্যা, ইন্দ্রজিতের খাতা ইত্যাদি।

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪)

অন্নদাশঙ্কর গল্প, উপন্যাস, কাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি সব কিছুরই ভেতর একটা বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্নদাশঙ্করের গদ্যভাষার প্রসাদ-গুণ ও গাঢ়বদ্ধতা রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। বর্ণনা ও ভাষার বাড়াবাড়ি না ঘটিয়েও রচনাকে কত সতেজ, সরস করতে পারা যায় অন্নদাশঙ্করের লেখা গুলি পড়লেই তা বোঝা যায়। বীরবলী রচনারীতির প্রত্যক্ষ বাহক হলেও অন্নদাশঙ্করের গদ্যের অনন্য স্বাতন্ত্র্য ও ইস্পাতী নমনীয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জন্ম : ঢেঙ্কানল ; আই. সি. এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বর্তমানে শান্তিনিকেতনে আছেন।

গ্রন্থাবলী : সত্যাসত্য (পাঁচ খণ্ডে), পথে-প্রবাসে, আগুন নিয়ে খেলা, কামনা পঞ্চবিংশতি, দুঃখ মোচন, জীবনশিল্পী, জীয়নকাটি, নতুনা রাধা, রাখী প্রভৃতি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কবিতার বই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪)

আধুনিক যুগে বাংলা ছোট গল্পের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের অসাধারণ মিতভাষিতা এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অতি সূক্ষ্মশিল্প বোধের আবেদন 'সাধারণের' কাছে না হলেও শিল্পী মনের কাছে দুর্দমনীয়। শুধু ছোট গল্প ও উপন্যাসে নয়, প্রবন্ধ ও কবিতা রচনাতেও প্রেমেন্দ্র মিত্র বিশিষ্ট। ইনি সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের মতন খুব বেশি লেখেননি, বইএর সংখ্যাও তাঁর সে-তুলনায় অল্প।

কালি কলম, বঙ্গবাণী, নবশক্তি, সম্প্রতি, নিরুক্ত, পাহারা, বাংলার কথা, রংমশাল প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বর্তমানে ছায়াচিত্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

গ্রন্থ : পুতুল ও প্রতিমা, নিশীথ নগরী, ধূলি-ধূসর, বেনামী বন্দর, আগামী কাল, সাহসিকা, মৃত্তিকা, বৃষ্টি এল, প্রথমা, সম্রাট, ফেরারী ফৌজ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রভৃতি।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪)

বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাগুলির ভেতর এমন একটা হাস্য পরিহাসের ছাপ থাকে যার তুলনা ইদানীংকালের রচনাকারদের সাহিত্যে

দুর্লভ। তিনি পণ্ডিত কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য রচনাকে কোথাও ভারাক্রান্ত করে না। মজলিশি লেখা লিখতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্লভ। অভিজ্ঞতায় তিনি সমৃদ্ধ, এবং সেই অভিজ্ঞতার সুন্দর সাহিত্যায়ণে তাঁর নৈপুণ্য সর্বজনবিদিত। বিদেশী শব্দ ও পদের লাগসই ব্যবহারেও তিনি সুনিপুণ।

জন্ম শ্রীহট্টে। ছাত্রজীবনের কিছুটা কাল শান্তিনিকেতনে কাটে। জার্মাণীর বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি পান।

গ্রন্থাবলী : দেশে বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠি, চাচা কাহিনী, অবিশ্বাস্য।

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫)

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-কাহিনী 'মহাপ্রস্থানের পথে'র গ্রন্থকার প্রবোধকুমার সান্যাল শুধু একজন সুসাহিত্যিক হিসাবে নয়, বাংলা দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় সাহিত্যপৃষ্ঠার প্রথম প্রবর্তক হিসাবেও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এর সূচনা তিনি প্রথম করেন দৈনিক যুগান্তরের পৃষ্ঠায়। তিনি 'পদাতিক' নামে একখানা সাপ্তহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং বিজলী, স্বদেশ, কল্লোল প্রভৃতি কয়েকখানি সাময়িক পত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

গল্প, উপন্যাস বা ভ্রমণকাহিনী ছাড়াও প্রবোধ সান্যালের কিছু কিছু লঘু প্রবন্ধ আছে। আবেগধর্মিতা, সরসতা ও কোমলতায় এই সমস্ত প্রবন্ধ সুখপাঠ্য ও অনবদ্য।

গ্রন্থাবলী : প্রিয়বান্ধবী, আঁকাবাঁকা, শ্যামলীর স্বপ্ন, চেনা ও জানা, অঙ্গার, নদ ও নদী, তরুণী সঙ্ঘ, অরণ্যপথ, জলকল্লোল, নবীন যুবক, দেশ-দেশান্তর, জীবন মৃত্যু, হাস্‌্যবানু প্রভৃতি।

শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৫)

শিবরাম বাবুর লেখা প্রায় সবই ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরসপ্রধান, কিন্তু এঁর লেখার আসল কৃতিত্ব বড়োদের জিনিস ছোটদের মতো করে এবং ছোটদের জিনিস বড়োদের মতো করে, লেখার কৌশলে—এমন ভাবে ইনি একাধারে দিতে পারেন যে, রচনার রস সব স্তরের পাঠক-পাঠিকারই সমান উপভোগ্য হয়ে ওঠে; এঁর নিজের মতে, সমস্তটাই উচ্চহাস্যে উড়তে দিতে কারোই বিশেষ কোনো বাধা হয় না। দেখবার এবং দেখাবার এক বিশিষ্ট ভঙ্গি শিবরামবাবুর আয়ত্তে।

গ্রন্থাবলী: মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী, দেবতার জন্ম, মেয়েদের মন, বাড়ি থেকে পালিয়ে, বিচিত্ররূপিণী ইত্যাদি।

জ্যোতির্ময় রায় (১৯০৬)

'যা-তা লেখা যেমনই সহজ, যা-তা নিয়ে লেখা তেমনই কঠিন।' এই মূল্যবান কথাটি বলেছেন 'দৃষ্টিকোণ' গ্রন্থের স্মরণীয় লেখক জ্যোতির্ময় রায়। এই যা-তা বা অতি তুচ্ছ বস্তুকেও দার্শনিকতা বা কবিত্ববর্জিত নিছক বাস্তব দৃষ্টির অভিনবত্বে অসামান্য করে তোলার দুর্লভ ক্ষমতায় জ্যোতির্ময়বাবুর লেখনী ঈর্ষাযোগ্য। এবং সত্যই তাঁর ব্যক্তিক নিবন্ধের সংকলন 'দৃষ্টিকোণ' প্রকাশিত হবার পর এ-জাতের রচনাকে বাংলার সুধী রসিকমণ্ডলী অভিনব বলে অভিনন্দিত করেন। চিন্তাশীল প্রবন্ধকার এবং সুবক্তা হিসাবেও তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে ছোটগল্প লেখক হিসেবেই জ্যোতির্ময় রায়ের আত্মপ্রকাশ। ১৯৪৪ সালে তাঁর বহুবিখ্যাত চিত্রকাহিনী 'উদয়ের পথে'র অসামান্য সাফল্য তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। এক কথায়, জ্যোতির্ময় রায়ের সাহিত্যকর্মে তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে ক্ষুরধার মননশীলতার আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

জন্ম: বিক্রমপুর। বর্তমানে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক হিসাবে চিত্র-জগতের সঙ্গে জড়িত।

গ্রন্থ: দৈনন্দিন, পদ্মনাভ, তমসা, উদয়ের পথে, অন্যান্য, দৃষ্টিকোণ প্রভৃতি।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬)

'বিচিত্রা'র প্রথম যুগে বিমলাপ্রসাদ লিখতে শুরু করেন। তারপর বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ বেরিয়েছে এবং এখনও তিনি লিখছেন। সজীবতাই তাঁর মনের ধর্ম, তবে রচনার মানবিভ্রম তিনি হতে দেন না, এটা তাঁর কৃতিত্ব। তাঁর লেখার ও মনের পরিধি বিস্তৃত। তবে ব্যক্তিক নিবন্ধ রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বসম্পন্ন। সামঞ্জস্য-বোধ, ষ্টাইল এবং স্বভাব রসজ্ঞান তাঁর ব্যক্তিক নিবন্ধের বৈশিষ্ট্য। দুরূহতা আর লঘুতা দুটোরই বাড়াবাড়ি বর্জন করে বিষয়ানুসারে তাঁর কলম চলে। সাহিত্য-সমালোচনা, শিক্ষা ও সমাজ, ভারতের ঐতিহ্য নিয়ে নিবন্ধ এবং বিশেষত কবিতা রচনাতেও তাঁর লেখনী সমান সচল।

গ্রন্থাবলী : সংক্রান্তি, চন্দ্রকলা, সম্ভবা, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড, উজালা, ভারতের ঐতিহ্য, ব্যক্তিগত, নিমন্ত্রণ, মাঝারি ইত্যাদি।

অজিত দত্ত (১৯০৭)

অজিত দত্তের সুকবি ছাড়া সুনিবন্ধকার হিসাবে আর একটি পরিচয় আছে। তাঁর নিবন্ধগুলির ভেতর বুদ্ধিদীপ্তি, মার্জিত রুচি ও শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'রৈবত' ছদ্মনামে প্রকাশিত লেখাগুলোও প্রসাদগুণে অনবদ্য।

ঢাকায় জন্ম। প্রথমে বুদ্ধদেব বসুর সহযোগিতায় ঢাকা থেকে 'প্রগতি' পত্রিকা বার করেন ; পরে কলকাতায় এসে 'কল্লোলে'র সঙ্গে যুক্ত হন। বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।

গ্রন্থ : কুসুমের মাস, পুনর্নবা, নষ্টচাঁদ, জনান্তিকে, মনপবনের নাও, ছায়ার আলপনা ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিক নিবন্ধ লিখে যাঁরা সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। বিস্ময় ও সৌন্দর্যবোধের স্নিগ্ধতায় এবং গীতিকবিতার সুষমায় তাঁর ব্যক্তিক নিবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

১৯৩৫ সালে বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' নামে ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রায় একই সময় 'কবিতাভবন' নাম দিয়ে একটি প্রকাশালয় স্থাপন করেন। ইনি মাঝে মাঝে ইংরেজিতেও লিখে থাকেন, নিজের গল্প, কবিতার ইংরেজি অনুবাদ ভারতীয় ও বৈদেশিক পত্রিকাদিতে প্রকাশ করেছেন এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে An Acre of Green Grass নামে এঁর একখানি ইংরেজি বই কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে। এঁর প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা বর্তমানে আশীর উর্ধ্বে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, সমালোচনা, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি সবই ইনি লিখেছেন।

গ্রন্থাবলী : সাড়া, রেখাচিত্র, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, উত্তরতিরিশ, সব-পেয়েছির দেশে, তিথিডোর, সাহিত্যচর্চা, কঙ্কাবতী, শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর, বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা ইত্যাদি।

পরিমল রায় (১৯০৯—১৯৫১)

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে স্বর্গীয় পরিমল রায় যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সূক্ষ্মদৃষ্টি বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের ভেতর খুব কমই দেখা গেছে। তাঁর গদ্যরচনার ভঙ্গি ঋজু, স্বচ্ছ। সামান্য বিষয়কে তিনি বর্ণনার সাহায্যে মনোরম ক'রে তুলতে পারতেন, সুন্দর কথাচিত্রের রেখায় সরস চিন্তা ও মন্তব্য সাজাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো তাঁর।

পরিমল রায় কয়েক বছর বিভিন্ন জায়গায় চাকুরী করার পর সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থনীতি বিভাগে ফার্স্ট অফিসারের পদে নিযুক্ত হয়ে আমেরিকায় যান ; সেখানেই ১৯৫১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

গ্রন্থ : ইদানীং।

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯)

সাম্প্রতিক কালের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর তালিকায় সুবোধ ঘোষের অন্তর্ভুক্তি আজ তর্কের অবকাশ রাখে না। যাঁর দ্বিতীয় রচনা 'ফসিল' দিয়ে বাংলা গল্পের ইতিবৃত্তে নতুন যুগের সূচনা হলো, গাল্পিক এবং ঔপন্যাসিকই হয়ে দাঁড়াবে যে তাঁর মুখ্যতর পরিচয়, এতে আর আশ্চর্য কী ? তবে এ ছাড়াও তাঁর আর একটি পরিচয় আছে। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ক্ষেত্রেও সুবোধ ঘোষের অর্জিত সিদ্ধি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। বহুপঠিত বিদগ্ধ সুবোধবাবুর গভীর চিন্তাশীলতাকে যদি অসাধারণ বলে অভিহিত করি, তবে তাঁর তির্যক শাণিত গদ্যরীতিকে বলতে হয় অনন্যসাধারণ।

জন্ম : হাজারিবাগ ; শিক্ষালাভ : স্থানীয় স্কুল ও কলেজে। প্রথম রচনা ছোটগল্প 'অযান্ত্রিক' ; বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

গ্রন্থাবলী : ফসিল, পরশুরামের কুঠার, জতুগৃহ, মনভ্রমরা, থিরবিজুরি, ত্রিযামা, কাগজের নৌকা, ভারতপ্রেম কথা, কিংবদন্তীর দেশে, ভারতের আদিবাসী ইত্যাদি।

বিনয় মুখোপাধ্যায় (১৯০৯)

'দৃষ্টিপাতে'র লেখক বিনয় মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা বাংলা দেশের বিস্ময়। সাংবাদিকতাকে সাহিত্যের স্তরে টেনে তোলার কৃতিত্বে তিনি বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাসে কীর্তিমান পুরুষ। গদ্যরীতির ক্ষেত্রেও যাযাবরের অভিনবত্ব অনস্বীকার্য।

জন্ম : পূর্ববঙ্গে। শিক্ষাজীবন প্রধানত চাঁদপুরেই কেটেছে। বর্তমানে ভারত সরকারের ডেপুটি প্রিন্সিপ্যাল ইনফরমেশন অফিসার।

নামে ও ছদ্মনামে তাঁর গ্রন্থগুলি হলো : দৃষ্টিপাত, জনান্তিক, খেলার রাজা ক্রিকেট, মজার খেলা ক্রিকেট, ঝিলম নদীর তীর।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (১৯১০)

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত সংবাদপত্রলোকের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। সমস্ত রকম লেখায় পারদর্শী বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'সব্যসাচী' আখ্যায় অভিনন্দিত করেন। লেখক জীবনের এই হলো তাঁর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। অন্যান্য লেখার মতো লঘু নিবন্ধ রচনায়ও নন্দগোপাল সেনগুপ্ত সার্থক শিল্পী।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক লাভ করেন। প্রথমে কলকাতায়, পরে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের লিটারারী সেক্রেটারী; বর্তমানে যুগান্তরের সহযোগী সম্পাদক। প্রথম কবিতার বই 'সেতু'।

গ্রন্থাবলী : মিছে কথা, মহানির্বাণ, কাঁটাতার, পায়ে-চলার পথ, যৌবন জলতরঙ্গ, বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, শতাব্দী ও সাহিত্য, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ, সময়-অসময় ইত্যাদি।

বিনয় ঘোষ (১৯১৭)

অপেক্ষাকৃত নবীনদের ভেতর আধুনিক বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীবিনয় ঘোষ বা 'কালপেঁচা' প্রগতিশীল ও চিন্তাশীল লেখক বলে সুপরিচিত। অনুকম্পা, সহানুভূতি এবং সমাজ-সচেতনতার ত্রিবেণীসংগমে তাঁর সাহিত্যকীর্তির প্রতিষ্ঠা; বুদ্ধি এবং বোধি তাঁর রচনায় সার্থকরূপে সমন্বিত। রচনারীতির ঔজ্জ্বল্যের চাইতে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব তাঁর লেখায় প্রধান হয়ে ওঠে, অথচ সেই বিষয় পরিবেশনের গুণে সুপাঠ্যও। সম্ভবতঃ এই কারণে তাঁর লঘু নিবন্ধগুলিও গভীরতায় সুদূরপ্রসারী। দুরূহ বিষয় নিয়েও কালপেঁচার বহু লেখা আছে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, বিশেষ ক'রে সম্প্রতি প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে রচিত 'কালপেঁচার বঙ্গদর্শন' নামে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের একটি অনন্য সম্পদ রূপে পরিগণিত হবে।

গ্রন্থাবলী : শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ, কালপেঁচার নকশা, কালপেঁচার দুকলম, কলকাতা কালচার, জনসভার সাহিত্য ইত্যাদি।

রঞ্জন (১৯২০)

শ্রীনিরঞ্জন মজুমদার 'রঞ্জন' এই ছদ্মনামেই সাহিত্যজগতে পরিচিত। এঁর প্রতিটি রচনার ভেতর সবলতা, বুদ্ধিদীপ্তি ও শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। গদ্যরীতি ঋজু, স্পষ্ট ; মুখ্যত প্রমথ চৌধুরীর রচনাশৈলীর অনুসারী। 'স্টাইল ইজ দি ম্যান' এই বহুপ্রচলিত উক্তি রঞ্জনের লেখায় আশ্চর্য রকম সত্য, অকুণ্ঠ আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী রঞ্জনের লঘু নিবন্ধগুলি সেই ব্যক্তিত্বের সার্থক প্রতিফলন। ইংরেজি বাংলা দু ভাষাতেই এঁর সমান দক্ষতা।

জন্ম পূর্ববঙ্গে। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকা ও Hindusthan Standard এর সঙ্গে জড়িত।

গ্রন্থ : শীতে উপেক্ষিতা, অন্যপূর্বা, বইয়ের বদলে, অসংলগ্ন, বিকল্প, সংকরী।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০)

প্রথম জীবনে স্বভাবতঃ কবি হিসেবে এবং পরবর্তী কালে অনিবার্য কারণে অনুবাদক হিসেবে পরিচিত হলেও বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যত আজ শক্তিমান এক কথাশিল্পী। লঘু নিবন্ধেও পারঙ্গম। হালকা হাসির মুক্তোর চেয়ে বিদ্রূপের ফোড়ন দেওয়ার দিকেই তাঁর ঝোঁক সমধিক। অবশ্য, অতি প্রয়োজনকালে তিনি যে সিরীয়স প্রাবন্ধিক হয়ে উঠতেও পারেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য'। শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় সাহিত্যেও বইটি অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

গ্রন্থাবলী : রাম রহিম, নতুন নায়িকা, শুভরাত্রি, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ইত্যাদি।

রূপদর্শী (১৯২৩)

হালকা চালে কথা বললেও রূপদর্শীর লেখায় ভাববার মতো উপাদান অনুপস্থিত নয়। তাঁর রচনারীতিও উল্লেখযোগ্য ; সরস ভাষার এমন কি 'শ্ল্যাং'-এরও

জোরালো ব্যবহারে তিনি কুশলী, কৃতিত্বসম্পন্ন। রচনার মেজাজের দিক থেকে তিনি মুজতবা আলীর সহধর্মী।

শ্রীহট্ট জেলার এক চা বাগানে বিদ্যারম্ভ। প্রাইভেট টিউশনি, ইলেকট্রিক মিস্ত্রিগিরি, ফিটার, রেস্তোরাঁয় বয়গিরি, কার্ডবোর্ড ও বীমাকোম্পানীর দালালী ইত্যাদি করার পর অধুনালুপ্ত 'সত্যযুগ' পত্রিকার ছোটদের পাতার পরিচালক ছিলেন। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টার।

গ্রন্থাবলী : এই কলকাতায়, মেঘনামতী, রূপদর্শীর নক্শা, রূপদর্শীর সার্কাস, কথায় কথায়।

প্রাণতোষ ঘটক (১৯২৩)

সম্পাদনার গুরুদায়িত্বে বহন করেও যে সাহিত্য-সৃষ্টি করে যাওয়া যায়, মাসিক বসুমতীর সম্পাদক তাঁরই প্রমাণ দিয়ে চলেছেন আকাশ-পাতাল, মুক্তাভস্ম, রাজায়-রাজায় রচনা ক'রে। উপন্যাসের উপযোগী পটভূমিকা সৃষ্টিতে এবং আপাততুচ্ছ বিষয়ের প্রতিও পাঠকের মনোযোগ সমান আকর্ষণ করাতেই তাঁর বিশিষ্ট পারদর্শিতা।

তিনি যে সরস রচনার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু সৃষ্টির বীজ বুনেছেন তা অনেকেরই অজ্ঞাত থাকার কারণ হলো সেগুলি তিনি প্রায়ই ছদ্মনামে ছেপেছেন। যেমন বর্তমান সংকলনে সংগৃহীত তাঁর 'চিঠিপত্র' লেখাটি 'ওয়াকেনবীশ', এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় স্বনামের পরিবর্তে।

গ্রন্থাবলী : পঙ্গপাল, আকাশ-পাতাল (দু'খণ্ড), মুক্তাভস্ম ইত্যাদি।

নীলকণ্ঠ (১৯২৪)

সেক্সপীয়র বলেছেন, নামে কী এসে যায়? কিন্তু 'নীলকণ্ঠ' যাঁর ছদ্মনাম, তিনি বলেন, নামে কিছু এসে যায় না বটে, কিন্তু 'ছদ্মনামে' এসে যায়। এই কারণে তাঁর আসল নাম এখানে প্রকাশ করা হলো না। কিন্তু 'নীলকণ্ঠ' এই ছদ্মনাম নেবার আগেই খ্যাতি-অখ্যাতিতে, প্রশংসা ও নিন্দায় স্বনামেই তিনি সাময়িক পত্রিকাজগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন। যে কারণের জন্যে তাঁর আসল নাম উহ্য রইল, সেই কারণেই তাঁর গ্রন্থের নাম দেওয়া এখানে সঙ্গত হবে না—অর্থাৎ সেগুলো বেরিয়েছে সব তাঁর স্বনামে, ছদ্মনাম নেবার আগে। আমাদের যে বিশ্বাসই হোক, তাঁর নিজের বিশ্বাস

যে 'নীলকণ্ঠ' এই ছদ্মনাম একদিন তাঁর আসল নামকে বহুদূর ছাড়িয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী হবে। গুরুতর বিষয়কে লঘু এবং লঘু বস্তুকে গুরুতর ক'রে তোলার কৃতিত্বেই তিনি কৃতবিদ্য। মাসিক বসুমতীতে 'চিত্র ও বিচিত্র' এই ধারাবাহিক রচনার মাধ্যমেই অত্যন্ত সম্প্রতি 'নীলকণ্ঠের' প্রথম আকস্মিক আত্মপ্রকাশ।